বরিশালে ইসলাম

আজিজুল হক বান্না



বরিশালে ইসলাম

আজিজুল হক বান্না

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

বরিশালে ইসলাম
আজিজুল হক বান্না

ইফাবা গবেষণা ঃ ১৫
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭৫৩
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৯৫৪৯২
ISBN: 984-06-0127-0

প্রকাশকাল
আষাঢ় ঃ ১৪০১
জুন ঃ ১৯৯৪
মুহররম ঃ ১৪১৫

প্রকাশনায়
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রিন্টিং প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

মূল্য ঃ ৯৫·০০ (পঁচানব্বই টাকা) মাত্র

BARISHALE ISLAM (Islam is Barishal) : Written in Bengali by Azizul Haque Banna and published by the Research Section, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. June 1994
Price : Tk 95·00. U. S. Dollar : 5·00

যার নিরবচ্ছিন্ন তাকিদ
ও অনুপ্রেরণায় এ বই
লেখা সম্ভব হয়েছে আমার
সেই জীবন সঙ্গিনী–
হালিমা খাতুনকে

প্রকাশকের কথা

ইদানিং এটা ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে কোন কোন সাহাবী সুদূর অতীতে বাংলাদেশ অঞ্চলের সাথে মরু আরববাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আসা-যাওয়া ও লেনদেনের পরিচিতি সূত্র ধরে ইসলামের বিশ্বজনীন সাম্য ও শান্তির পয়গাম নিয়ে এখানে তশরীফ এনেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর সে সুবর্ণ মুহূর্ত থেকে ইসলামের আলোকে ক্রমে ক্রমে উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বলতর হতে থাকে এই জনপদ। এখানকার জনগণের মধ্যে দীন ইসলাম প্রচারিত হয় মূলত ওলী-দরবেশ, সূফী, গাওস, কুতুব, আবদাল, মাশায়েখ, উলামায়ে কিরামের দ্বারা। ইতিহাসের বাস্তবতায় যদিও ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় ও লক্ষণ সেনের পলায়নের দৃশ্য আসে, কিন্তু আসলে সামরিক বিজয়ের ব্যাপারটি মুসলিম ইতিহাসে অন্যতম উপাদান এবং এ ভূ-ভাগেও এটি তেমনি মূল্যায়ণসাপেক্ষ। ইসলামের প্রাণবাণীর শাশ্বত ও সার্বজনীন আবেদনেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের বিজয় সংঘটিত হয়েছে এবং কল্যাণ সন্ধানী মানুষ এর ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে নিজেরা ধন্য হয়েছে, আরো দশজনকে এ অনন্ত কল্যাণের পথে অবিচ্ছিন্ন ধারায় আহ্‌বান জানিয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারের পুরো ইতিহাস বিচার করতে হবে। বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসও এ বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে। প্রতিপন্ন হয় যে, এ এলাকার জনবসতি সুপ্রাচীন । ইসলামের প্রাণ-প্রবাহের ঢেউ লাগা তেমনি সুদূর অতীত-উৎসারিত-এ ধারণার সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্ত ভিন্ন সূত্রের ইতিহাস গ্রন্থাদি স্বল্প সংখ্যক বুযুর্গ আউলিয়া ও তাঁদের কর্মকালকে পাঁচ-ছ' শ' বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। বিজ্ঞ

লেখক, গবেষক, বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আজিজুল হক বান্না 'বরিশালে ইসলাম' গ্রন্থে এ বিষয়টিতে তাঁর সঙ্গত জিজ্ঞাসা রেখেছেন এবং উল্লেখিত সময়ের আগে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদির উর্ধ্বে তিনি আমাদের দৃষ্টিসীমা প্রসারিত করতে চেয়েছেন। গবেষকদের চিন্তার দিগন্ত উন্মোচনের এ প্রয়াস প্রশংসনীয়। গ্রন্থটি বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জাতীয় সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর জেলাভিত্তিক ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থমালা প্রকাশনায় আরেকটি সৃজনশীল মাত্রা সংযোজনে অবদান রাখবে এবং পাঠকদের অভিনন্দন লাভ করবে-এ ব্যাপারে আমরা আশাবাদী ।

আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

কে. এম. ফরহাদ হোসেন
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

ক.

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানদের দেশে ইসলামী শাসন আজ নির্বাসিত। ইসলামী শাসন প্রচলিত অর্থে কোন ধর্মতাত্ত্বিক শাসন নয়, অথবা মোল্লাতন্ত্র কিংবা ধর্মান্ধতার অনুসরণও নয়। ইসলামী শাসনই মূলত প্রগতিশীল এবং মানব আকাঙ্ক্ষা ও চরিত্রের উপযোগী একমাত্র শাসন প্রক্রিয়া। মানবতার যে ব্যাখ্যা অথবা সামাজিক সাম্যের যে ধারণা ইউরোপে আজ প্রচলিত, ইসলামের সামাজিক সাম্য ও উদারনৈতিক মানবতা তার চেয়ে বেশি মাত্রায় প্রগতিশীল ও অগ্রসর। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে 'মদীনা সনদের' মাধ্যমে ইসলাম যে মানবাধিকারের সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছে, জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার ঘোষণা, ফরাসী বিপ্লবের উদারনৈতিক মূল্যবোধ কিংবা আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা তার চেয়ে অনেক ভারসাম্যহীন ও পশ্চাৎমুখী। ইসলামী সমাজে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাবার ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান হিস্যা স্বীকৃত। ইসলামী সমাজে বর্ণবাদের কোন অবকাশ নেই। পাশ্চাত্যের তথাকথিত উদারনৈতিকতা যেখানে বর্ণবাদের হিংস্রতার কাছে মানবতা বিন্দী করে রেখেছে, সেখানে ইসলাম সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলের জন্য একক সামাজিক ও মানবিক মানদণ্ড উপস্থাপন করেছে। ইসলাম যেহেতু বিশ্বাস করে যে, সকল মানুষ (শুধু মুসলমান নয়) একই পবিত্র উৎসধারা থেকে উৎসারিত এবং মানুষের পারিপার্শ্বিকতা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং রুচিভেদে তার বিশ্বাস ও জীবনাচরণের বিভিন্নতা দৃষ্টিগ্রাহ্য, সে কারণে তার যে কোন ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ ও তা অবাধে চর্চা করার স্বাধীনতা রয়েছে, অনুরূপ কারণে ধর্মের উপর ইসলাম কোন জবরদস্তি ও বাধ্য-বাধকতা আরোপ করার সুযোগ দেয়

না। এরপরও যারা সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে তথাকথিত ধর্ম- নিরপেক্ষতার নামে নাস্তিকতা অনুসরণের কথা বলে, তারা মানবতার শত্রু এবং গণবিরোধী শক্তির তল্পীবাহক। ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদকে যেভাবে নির্মূল করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে, তা বাস্তবে কার্যকর হলে নিরঙ্কুশ সামাজিক শান্তি, প্রগতি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইসলামী সমাজ পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষের প্রকৃত ও শাশ্বত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। মানুষকে শৃঙ্খলিত রেখে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতি নিশ্চিত হতে পারে না। ইসলাম বহির্ভূত সকল সমাজ-ব্যবস্থাই মানুষকে মৌলিকভাবে শৃঙ্খলমুক্ত-সাহসী নাগরিক হবার সুযোগ দিতে ব্যর্থ প্রমাণিত। ইসলাম মানুষকে দু'ধরনের দায়িত্বে উদ্দীপ্ত করে। এক. আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য ও দায়িত্ব এবং দুই. মানুষ ও অপরাপর সামাজিক ইউনিটের প্রতি তার দায়িত্ববোধ। বিপন্ন ও মযলুম মানবতার জন্য ইসলামের সার্বজনীন ও শাশ্বত নীতিবোধ আছে, যে কারণে ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিপন্ন অমুসলিমদের আহ্বানেও মুসলমানরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গেছেন।

ইউরোপের শিল্প বিপ্লব-উত্তর রেনেসাঁর পর এক এক করে মুসলিম দেশগুলো ঔপনিবেশিক শক্তির গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সংগ্রাম ও বিপুল রক্তক্ষয়ের পর মুসলিম দেশগুলো প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আজও বিজাতীয় ঔপনিবেশিক ধারার দায় বহন করছে। সীমিত গণতন্ত্র চর্চার ফলে মাঝে মাঝে ক্ষমতার হাত বদল হলেও পুরনো ঔপনিবেশিক শাসন ও সমাজ কাঠামোর মধ্যেই তারা আজও আবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অবস্থাও এর থেকে ভিন্নতর নয়। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে আমাদের এ দেশে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে এবং রাজনৈতিক ভাঙ্গাপড়া তথা ইতিহাসের পট-পরিবর্তন কম হয়নি। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর অভিশাপ হতে মুক্ত হতে না পারলে ক্ষমতার হাত বদল যে জনগণের প্রকৃত শৃঙ্খল মুক্তি এনে দিতে পারবে না, এটা নিশ্চিত।

বাংলাদেশ সহ গোটা মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্বের চরম সংকট। সাহসী, দায়িত্বশীল ও ঈমানদার নেতৃত্বের সংকটের ফলে সাধারণ মুসলমানরা তাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে দু'টি বিপরীত ধারায় বিভক্ত করে রেখেছে এবং এরা সতত সংঘাতমুখর। ফলে সমাজের সৃজনী শক্তি আত্মকলহ ও সংঘাতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এতে করে জাতীয় প্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মেকিয়েভেলীর মুনাফেকী রাজনীতির ধারায় সমাজ কাঠামো বহুলাংশে নির্মিত। সততা, ঈমানদারী, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাসিত।

এমন সংকট থেকে অবশ্যই আমাদের মুক্তি পেতে হবে। আর সে জন্য আমাদেরকে শুরুতেই ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অজ্ঞতা নিয়ে সমাজ কাঠামো বদল করা যায় না। সেই সাথে সামাজিক কমিটমেন্টহীন আত্মকেন্দ্রিক নেতৃত্বের খপ্পর থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলামই কেবল স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের স্থায়ী নিশ্চয়তা দিতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী, দুর্যোগ-সংকটে প্রতিবার ইসলামই মুসলমানদের রক্ষা করেছে, মুসলমানরা ইসলামকে রক্ষা করেনি।

রাষ্ট্র কাঠামোকে ইসলামী নীতি-বৈশিষ্ট্যের ধারায় বিন্যস্ত করার আগে আমাদের ইসলামী সমাজ নির্মাণে অগ্রসর হতে হবে। তবে ইসলামী সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর অবশ্যই মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ইসলামী সমাজের প্রত্যাশা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বুলন্দ হয়ে উঠলেও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এবং কৌশলগত বিচ্যুতির কারণে তার রূপায়ণ হচ্ছে না। মুসলমানরা নিজেরাই আজ দারিদ্র্য, মিথ্যাচার, মুনাফেকী, পরনির্ভরশীলতা, পরনিন্দা, পরার্থ অপহরণ, অশিক্ষা, কুসংস্কার, বিজ্ঞান বিমুখতা, প্রতিরক্ষায় উদাসীন, আরাম-আয়েস, খোদাদ্রোহীতা, বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ, ব্যক্তিপূজা, হীনমন্যতা ইত্যাদির মত ক্ষয় রোগে আক্রান্ত।

বাংলাদেশে ইসলাম এসেছিল বিজয়ীর বেশে-বখতিয়ারের তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। তবে ইসলাম তলোয়ারের বদলে প্রেম-মানবতা ও শাশ্বত

মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছে। ইসলাম-পূর্বকালেই এ অঞ্চলের সাথে আরব দুঃসাহসী নাবিকদের সমুদ্রপথে সংশ্রব ছিল, ছিল ব্যবসার লেনদেন। চট্টগ্রাম থেকে সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, মালদ্বীপ এবং চীনের উপকূল পর্যন্ত আরবদের বাণিজ্য বহরের বিস্তৃতি ছিল। ইসলামের চূড়ান্ত আগমন সারা বিশ্বে বিপ্লবের কাঁপন সৃষ্টি করে। এ বিপ্লব দৃশ্যত যতো শাণিতই মনে হোক না কেন, মানুষের মনোজগতেই এ বিপ্লবের অভিঘাত প্রথম আঘাত হেনেছিল। আর এ ভূখণ্ডে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় কিংবা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের আগেই ইসলামের আগমন ঘটেছিল এবং সেটা অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছিল। এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা)-এর দু'একজন সাহাবাও এ ভূখণ্ডে তাঁদের পদধূলি দিয়েছেন। তবে এ কথা সুস্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, এখানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে ইসলামের উদারচেতা আউলিয়া-দরবেশ ও পীর-মাশায়েখদের দ্বারা। দেশটি সুদূর অতীতকাল হতেই ইসলামের জন্য উর্বর।

বহিরাগত ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে ইসলামকে মুকাবিলা করেই টিকে থাকতে হচ্ছে। ঔপনিবেশিক শাসন-উত্তরকালে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের নাস্তিকতা এবং ভোগবাদী জীবন-বোধের সংঘাত বাঁধে। এ ধারা আজও অব্যাহত। এ সংঘাতে আমাদের জয়ী হতেই হবে। ইসলাম যে শাশ্বত জীবনবাদী সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণ করেছে, তাকে পুনরাবিষ্কার করার দায়িত্ব বর্তমান বংশধরদের নিতে হবে। আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ইসলামী গণজাগরণের বিজয় অভিযান বাংলাদেশের পর্ণ কুটির থেকেই সূচিত হবে। বাংলাদেশের জনগণের মাঝে যে অযুত শক্তি ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা আজও অনাবিষ্কৃত। একই ভাষা, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং একটি অখণ্ড ভৌগোলিক সংলগ্নতা দশ কোটির উর্ধ্ব সংখ্যক জিন্দাদিল-সংগ্রামী তৌহিদী মানুষকে একটি অব্যক্ত আশাবাদের ঐক্যতানে গ্রন্থিত করে রেখেছে। এটি বিশ্ব ইতিহাসে বিরলদৃষ্ট ঘটনা। আমাদের বিপুল জনশক্তি এবং পর্বত প্রমাণ দারিদ্র্যই আমাদের জাতিসত্তার নতুন আবিষ্কারকে অনিবার্য এবং সহজসাধ্য করে তুলবে।

ইতিহাস সাক্ষী, সম্পদের তারে ন্যুজ কিংবা বিলাসী জীবনের স্বচ্ছন্দতায় সমর্পিত উচ্চতর নৈতিক মূল্যবোধ বা আধ্যাত্মিকতাবিহীন কোন মানবগোষ্ঠী কখনও পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিপ্লব সৃষ্টি করেনি; বরং শতাব্দী-নির্যাতিত, নিপীড়িত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীই অস্তিত্ব রক্ষার ঐতিহাসিক আত্মগত তাকিদে বিপ্লবের ঝান্ডা হাতে তুলে নিয়েছে। মহানবী (সা)-এর বিপ্লবের সাথীরা অনেকেই ছিলেন সদ্যমুক্ত ক্রীতদাস, দল-গোত্রচ্যুত বিপ্লবী তরুণ-যুবক ও ঐ সমাজের নিপীড়িত মানবগোষ্ঠী। বাংলাদেশেও একটি বিপ্লবের প্রচন্ড শক্তি আমি প্রত্যক্ষ করছি। তবে প্রয়োজন হচ্ছে সঠিক ও সাহসী নেতৃত্বের এবং সঠিক দিক-নির্দেশনার।

খ.

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-এর গবেষণা বিভাগ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আমি এ বই লিখতে শুরু করি। কথা ছিল, 'বরিশালে ইসলাম প্রচার' বিষয়ক একটি গবেষণা-সন্দর্ভ রচনার। এ বিষয়ের উপর কাজ করতে গিয়ে আমাকে নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত এটি এমন এক বিষয়, যার সাথে সম্পৃক্ত সহায়ক গ্রন্থ দুর্লভ বললেই চলে। বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে এ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা হয়নি। এমনকি, বাংলাদেশে মানব বসতির প্রকৃত তথ্য-চিত্রও অনুপস্থিত। যতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায়, তা-ও পরিপূর্ণ নয়। ফলে এ ব্যাপারেও নানা অনুমান-আন্দাজের উপর নির্ভর করতে হয়। ইতিহাস এ ব্যাপারে একমত যে, বাংলাদেশে প্রধানত পীর-ওলী-আউলিয়াদের নিরলস প্রয়াসেই ইসলামের প্রসার ঘটেছে। তবে এ দেশের মুসলমানদের মাঝে কত ভাগ ধর্মান্তরিত এবং কত ভাগ বহিরাগত মুসলমান, ইতিহাস সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট জবাবদানে অক্ষম। উপরন্তু ঠিক কখন থেকে ইসলাম এ দেশে প্রচারিত হয়েছে, সে ইতিহাস উদ্ধার করাও দুরূহ। তবে ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে একমত যে, ভারতে বা বাংলাদেশের এ অঞ্চলে ইসলামের ইতিহাস এবং মুসলমানদের শাসনের ইতিহাস সমার্থক নয়। অর্থাৎ

এ দেশে ইসলাম প্রচার কখনও রাজানুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল না। রাজনীতি, রাজ্য শাসন প্রক্রিয়া ইত্যাদি জটিল বিষয়কে এড়িয়ে নীরবে এবং অনেকটা সন্তর্পণে ইসলাম এ দেশের মাটিতে তার শক্ত ভিত্তি তৈরি করে নিয়েছে। এসব স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় প্রচারিত ইসলামই বরং মুসলিম বিজয়কে সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী করেছে। শুধু ইসলাম প্রচারক ওলী-দরবেশই নন, সমুদ্রবিহারী আরব বণিকরাও যে ইসলাম প্রচারে বিপুল ভূমিকা পালন করেছেন, তা খুব সহজেই বলা যায়। এশিয়ায় এবং বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় খুব দ্রুত ইসলাম বিকশিত হয়েছে। মালাবার থেকে সিন্ধু, চট্টগ্রাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি মুসলিম প্রধান অঞ্চলই তার প্রমাণ। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় কিংবা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের আগেই ধর্মীয়ভাবে এসব এলাকা মুসলমানদের করায়ত্ত হয়।

বরিশাল অঞ্চলের যে ইতিহাস আমরা পাই, তা খুব বেশি পুরনো নয়। পাল ও সেন আমলের যে আঞ্চলিক ইতিহাস, তা-ও অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট। মুঘল আমল ও তার পরবর্তী বৃটিশ শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রাপ্ত ইতিহাসের উপর নির্ভর করেই যদি আমরা বরিশালে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস প্রণয়ন করি, তা হলে তা হবে অসম্পূর্ণ এবং খন্ডিত। বরিশালে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস উল্লেখ করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে, পূর্ণাঙ্গ ইসলাম-পূর্বকালে 'চন্দ্রদ্বীপ' এবং 'বাকলা' নামে পরিচিত বর্তমান বরিশালে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী কোন্ ধর্ম ও সামাজিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিল। এ ব্যাপারে হিন্দু ও বৃটিশ ঐতিহাসিকরা অতি সহজভাবে একটি মন্তব্য করে থাকেন যে, হিন্দুদের কঠোর ও অমানবিক নিষ্ঠুর জাতিভেদ ও শ্রেণী বিভক্ত আচরণে অতিষ্ঠ নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন। কিন্তু নানা কারণে এই উক্তি সঠিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, ঐ সব জনগোষ্ঠী যে হিন্দু ছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, এখনও বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি হিন্দু জনগোষ্ঠী

বসবাস করছে। এরা হিন্দু ব্রাহ্মণদের জাতিভেদের নিষ্ঠুর নিপীড়নে বিক্ষত হলেও হিন্দু ধর্মের কাঠামোর মাঝেই নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। ইসলাম উদারতার সাথে সকল মানুষকে আপন অস্তিত্বে গ্রহণ করতে চির উদগ্রীব। হিন্দু ধর্মে এখনও ছুঁৎমার্গ বিদ্যমান এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এখনও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দিক থেকে মানবিক ব্যবহার পাচ্ছে না। অথচ হিন্দুরা তাদের পুরনো ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকতেই অভ্যস্ত। এমনকি, পাকিস্তান-উত্তরকালেও তারা মুসলমান হবার তাকিদ অনুভব করেনি (রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তান সমর্থন করা সত্ত্বেও)। এই বাস্তবতার নিরিখে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে চাই যে, এ অঞ্চলের যেসব আদিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা আদৌ হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। তারা ছিলেন আর্যদের প্রতিপক্ষ দ্রাবিড়দেরই উত্তর পুরুষ এবং কোন না কোনভাবে তারা বিস্মৃত তৌহিদবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলাদেশ এবং বিশেষ করে বরিশাল এলাকার অধিকাংশ মুসলমানই এই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়। তৃতীয়ত. এ অঞ্চলের বিপুল অংশ বহিরাগত মুসলমান। চতুর্থত মহানবী (সা)-এর সময়ে যদি দু'একজন সাহাবা এ দেশে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এসে থাকেন এবং চট্টগ্রাম বন্দরে যদি আরব বণিকদের অবাধ যাতায়াত ঘটে থাকে, তাহলে গাঙ্গেয় দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে বরিশালের কোন না কোন সমুদ্র বন্দরের সাথে আরব বণিকদের যোগসূত্র থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। এ অর্থে চট্টগ্রামের মতোই বরিশালে ইসলামের ইতিহাস পুরনো হওয়া অসম্ভব নয়। তবে খরস্রোতা নদী-সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে বরিশালের গ্রাম-জনপদ-শহর যেভাবে তার গঠন মুহূর্ত থেকেই ভাঙছে, তাতে প্রাচীন সভ্যতার কীর্তিরাশির সন্ধান পাওয়ার কথা নয়। পঞ্চমত, ভাঙ্গাগড়ার নিয়ত বৈচিত্রে বেড়ে ওঠা বরিশালের সভ্যতাকে অনেকে খুব সাম্প্রতিক বলে মনে করেন। বরিশালের মৃত্তিকা গঠন ও তার স্থায়িত্বের কারণেই সম্ভবত এ রকম মন্তব্য। কিন্তু বরিশাল অঞ্চলের মানুষ আজও যেভাবে নদী-তাড়িত হয়ে বারবার স্থানচ্যুত হচ্ছে এবং নতুন নতুন বসতি-সভ্যতা গড়ে তুলছে, তাতে একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, বরিশালের সভ্যতা ও

জনবসতি আদৌ সাম্প্রতিক নয়। বারবার ভূমিক্ষয় এবং ভূমি গঠনের কারণে মনে হতে পারে যে, এ জেলার জনবসতি অতি সাম্প্রতিক। কিন্তু এর অধিবাসীরা প্রাচীন এবং অতীত সভ্যতার উত্তরাধিকারী। ষষ্ঠত, আর্যরা মুসলিম বিজয়ের আগে অমুসলিমদের 'অসুর' রূপে চিহ্নিত করেছে। সমুদ্রযাত্রাকে কঠোর ধর্মীয় শাস্তির ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করেছে। সুতরাং এখানে ইসলাম-পূর্বকালে সমুদ্রতীরে যারা বাস করতো, তারা কোনভাবেই আর্যানুগত 'হিন্দু' হতে পারে না। তাছাড়া আর্যদের ভারত-ভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করতে যেয়ে যেসব দুর্দান্ত সংগ্রামী জনগোষ্ঠীর সাথে লড়াই করতে হয়েছে, তারাই বা কোথায় গেল ? এ কথা সবাই জানেন যে, দীর্ঘকাল আর্যদের বাংলায় আগমন প্রতিরুদ্ধ ছিল। আর্য-মানস উদ্ভূত হিন্দু ঐতিহাসিকরা যেমন তাদের পূর্ববর্তী আদি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিকৃত ও বিভ্রান্ত তথ্য দিয়েছেন, তেমনি বৃটিশ ঐতিহাসিকরাও এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য উদ্ধারে কিছুমাত্র আন্তরিক ছিলেন না। এসব কারণে তারা খুব সহজেই বলতে পেরেছেন যে, বাংলার তথা বরিশালের বিপুল সংখ্যক মুসলমান 'নীচু শ্রেণীর' হিন্দুদেরই ধর্মান্তরিত অংশ। এ উক্তি যথার্থ নয় এবং এ বিষয়টি নির্ণয় করার জন্য এখনও গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

বরিশালে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লেখক-ঐতিহাসিকই মাত্র দু'একজন বুযর্গ-আউলিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র) এবং হযরত শাহ ওয়াজির আলী (র)। এঁদের আগমনকালের ব্যাপ্তি কোনক্রমেই পাঁচ-ছ' শ বছরের বেশি নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এঁদের আগমনের আগে কি ঐসব অঞ্চলে কোন মুসলমান ছিলেন না? ইসলাম প্রচার ও ইসলামের শরীয়তী শিক্ষায় মুসলমানদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনটাই সম্ভবত এ বুযর্গ ওলীদের মূল দায়িত্ব ছিল। ওলী-দরবেশরা যেহেতু তাঁদের সহজ-সরল জীবনধারা, অলৌকিক কার্যক্রম, অতুলনীয় মানবপ্রেম ইত্যাদির কারণে লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন, সুতরাং এ বুযর্গগণ পূর্বেই ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের মাঝে

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারেই অধিক মনোনিবেশ করেছেন। বরিশালের ইসলাম প্রচারের ইতিহাস মাত্র পাঁচ–ছ'শ বছরের প্রাচীন, এ কথা মেনে নেয়া কঠিন। অথচ তার আগের ইতিহাস উদ্ধার করাও সম্ভব হয়নি। এ কারণেই আমি আমার আলোচনায় এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, বরিশালে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস মাত্র পাঁচ শ বছরে সীমিত করা চলে না। প্রাপ্ত ইতিহাস যদি সত্য ধরে নিতে হয়, তাহলে বরিশালে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস সূত্র হবে খুবই সীমিত। এ কারণেই আমি আমার আলোচনার প্রেক্ষাপটকে একটু বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছি, যাতে গবেষকদের জন্য চিন্তার দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা, তথ্যদুর্লভতা ইত্যাদি সত্ত্বেও এ সংস্করণটিকে পূর্ণাঙ্গ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমি চেষ্টা করেছি অতীত ও বর্তমানের সাথে একটি গ্রন্থি রচনার। এর সাফল্য–ব্যর্থতা বিচারের ভার পাঠকের।

গ.

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন–এর গবেষণা বিভাগ আমার উপর এ গুরু দয়িত্বটি ন্যস্ত করে একদিকে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন । অন্যদিকে আমাকে এক দুঃসাধ্য গবেষণা কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন। লিখার আগে যতটা সহজ মনে করেছিলাম, লিখতে বসে মনে হয়েছে কাজটি কিছুটা দুঃসাধ্যও বটে। দুঃসাধ্য এ কারণে যে, 'বরিশালে ইসলাম'–এর উপর কোন পরিপূর্ণ গবেষণা কর্ম সহজলভ্য ছিল না। এবং প্রয়োজনীয় রেফারেন্স পুস্তকের অভাব আমার গবেষণা কর্মকে জটিল ও বাধাগ্রস্ত করেছে বার বার। নিরন্তর চেষ্টায় আমি তার কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি মাত্র।

'বরিশালে ইসলাম' শীর্ষক গবেষণা কর্মের গুরু দায়িত্ব বহনে ইতিপূর্বে কোন কোন প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত গবেষকের অপারগতার কারণ সম্ভবত এখানেই।

গোটা বাংলাদেশের ভূ–পরিগঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশের বৃহত্তর অঞ্চলই সমতল ভূমি এবং গাঙ্গেয় পলিদ্বারা গঠিত। খরস্রোতা নদীতরঙ্গ ছাড়া বাংলাদেশের তেমন কোন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা নেই। আর সে কারণেই

আমাদের এ জনপদটি সন্নিহিত অবস্থানে সংহত। আমার কাছে মনে হয়েছে, কেবলমাত্র নদী ভাংগণের কারণেই এ দেশের মানুষের ঘন ঘন স্থানান্তর ও নয়া বসতি স্থাপনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। ফলে এ সব এলাকার জনবসতির সূচনা কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক হলেও জনগণের নৃ-তাত্ত্বিক ও সামাজিক ভিত্তি প্রাচীন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণেও জনবসতির স্থানান্তর ঘটেছে।

মানব জাতির আদি যোগাযোগ মাধ্যম সম্ভবত নৌ-পথ। বিশ্ব মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সমুদ্র উপকূলেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে বেশী। আরব-আফ্রিকী জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকেই নৌ-পথ সম্পর্কে ছিলেন অভিজ্ঞ এবং তারা ছিলেন সমুদ্রবিহারী। এ কারণে সমুদ্র-সংযোগ সূত্রে সওদাগর-বণিকদের মাধ্যমেই ইসলামের প্রসার ঘটেছে।

আমার কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, চট্টগ্রামের সমুদ্র-সংযোগেই শুধু ইসলাম প্রচারিত হয়নি। ইসলাম আগমনে দক্ষিণের দ্বারও ছিল উন্মুক্ত। ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, দক্ষিণে 'সামান্দর' বন্দর নামে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ এক নগর-জনপদ ও বাণিজ্য কেন্দ্রের অবস্থান ছিল। এটি চাঁদপুরের বিস্মৃত অতীত সাক্ষী হলেও হতে পারে; তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্ত টানতে চাই যে, আরবের সাথে এই সামান্দর বন্দরের প্রাচীন বাণিজ্যিক যোগসূত্র থাকার কারণে চট্টগ্রামের মতো দক্ষিণ জনপদেও সরাসরি ইসলামের আলো প্রবেশ করেছিল। বরিশাল এই ধারার প্রত্যক্ষ অংশীদার ও ফলভোগী। চাঁদপুরের সাথে বরিশাল এলাকার দীর্ঘকালীন বাণিজ্য সম্পর্ক ইতিহাসের বিস্মৃত ধারার সাথে সংযোগ সূত্র নির্মাণের ইংগিতবাহী।

বরিশাল অঞ্চলের জনপদ গঠন সাম্প্রতিক হওয়াই স্বাভাবিক। অবারিত চরাভূমি মূল জনপদের জনগোষ্ঠীকে প্রলুব্ধ হাতছানিতে ডেকেছে। ফলে বিভিন্নস্থান থেকে মুসলমানরা গিয়ে বরিশাল এলাকায় জনবসতি গড়েছেন। সুতরাং বরিশালের জনপদ সাম্প্রতিক এবং ক্ষণভংগুর হলেও তার জনগোষ্ঠী

প্রাচীন এবং ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে বা ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার বাইরে অভিবাসন-ধারায় বরিশালে মুসলমানদের জনবসতি গড়ে উঠেছে।

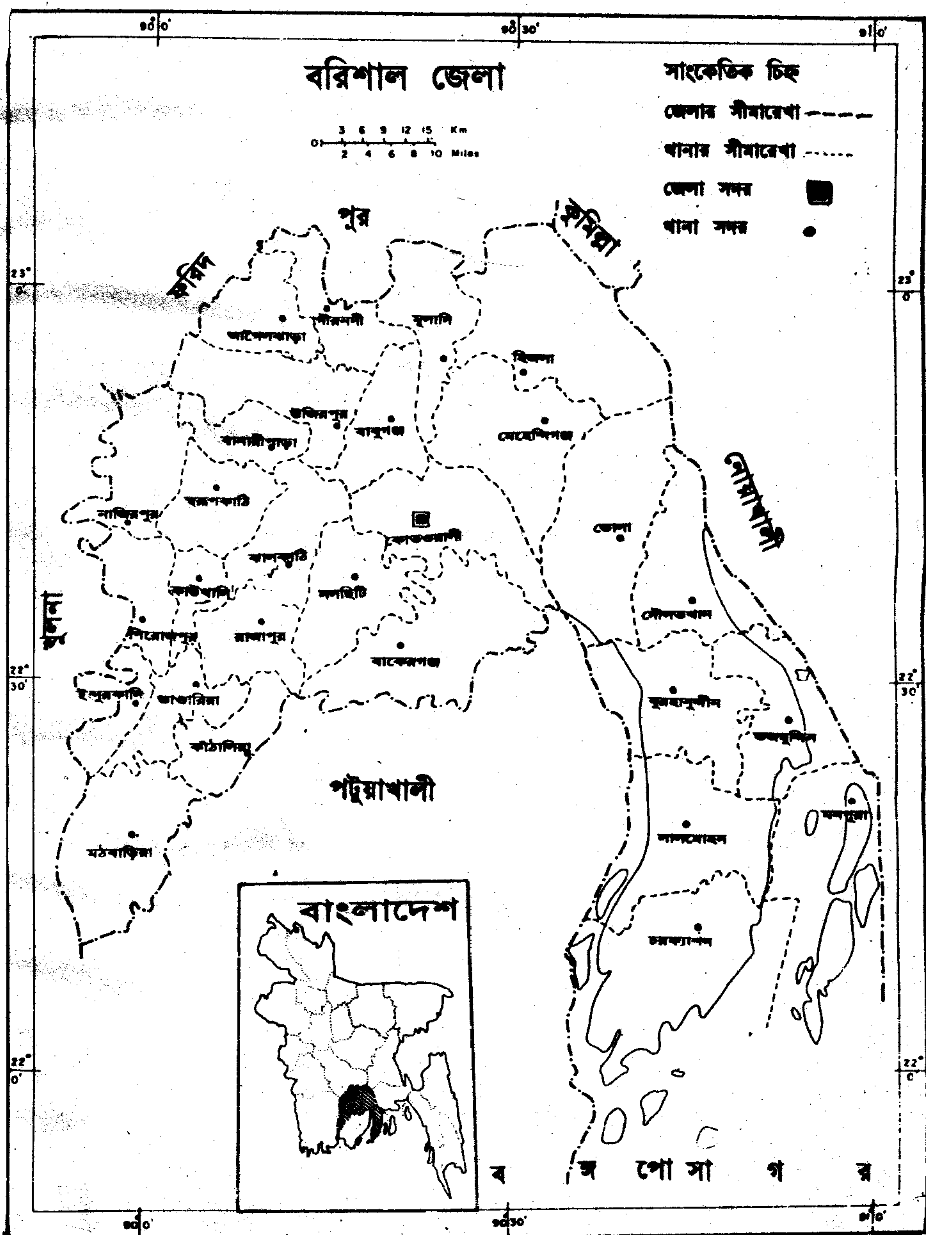
জেলা গেজেটিয়ার সহ অন্যান্য প্রমাণ্য গ্রন্থ, যা বরিশালের উপর রচিত হয়েছে, তাতে বরিশালে ইসলাম প্রচার শীর্ষক কোন প্রাচীন তথ্যধারা নেই। ফলে আমাকে এ ক্ষেত্রে নতুন গবেষণা সূত্র নির্মাণ করার ঝুঁকি নিতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার কাজটিই চূড়ান্ত-এ দাবী করার যুক্তি নেই। তবে আমি মনে করি আমার গবেষণা কর্মটি এ ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । এ ব্যাপারে আরও গবেষণা-কর্ম সাধিত হলে ইতিহাসের গোপন প্রকোষ্ঠ হতে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। সাবেক বরিশাল এখন আরও পাঁচটি জেলায় বিভক্ত। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন যখন জেলাভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়, তখন এই বিভক্তি ঘটেনি। বরিশালকে মূল জনপদ ধরে এই গবেষণা গ্রন্থের নাম কিঞ্চিৎ পরিমার্জন করে "বরিশালে ইসলাম" করা হয়েছে। ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা ও পটুয়াখালীর ইসলাম প্রচারধারা সুনির্দিষ্ট ও বিস্তৃতভাবে এ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি। গ্রন্থের কলেবর যাতে আরও না বাড়ে, সেদিকে নজর দিতে গিয়েই এটা করা হয়েছে। উপরন্তু ফাউণ্ডেশন গবেষণা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে গিয়ে বরিশাল জেলার সীমায়ই আমাকে থাকতে হয়েছে। এ কারণে ঐ সব অঞ্চলের ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, ইসলামী সংগঠন ও ব্যক্তিত্বদের বর্ণনা অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে গেলে আমি দুঃখিত। বরিশাল পরিসরের এই আলোচনায় যদি কোন তথ্যগত ভূল থাকে, কিংবা কোন বিষয় অনুল্লেখ্য থেকে থাকে, তবে কোন সচেতন সহৃদয় পাঠক আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেব ইনশা আল্লাহ। প্রাসঙ্গিকভাবে আর একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করছি যে, ফাউণ্ডেশন গবেষণা নির্দেশিকা অনুসরণ করার কারণে কেবল 'বরিশালে ইসলাম' পর্যায়ে আমি সীমাবদ্ধ থাকিনি। এ দেশে ইসলামের আদি সংযোগ ইতিহাস এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ভূ-রাজনৈতিক-সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসও টানতে হয়েছে। ফলে গ্রন্থের কলেবর বেড়েছে। এটা 'বরিশালে ইসলাম' পর্যায়ে পৌছুতে পাঠককে বিলম্বিত করলেও বিড়ম্বিত করবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

এ গ্রন্থ রচনা ও সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে যে তওফীক দিয়েছেন, সে জন্য তাঁর দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাই। ফাউণ্ডেশনের গবেষণা বিভাগের পরিচালক, উপ পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা, সহকারীবৃন্দ এবং সংশোধনী কাজে নিষ্ঠার সাথে নিয়োজিত থেকে যাঁরা এই গ্রন্থের প্রকাশনা সম্ভব করে তুলেছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ হাফিজ।

আজিজুল হক বান্না
পোষ্ট অফিস রোড
পূর্ব বাড্ডা,
গুলশান, ঢাকা-১২১২

সূচীপত্র

বরিশালে ইসলাম



বরিশাল জেলা
সাংকেতিক চিহ্ন
জেলার সীমারেখা
থানার সীমারেখা
জেলা সদর
থানা সদর
3 6 9 12 15 Km
0 2 4 6 8 10 Miles
90°0'
90°30'
91°0'
23° 0'
22° 30'
22° 0'
ফরিদ
পুর
কুমিল্লা
নোয়াখালী
খুলনা
আগৈলঝাড়া
গৌরনদী
মুলাদি
হিজলা
উজিরপুর
বাবুগঞ্জ
মেহেন্দিগঞ্জ
বানারীপাড়া
স্বরূপকাঠি
নাজিরপুর
ঝালকাঠি
কোতওয়ালী
নলছিটি
কাউখালি
পিরোজপুর
রাজাপুর
বাকেরগঞ্জ
ইন্দুরকানি
ভান্ডারিয়া
কাঁঠালিয়া
মঠবাড়িয়া
ভোলা
দৌলতখান
বোরহানুদ্দীন
তজুমদ্দিন
লালমোহন
চরফ্যাশন
মনপুরা
পটুয়াখালী
বাংলাদেশ
ব ঙ্গো প সা গ র

প্রথম অধ্যায়

মানব বসতি ঃ আল কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

পৃথিবীর সৃষ্টি, বিস্তৃতি, ধ্বংস, ভাঙ্গাগড়ার নিখুঁত ইতিহাসের কোন চালচিত্র বা তথ্যপঞ্জী আমাদের হাতে নাই। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মতে, দৃশ্যমান মানব বসতি উপযোগী পৃথিবী সৃষ্টির আগে গোটা বিশ্ব চরাচর জুড়ে অথৈ পানির বিস্তার ছিল। কোন ভৌগোলিক প্রক্রিয়ায় কখন পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, তার পূর্ণাবয়ব চিত্র আমাদের সঞ্চয়ে নাই। মানব সভ্যতা বিকশিত ও সুবিন্যস্ত হবার সাথে সাথেই বিজ্ঞানের লক্ষ্যভেদী গবেষণার অভিযাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বিজ্ঞান তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিশ্ব-প্রকৃতির যতটুকু রহস্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। মানুষের অনুভব-অনুভূতি অভিজ্ঞানের নিরিখে বিজ্ঞানের সাধনালব্ধ সুফলকে দুর্ভেদ্য রহস্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

'সূরা হূদ'-এর সাত নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ''যখন তাঁহার আরশ পানির উপর ছিল, তখন তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন।"

-আল-কুরআন

মানুষের আদি উৎস, তার জৈবিক ও নৃতাত্ত্বিক বিকাশ ও বিবর্তনের কুরআনিক ভাষ্য আমাদের যে সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তা হচ্ছে ঃ গোটা পৃথিবী একটি অখণ্ড একক ইউনিট। আর মানুষের আদি পিতা আদম ও মা বিবি হাওয়া। আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কারণে আদম-হাওয়াকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়। দুনিয়াতে আদম বসতির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত একই নিয়মে মানুষের জীবনের উদ্ভব, বিকাশ ও মৃত্যু ঘটছে। এ নিয়মে কোন ব্যত্যয় ঘটছে না। অর্থাৎ দৃশ্যত বিভক্ত এ বিশ্বে একই মানব জাতির অধিবাস। ভাষা, বর্ণ, আকৃতি, নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য ইত্যাদির বিভিন্নতা থাকলেও মানুষ এক অখণ্ড ও বৃহত্তর জাতিসত্তার উত্তরাধিকার। বর্তমানের সংঘাত-সংক্ষুব্ধ ও যুদ্ধ ব্যাপ্ত স্বার্থ-দ্বন্দ্বে বিক্ষত বিশ্বে

যদিও এই মৌলিক চেতনা উপেক্ষিত, তা সত্ত্বেও বিশ্বজনীন মানব শৃঙ্খলের বন্ধন প্রায়শঃই দুর্বিপাকে, যুদ্ধে–শান্তিতে, উল্লাসে–আনন্দে, দুঃখে–যাতনায় ক্লিষ্টতায় দীপ্ত হয়ে উঠে। ধর্ম–কৃষ্টিক বৈপরীত্যে, ভাষার দুর্ভেদ্য প্রাচীর, ভূগোলের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে আজও মানবিক ঐক্য–চেতনার তরঙ্গ বিদ্যুতায়িত হয় হৃদয় থেকে হৃদয়ে, জাতির অনুভূতি থেকে অনুভূতিতে। রাষ্ট্রীয় শাসন–শৃঙ্খল কিংবা খণ্ডিত আইনের বাধা এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ। এই সত্যটিকে বিশ্লেষণ করলে দুনিয়াব্যাপী এক অখণ্ড মানব সত্তারই পরিচয় মেলে।

আল্লাহ্ বলছেন ঃ ১. ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে একজাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে। –সূরা নাহ্ল ঃ ৯৩

২. "এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে। অতঃপর তিনি মানব জাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।" –সূরা ফুরকান ঃ ৫৪

৩. "তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন তোমরা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছ।..........এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদিগের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। ইহাতে জ্ঞানীদিগের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।" –সূরা রূম ঃ ২০–২২

৪. "মানুষ ছিল এক জাতি, পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে, তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায়, তাহার মীমাংসা তো হইয়াই যাইত।" –সূরা য়ূনুস ঃ ১৯

পৃথিবী সৃষ্টির মুখ্য উপকরণ এবং মানুষ সৃষ্টির মৌল উপকরণের মধ্যে সাযুজ্য রয়েছে। আল্লাহ্‌র সীমাহীন বরকত–রহমতের মধ্যে এটিও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায়ই মানব জাতিকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করেছেন।

তাদের ভাষা, রীতিনীতি, আকৃতি-রুচি ইত্যাদিতে রয়েছে নানান ধর্মী বৈচিত্র্য। আর এই বিচিত্র বৈপরীত্যের দেয়াল অতিক্রম করে মানব জাতি পরস্পর যে বৃহত্তর ঐক্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নির্মাণ করে, তাতেই আল্লাহ্‌র রেযামন্দী অর্জিত হয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে অভিন্নতা এবং বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্যের তাকিদ রয়েছে সৃষ্টি-রহস্যের মাঝে। তবে এই বৈচিত্র্যকে যারা অনৈক্য, বিভেদ ও সংঘাতের সূত্র বলে মনে করে তারা বিভ্রান্ত, তারা অসৎ পথানুসারী। তারা মানব জাতির উত্তরাধিকারিত্ব বহনের অযোগ্য। 'যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।' -পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র এই ঘোষণার অর্থ হচ্ছে, যারা আভিজাত্য, বর্ণ, ভাষা-স্থান-কাল-পাত্রভেদে অহংকারে স্ফীত হয় এবং মানব জাতির অপর অংশকে তুচ্ছ মানবেতর জীব মনে করে, তাদেরকে আল্লাহ্‌ বিভ্রান্ত করবেন। যেহেতু মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে, স্বাধীনতা রয়েছে তার ইচ্ছাশক্তির এবং এটা আল্লাহ্‌ নিজেই ব্যক্তি মানুষকে খলীফা হিসেবে দান করেছেন। এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের বিচার করাটা সম্ভবত যুক্তিযুক্ত হতো না। অবশ্য মানুষকে মেধা, মনন, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা দিয়ে 'আশরাফুল মখলুকাত'-'সৃষ্টির সেরা জীব' রূপে তৈরি করেছেন। তবে সৃষ্টির মাঝে নির্বোধ, প্রতিবন্ধী মানুষও আমরা দেখছি। এদের সম্পূর্ণ নিখুঁত করে তোলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানেই মানুষের সীমাবদ্ধতা। অন্যদিকে, এ সত্য আরও প্রকট হয়ে উঠে যে, আল্লাহ্‌ তাঁর বিশেষ রহমতের কারণেই অধিকাংশ মানুষকে নির্বোধ বা প্রতিবন্ধী হিসেবে তৈরি করেননি। যারা ব্যাপক বৈচিত্র্যের মাঝেও নিজেদের মানব জাতির অখণ্ড ঐক্যের দূত মনে করেন, তাদের আল্লাহ্‌ সৎপথেই পরিচালিত করেন।

আয়াতের শেষ অংশে মানুষের একাউন্টিবিলিটির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের যে অঙ্গীকার মানুষের জন্য পালন করা অপরিহার্য, তা উপেক্ষিত হলে তার কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞেস করা হবে। এভাবে মানুষের চেতনায় একটি নৈতিক মূল্যবোধ ও দায় শোধের ভীতি জাগিয়ে তোলা হয়েছে।

দু' নম্বর আয়াতে মানব জাতির মধ্যকার রক্তগত ও বৈবাহিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এটি সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক বিকাশের সূত্র। মানব জাতির বিকাশ ও সম্প্রসারণের ধারা পর্যালোচনা করলে এ সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, কোন একটি জনগোষ্ঠী বা জাতি আপন দেহে একক রক্তধারা ধারণ করে না। বিভিন্ন রক্ত স্রোত সংমিশ্রণের ফলে একটি মাল্টি নেশন বা বহুজাতিক রক্তধারা মানুষের শরীরে মিশে আছে। এ অর্থে মানুষ বিশ্ব নাগরিক। তবে রক্ত ও জন্মসূত্রে কিছু কিছু জাতি আভিজাত্যের অহংকার দেখিয়েছে, এখনও দেখাচ্ছে। ইহুদী জাতি-গোষ্ঠী বর্ণবাদী অভিশাপের নায়ক। জার্মানীর হিটলারও নীল রক্তের বড়াই করেছেন। এ উপমহাদেশে বহিরাগত আর্য-হিন্দু-ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে আর্যরক্তের শ্রেষ্ঠ সন্তান মনে করে। এ দেশে তারাই বর্ণাশ্রম প্রথা চালু করে। মধ্যযুগে, ঔপনিবেশিক আমলে কিংবা একালের কোন কোন দেশে শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে উচ্চবর্ণের অভিজাত মনে করে থাকে। কিন্তু বর্ণবাদ আজ ঘৃণিত, ধিকৃত। পবিত্র কুরআনে বর্ণবাদকে ঘৃণা করা হয়েছে। 'বিদায় হজ্জের' ভাষণে মহানবী (সা) আরব-অনারব, সাদা-কালোর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই মানব সমাজের ভিত তৈরি করেছেন।

তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, সব মানুষেরই মাটি থেকেই উৎপত্তি। আদম মাটির তৈরি। মাটিতেই মানুষের দেহ মিশে যায়। আবার এই মাটি থেকেই একদিন আল্লাহ্র হুকুমে তার পুনরুজ্জীবন ঘটবে। মৃত্যুর পরে মহা বিচারের দিনে তাকে জীবন দান করে উত্থিত করা হবে। এই শাশ্বত সত্য নিয়ে মানুষের মনে দ্বন্দ্ব-সংশয় আগেও ছিল, এখনও আছে। এ জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা নবী ঈসা (আ)-কে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার মু'জিযা দান করেছিলেন। তা ছাড়া শস্যহীন রৌদ্রদগ্ধ মাঠে যখন বৃষ্টির পরশ নেমে আসে, তখন তাতে জীবনের উদ্গম হয়। ঠিক একইভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় কবর থেকে মানুষের উত্থান খুবই সম্ভব এবং চিরন্তন সত্য। এই প্রক্রিয়ায় জীবনের উদ্ভব এবং একই প্রক্রিয়ায় মানুষের মৃত্যু একটি একক কেন্দ্রীয় সত্যকেই উচ্চকিত করে তোলে। এভাবেই বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে একটি আদি উৎসে ফিরিয়ে নিতে চান এবং তাদেরকে এক মানবিক ঐক্যানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করতে চান। আয়াতের পরের অংশটি আরও তাৎপর্যময়। 'এখন তোমরা

সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছ' --পবিত্র কুরআনের এই সত্য ও সুষ্ঠু ভাষণ থেকে মানুষের সমাজ গঠন ও সভ্যতার ক্রম বিবর্তন এবং সম্প্রসারণের চিরন্তন নীতিকেই প্রতিফলিত করা হয়েছে। 'সূরা রা'দ'-এর চতুর্থ আয়াতটি এ প্রসঙ্গে অর্থপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। "তিনি ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করিয়াছেন দুই প্রকারের।"

বিশাল এ পৃথিবী বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নানারূপ আবহাওয়া, দুরন্ত নদী-সমুদ্র, দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পর্বত দিয়ে ঘেরা। আল্লাহ্ বলেছেন, পৃথিবী রক্ষার জন্যই পাহাড় সৃষ্টি। এই আয়াতের তাৎপর্যময় কথা হচ্ছে ঃ "তিনি ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন........"-মানব জাতির বংশধরদের বসবাস করা এবং সভ্যতার আবাদ করার সুযোগ দান ছাড়া এর আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? সৃষ্টি সূচনা থেকে দুটি মানব-মানবী উৎসারিত লক্ষ কোটি মানুষ আজ বিশ্বময় বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়ছে। ভূতল যদি বিস্তৃত না হতো, তাহলে মানুষের নতুন নতুন বসতি গড়ে তোলার অন্তহীন প্রয়াস বাধাগ্রস্ত হতো এবং মানবীয় সমাজ সংকীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ত। মানব সভ্যতার বিকাশ-বিস্তৃতি অবরুদ্ধ হয়ে যেত।

সূরা হিজ্‌র-এর ২৪ আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন ঃ "তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে আমি তাহাদিগকে জানি এবং তোমাদিগের পরে যাহারা আসিবে তাহাদিগকেও জানি।"

মহান আল্লাহ্‌র এই সুস্পষ্ট ঘোষণা থেকে সর্বজ্ঞাত পবিত্র সত্তার আর একটি সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে যেটি প্রাসঙ্গিক, তা হচ্ছে; মানব জাতির আদি উৎস ধারাক্রম থেকে শুরু করে তার বিকাশ, সম্প্রসারণ ও সভ্যতার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ সরাসরি বলেছেন মানুষের একক জাতিসত্তার কথা। ''মানুষ ছিল এক জাতি, পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে" -আদিতেও মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার প্রবণতা ধরা পড়ে, যার পরিণতিতে তাকে জান্নাতী আবাস ছেড়ে দুনিয়ায় নেমে আসতে হয়। একটি

নির্দিষ্ট সময় দুনিয়াতে তার জন্য বরাদ্দ করা হয়। তাকে বলা হলো ঃ আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হলে তার মুক্তি, অন্যথায় জাহান্নামের আযাব। কিন্তু দুনিয়ায় এসেও আদমের বংশধররা ইবলিসের আনুগত্য করতে থাকে। মানব জাতির মতভেদের উৎসমূল এটাই। সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব থেকেই মানব জাতির বিভক্তি। অথচ যে বিষয়গুলো নিয়ে মানুষ মতভেদ করে আল্লাহ্র পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায়, তার মীমাংসা তো হয়েই যেত —সূরা ঃ ১৯

মহান রব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন, অঙ্গীকার দিয়েছেন যে, একটি নির্দষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষ পৃথিবীতে স্থিতি করবে। তারপর তার ইহজাগতিক মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী যারা দুনিয়ায় চলছে, তারা মহাবিচারের দিনে পুরস্কৃত হবে। আর যারা নাফরমানী করেছে, তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের পরে পুনরুত্থান ঘটবে সকল মানুষের। মহান আল্লাহ্ এই ঘোষণা পূর্ণ করতে চান বলেই মানুষ জাতির বাক-বিতণ্ডা ও মতভেদ-এর চূড়ান্ত ফয়সালা করছেন না।

অবশ্য কিয়ামতের সেই মহাধ্বনি শ্রুত হবার আগে দুনিয়াতে আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টি করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, সাইক্লোন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, খরা, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, মহামারী, প্রভৃতি বিপর্যয় দেন। এগুলো মানুষের পরীক্ষার জন্য এবং মহান আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য। "আমি কোন জনপদকে তাহার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইলে ধ্বংস করি না।" —সূরা হিজ্‌র ঃ ৪

অন্যত্র ''এমন কোন জনপদ নাই যাহা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করিব না। অথবা যাহাকে কঠোর শাস্তি দিব না। ইহা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।" —সূরা ইসরা ঃ ৫৮

''নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি। তোমার প্রতিপালকই তাঁহার দাসদিগকে পাপাচারণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।"

—সূরা ইসরা ঃ ১৬

নূহের মহাপ্লাবন বিশ্ব ইতিহাসের এক জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছে মানব জাতির কাছে। মানব জাতির জ্ঞাতসূত্রে নূহের মহাধ্বংসের স্বাক্ষর রয়েছে। আধুনিক মানবিক গবেষণায় নূহের কিশতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এমন হতে পারে যে, নূহের প্লাবনই মানব জাতির জন্য প্রথম বিপর্যয়। কিন্তু তারপরও অসংখ্য মানবগোষ্ঠী আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংস এবং বিপর্যয় মানুষেরই কর্মফল । যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যে নিষ্ক্রিয়, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাহীন নন, এর মাধ্যমে তা অনুধাবন করা যায়। অন্যদিকে কিয়ামতের মহাধ্বংসের ইঙ্গিতময় সত্যতাও এতে প্রতিফলিত হয়। আর তাই কিয়ামতের দিনের আগে সকল জনপদই ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করবে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মানব জাতির উত্থান ও বিশ্ব জগতের ভাঙ্গাগড়ার এই প্রক্রিয়াটি এ জন্যই উপস্থাপন করছি যে, মূলত মানুষ হচ্ছে একটি অখণ্ড জাতিসত্তার প্রতিভূ। হযরত আদম এবং বিবি হাওয়া সিংহলের (বর্তমান শ্রীলংকা) সরণদ্বীপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। বর্তমান বিশ্বের যে মানচিত্র আমরা দেখছি, তা আদিতে এমনটা ছিল, তা বলা যাবে না। আমাদের কালেই আমরা প্রত্যক্ষ করছি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নদী–সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতের ভাঙ্গাগড়া, ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ঘটনায় পৃথিবীর জনপদসমূহের আকৃতি–প্রকৃতি বদলায়। পুরানো জনপদের বিলুপ্তি এবং নতুন জনপদের অভ্যুদয়, নতুন সভ্যতার অবক্ষয় প্রতিনিয়ত ঘটছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নতুন নতুন সৃষ্টি, একটি জনপদের বিলয় বা বিলুপ্তি এবং তৎপরবর্তীকালে সম্পূর্ণ নতুন ভূখণ্ডের অভ্যুদয় বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। নদী–সমুদ্র কিভাবে তার বুকে নতুন জনপদের উদ্ভব ঘটায়, সে দৃশ্যও আমরা দেখছি। সুতরাং আমরা স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক সূত্র ধরে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, এখন আমরা বিশ্ব মানচিত্রের যে অবয়ব দেখছি, হাজার হাজার বছর আগে তার অবয়ব এমনটা ছিল না। থাকার কথা নয়। কুরআনে আল্লাহ্‌ যেমনটা ঘোষণা করেছেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পার হলে জনপদ ধ্বংস করা হয়। হাজার হাজার বছরের ধ্বংস, সৃষ্টি–গড়ার প্রক্রিয়ায় ভূ–মানচিত্র স্থির নয়, নিয়তই পরিবর্তনশীল। এ ছাড়াও মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ–বিগ্রহ, প্রতিকূল প্রকৃতির দুঃসহ

যাতনা কিংবা ভাগ্য বদলের দুর্বার অন্বেষায় মানুষ প্রতিনিয়ত 'বিস্তৃত ভূতলে' নতুন নতুন বসতি গড়ে তোলে। ফলে কোন একটি এলাকায় একক মানবগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষরা বাস করার সুযোগ পায় না। অবাধ্যতা, সীমালংঘনের জন্য আল্লাহ্ এক-একটি জাতিকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে তদস্থলে নতুন মানবগোষ্ঠীকে স্থলাভিষিক্ত করেন। পবিত্র কুরআনে এ সত্যও উদ্ধৃত। সুতরাং আজকের বাংলাদেশের মানচিত্র যে অঞ্চলটি নিয়ে গঠিত অথবা যে মানবগোষ্ঠী এ দেশে বসবাস করছে, তারা সুপ্রাচীন আদিতেও এমনই ছিল এবং দৃশ্যমান মানচিত্রটিও অবিকল এ রকম ছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই। বরং ভূপ্রাকৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্যান্য জনপদের মতো বাংলাদেশের এই ভূ-খণ্ডটিও রূপান্তরিত হয়ে থাকবে। কখন, কিভাবে, কোন্ অবস্থা থেকে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে, তা বলা কঠিন। এমনকি, বর্তমান মানচিত্র কতকাল অবিকল টিকে থাকবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। 'নদী মেখলা-সাগর' সোহাগী পলি সমন্বিত বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডটি প্রতিনিয়ত ভাঙছে-গড়ছে। পদ্মা-মেঘনার কূলে কূলে কালে কালে কত শত জনপদ ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তার খবর কে রাখে। পদ্মার এক নাম তো 'কীর্তিনাশা'-ধ্বংসের প্রতিভূ। মানব সভ্যতার কত শত কীর্তি প্রমত্তা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, তার খবর রাখা সত্যি কঠিন। তবে বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে মানব বসতি গড়ে উঠার শুরুতেও নদীর প্রকৃতি অভিন্ন ছিল। কখনও তার স্রোতের গতি তীব্র, কখনও শ্লথ। অসংখ্য নদীবেষ্টিত এ দেশের নরম-পেলব সমতল ভূমি শ্যামল-সবুজের মায়াবী আবীর দিয়ে ঘেরা। খরস্রোতা নদীর অভিঘাতে দ্রুত ক্ষীয়মান এবং পলি প্রাচুর্যে ভরপুর এ জনপদের সহ্যশক্তি যেমন স্বল্প, তেমনি তার বেড়ে উঠার সম্ভাবনাও প্রচুর। দক্ষিণ-পূর্বে নদী-সমুদ্রের সঙ্গমে সৃষ্ট খরস্রোত যেমন প্রতিনিয়ত গ্রাম জনপদ ভাঙছে, তেমনি দ্রুত নতুন নতুন সমতলভূমি গড়ে উঠছে-ভবিষ্যত বংশধরদের সভ্যতার আবাস হিসেবে।

হিমালয় থেকে উৎসারিত বিপুল বিশাল পানির ঢল নেমে আসছে এবং বাংলাদেশের গেটওয়ে দিয়ে তা পতিত হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। উজানের ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার উপশাখা বাহিত পানি নিষ্কাশনের একমাত্র প্রাকৃতিক ড্রেন ধারণ করে

আছে বাংলাদেশ। ফলে তীব্র স্রোত, বন্যার উচ্ছ্বসিত পানি প্রবাহ এবং একইভাবে অফুরন্ত পলি এসে জমছে আমাদের নদী-সমুদ্রে। শ্রম ও উচ্ছ্বাসে সভ্যতার জনপদ যেমন ভাঙ্গে, তেমন গড়ছেও। ভূ-প্রকৃতি নদী-নালা, পাহাড়-পর্বতের গঠনশৈলী ও প্রকৃতি আচরণ ইত্যাদি থেকে এ সত্যই উপলব্ধ হয়। আমাদের নদীর অস্থির চঞ্চল প্রকৃতির ছাপ পড়েছে জন-মানসে। অস্থিরচিত্ততা আবেগ বিহবলতা তাই এ দেশের জনগোষ্ঠীর একটি মানস বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান বিশ্ব মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, ভারত মহাসাগরকে আলিঙ্গন করে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরকে কোলে নিয়ে একটি বিস্তৃত অঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে। এই জনপদের একটি ক্ষুদে অংশ আমাদের বাংলাদেশ। হিমালয়ের শক্তিতে এ জনপদটির ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। দূরত্ব যতই হোক, মানববসতির সূচনালগ্ন থেকেই যে আরব সাগর থেকে বাণিজ্য পোত বা অনুসন্ধানী দিগ্বিজয়ী নাবিকরা বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে মানববন্ধনের গোড়াপত্তন করে এসেছিল, তা এখন স্পষ্ট। উপমহাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের গঠন বৈশিষ্ট্য সুপ্রাচীনকালে এতটা দূরত্বজ্ঞাপক নাও থাকতে পারে। নদী-সমুদ্রের অভিঘাতে জনপদ বিলুপ্ত হবার ঘটনা যখন আমাদের জানা আছে, তখন এ ধারণা পোষণ করা কঠিন নয়। হযরত আদম (আ)-এর অবতরণ ক্ষেত্র সরণদ্বীপ যদি ঠিক থাকে, তাহলে তাঁর আরবে গিয়ে উপনীত হবার ঘটনাও সঠিক। এমন হতে পারে যে, সরণদ্বীপ থেকে ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক দূরত্ব কম ছিল।

আমরা জানি, আমেরিকা আবিষ্কার মানব সভ্যতার অতি নিকটতম বিজয়। কিন্তু তার আগে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার মধ্যে মানব সভ্যতার যোগসূত্র ছিল ঘনিষ্ঠ। এর কারণ প্রধানত অঞ্চলগুলির পারস্পরিক ভৌগোলিক সান্নিধ্য ও সংলগ্নতা এবং নৌ-পথে যোগাযোগের সহজলভ্যতা। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়াও যে বিচ্ছিন্ন ছিল এমন ভাবা সঙ্গত নয়।

মিসরীয় সভ্যতাকে প্রাচীনতম সভ্যতার মাঝে গণ্য করা হয়। যার অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশে এবং এশিয়ার অতি সংলগ্ন। মিসরের ডানে এশিয়া, মাথার

উপরের দিকে স্পেন–ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিলেই ইউরোপের ভূখণ্ড। মিসরের পোর্ট সৈয়দ বন্দর দিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপকে জানার যেমন আয়াসসাধ্য সুযোগ রয়েছে, তেমনি লোহিত সাগর পার হয়ে এডেন হয়ে বোম্বাই–কলম্বো হয়ে মাদ্রাজের উপকূল ধরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর যত দূরত্বেই থাক না কেন, তার নাগাল পাওয়া অনুসন্ধানী নাবিকদের জন্য কোন কঠিন কাজ ছিল না। এমনকি, দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলভাগ ধরে জাঞ্জিবার–সোমালিয়া হয়ে ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) ধরে এডেন বন্দরে বার্তা বিনিময়ের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরেশদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র নবী (সা)–এর নির্দেশে বেশ কিছু নওমুসলিম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে, ইতিহাসের প্রাচীনকাল থেকেই আরবদের সাথে আবিসিনিয়ার নৌ–পথে যোগাযোগ ছিল। যে আবরবা লোহিত সাগরের মুখ ধরে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে আবিসিনিয়া পর্যন্ত যোগসূত্র রচনা করতে পারে, তাদের জন্য আরব সাগরের অপর তীরে করাচী বোম্বে হয়ে চট্টগ্রামে বাণিজ্য পোত ভিড়ানো কঠিন ছিল না।

আরবদের সাথে সুপ্রাচীনকাল থেকেই সিরিয়ার স্থলপথে ব্যবসা–বাণিজ্য ছিল। ঐ সময় আরব নাবিকদের দিগ্বিজয়ী অভিযান দূরকে নিকট করেছে, অজানাকে জানার সুযোগ করে দিয়েছে। এ পর্যন্ত জ্ঞাত ইতিহাসের সূত্র থেকে এটা বলা চলে যে, বাংলাদেশের উপকূলে আরবরাই প্রথম 'ভিনদেশী।' অর্থাৎ এ অঞ্চলের মানুষের সাথে প্রথম বহিরাগত যে জাতির সম্পর্ক রচিত হয়, তারা হচ্ছেন সেমেটিক আরব।

আরব জাতি পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি না হলেও তারা প্রাচীনতম জাতিগোষ্ঠীর সমসাময়িক। ইব্রাহীম (আ)–এর আমলকে অনেকে ঈসা (আ)–এর জন্মের আড়াই হাজার বছর পূর্বকাল হিসেবে মনে করেন। নবী ইব্রাহীম (আ)–এর হাতে কাবাঘর সংস্কার হয়েছিল যখন, তখনও ঐ এলাকায় জনবসতি ছিল। ঈসা (আ)–এর আগে মূসা (আ)–এর অনুসারী, যারা এখন নিজেদেরকে 'ইহুদী' বলে দাবি করেন, তারাও বংশধারায় ইব্রাহীম (আ)–এর রক্তের সাথে যুক্ত।

ইব্রাহীম (আ)–এর দু'স্ত্রী যথাক্রমে বিবি সারা ও বিবি হাজেরা থেকে উদ্ভূত দুটি বংশ ধারার একটির উত্তরপুরুষরা 'ইয়াহুদ' নামে পরিচয় দিতে থাকে। এরা রক্তের আভিজাত্যে অন্ধ বর্ণবাদী। যাহোক, আমার আলোচনার মূল কথা হচ্ছে, কোন্ একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে দু–একটি নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক ধারায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। নদীর স্রোতধারা, সমুদ্রের অথৈ পানির ধারাকে যেমন একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা রূপে বিচ্ছিন্ন করা হাস্যকর, তেমনি মানুষের শরীরে কোন জাতের মানুষের কি পরিমাণ রক্ত মিশেছে তাও জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষায় নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সমসাময়িককালের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় সার্বিক জ্ঞান রাখতেন। আল্লাহ্ নিজেই ঐশী সূত্রে নবীদের মাধ্যমে মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়েছেন। সুতরাং মানুষ একেবারে বর্বর যুগ থেকে নিজের চেষ্টায় অনির্ধারিত বিবর্তনের ধারায় সভ্যতা ও জ্ঞানের উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছে, কুরআনী ভাষ্য তা অনুমোদন করে না। বিশাল বিস্তৃত দুনিয়ায় পবিত্র মনের উন্মাদনা মানুষের জন্মগত। মানুষ যখন চোখ মেলে দেখলো যে, বিশাল বিস্তৃত অথৈ নীল সমুদ্র তাকে হাতছানি দিচ্ছে, তখন কেন তার মাঝে দিগ্বিজয়ের নেশা জাগবে না ?

আদি পিতা আদম যখন পয়লা সাগর–পর্বত নদী বেষ্টিত এই মাটির পৃথিবীতে এলেন, তখন নিশ্চয়ই পানির সাথে তার সখ্যতা ও পরিচয় ঘটেছিল। পানিতে যখন সাঁতার কাটা সম্ভব, তখন হালকা কিছু ভাসানো ও সম্ভব। সম্ভবত এই উপলব্ধি থেকেই নৌ–পথের আবিষ্কার এবং এটা নূহের প্লাবন ঘটার আগেই। এ কারণেই নৌ–পথে মানব বসতিগুলোর সাথে সংযোগ রচনা সম্ভব ছিল এবং সভ্যতা আধুনিকতাক্রান্ত হবার আগেই এ সংযোগ অত্যন্ত কার্যকরভাবে ঘটেছিল।

ইতিহাসের সুপ্রাচীনকাল থেকেই আরব দেশে দাস ব্যবসা প্রচলিত ছিল। এবং মানুষ কেনা–বেচার এ প্রক্রিয়াটা সেকালে সারা দুনিয়ারই একটি বৈধ ব্যবসা ছিল। অত্যাচারী শাসক বা শক্তিমান জনগোষ্ঠীর কাছে পরাভূত মানুষগুলো দাস হিসেবে দেশে দেশে বিক্রি হতো। এভাবেও মানবজাতির

রক্তধারায় বৈচিত্র্যের সমন্বয় ঘটেছে। দিল্লীর মসনদে ক্রীতদাস সুলতানও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নৌ–সংযোগ ছাড়া স্থলপথেও আরবদের সাথে প্রায় অধিকাংশ সভ্য জাতির সাথে যোগাযোগ ছিল বলে সহজেই ধারণা করা চলে। সিরিয়া পর্যন্ত আরবদের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ছিল। কিন্তু সিরিয়া তুরস্ক হয়ে পূর্ব ইউরোপ কিংবা এশিয়ান সাগরের ওপারে গ্রীস, স্পেন, ভিয়েনা–প্যারিস–লন্ডনের কোন যোগসূত্র ছিল না, তাই বা বলি কিভাবে ? অন্যদিকে, মিসর, এডেন, ইরান, আফগানিস্তান হয়ে এ উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের আগেই আরবদের পদচারণা ঘটেনি, তা বলা যায় না। মনে রাখা দরকার, মুসলমানরা খাইবার গিরিপথেই এদেশে অভিযান চালায়। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তুর্কী কিংবা মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠীর আদি পুরুষদের কাছে এ পথটি অনাবিষ্কৃত ছিল না।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় কিংবা ইখতিয়ার উদ্দীনের বহু আগে এ দেশে আরবদের আগমন ঘটেছিল এবং ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই এ এলাকার জনগণ আরব বণিকদের সূত্রে নবী (সা)–এর বার্তা পেয়ে যায়। মহানবী (সা)–এর দু–একজন সাহাবী (রা) আমাদের এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন, ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। কাজেই আরবে ইসলামের বিকাশ লাভের সাথে সাথেই আমাদের এ দেশে নীরবে ইসলামের দাওয়াত পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। তবে আরবে শুরুতেই ইসলামের শক্তির সাথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বন্দ্ব–সংঘাত যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে আমাদের এ দেশে তেমনটা ঘটেনি। আর্য হিন্দুদের বর্ণাশ্রয়ী শোষণ–নিপীড়নের ফলে বিক্ষুব্ধ জনমানস 'সিরাতুল মুস্তাকিম'–এর অনুসন্ধানে মানসিকভাবে প্রতীক্ষা করছিল। ইসলাম যখন তাদের কাছে এলো, তখন তারা তাকে লুফে নিল মুক্তির পয়গাম হিসেবে।

মুসলমানরা এ অঞ্চলে একটি শক্তিশালী সামাজিক–রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবার পূর্ব পর্যন্ত সমসাময়িক পৌত্তলিক শাসকরা এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। ইসলাম এ দেশে এসেছে নির্দোষ মুক্তির সনদ হিসেবে। রাজ্য

বিস্তারে ইচ্ছুক মুসলিম অভিযাত্রীরা ইসলামের অনুগামী হয়েছেন অনেক পরে। সিলেটে হযরত শাহ জালাল (র) এসেছিলেন মযলুম মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য, রাজ্য দখল বা বিস্তারের জন্য নয়।

ইসলামের অভ্যুদয়কাল থেকে দেড় হাজার বছর গত হয়েছে। এই সময় থেকে মুসলমানরা কাবা-কেন্দ্রিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। নবী ইব্রাহীম (আ)-এর সময় থেকেই পবিত্র কাবা তাওয়াফ করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। মক্কার পৌত্তলিকরাও তা করত। একথা বলতে হয় যে , ইসলাম হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা পেলেও সৃষ্টির আদি থেকেই আল্লাহ্ নবীদের মাধ্যমে তাওহীদের বায়আত দিয়েছেন। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন যে, এমন কোন জাতি বা মানবগোষ্ঠী নেই, যাদের মাঝে সতর্ককারী বা নবী পাঠানো হয়নি। প্রত্যেক জাতির বোধগম্য ও সমসাময়িক প্রচলিত ভাষাশৈলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর আদেশ বা ওহী আসত। তাওরাত-ইনযীলের মূল ভাষা হচ্ছে 'হিব্রু'। কিন্তু পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী। আল্লাহ্ বলেছেন, পবিত্র কুরআনকে এজন্য আরবী করা হয়েছে, যাতে ঐ জনসমষ্টি আল্লাহ্র বাণী সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারে। 'ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য' হচ্ছে মহান আল্লাহ্র সীমাহীন নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন।

সুতরাং আমাদের এ ভূখণ্ডে ইসলামের বিকাশের উৎস নির্ণয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলো অনুধাবন করতে হবে। এ উপমহাদেশে কিংবা বাংলাদেশে ইসলামের আগমনকে কোনভাবেই সমার্থক ভাবা যায় না। এ দুটো প্রক্রিয়া ভিন্ন পথে ভিন্ন ধারায় এবং আলাদা সময়ের ব্যবধানে বিকশিত হয়েছে এবং প্রধানত আরব বণিক ও মিশনারীদের দ্বারা শুরুতে ইসলামের বিকাশ ঘটেছে।

বাংলাদেশের আদি ইতিহাস ঃ ভূ-প্রকৃতি

"উত্তর ও পশ্চিমে সিকিম, কাঞ্চনজঙ্ঘার উপত্যকা, খাসিয়া জয়ন্তিয়া, থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে রাজমহল, তেলিয়াগড়ি- সিক্রিগলির গিরিপথ ছুঁয়ে সরল রেখার দক্ষিণাভিমুখী প্রসারিত সমুদ্রস্পর্শী স্বল্প উচ্চ শৈলমালা ও অরণ্যময় মালভূমি থেকে, পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণে ত্রিপুরা পাহাড়, লুসাই পাহাড়, আরাকান পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূভাগে সুপ্রাচীনকালের এ্যালপাইন, আদি অষ্টিক ভাষী নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রাইব বা কৌমের বাসস্থল।" (বাংলাদেশ ঃ আকরম হোসেন ঃ বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

ইতিহাস কখনও সরল পথে আবর্তিত হয় না। সে চলার পথে বহু বাঁক নেয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পথেই ইতিহাসের অনুবর্তন। বাংলাদেশের ভূখন্ড, যা আজ একটি রাষ্ট্রীয় সত্তায় বিকশিত, তার রাষ্ট্রসীমা পরিগঠন ও আপন জাতিসত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে কোন একক ও সুনির্দিষ্ট উপাদানের সূত্র পাওয়া যায় না। এর পেছনে দীর্ঘ সময়ের ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারা, বিচিত্র উপাদান কাজ করেছে। তবে অন্যান্য অঞ্চলের মতোই এই ভূভাগের প্রকৃতি, গঠনশৈলী, আবহাওয়া, নদ-নদী, সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা, আন্তঃ ও বহির্দেশীয় যোগাযোগ পথ জাতিসত্তা নির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এ কারণেই বাংলাদেশের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হলে তার ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী, জনপদ ইত্যাদির ইতিহাস জানতে হবে।

রাজমহল পাহাড় থেকে ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কাঞ্চনজঙ্ঘার উপত্যকা, খাসিয়া জয়ন্তিয়া থেকে বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী ভূভাগ অতি বিস্তৃত না হলেও তার ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্রময়। এই ভূভাগের পশ্চিম সীমান্তে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রাচীন পুরাভূমি সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত। রাজমহল, মানভূম, ধলভূমের পূর্বদিকের মালভূমির পার্বত্য ও জংগলাকীর্ণ, অনুর্বর এলাকা এই পুরাভূমির অন্তর্গত। এরই পশ্চিম গা ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম,

বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ এর অন্তর্গত। এর পূর্বাংশ রাণীগঞ্জের আসানসোলের শৈল অঞ্চল, বাঁকুড়ার পাহাড় এলাকা, মেদিনীপুরের শালবনও ঐ বিস্তৃত পুরাভূমির নিম্নাঞ্চল। এই পুরাভূমির পার্বত্য-কাঁকরময় গৈরিক মাটির বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে অজয়, দামোদর, কাঁসাই আর সুবর্ণরেখা নদী। এ কারণেই এর পলিগঠিত উর্বর ভূমি দক্ষিণাভিমুখী গংগা-ভাগিরথীর পশ্চিম তীর ধরে প্রসারিত।

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ এর অন্তর্ভুক্ত। ধারণা করা হয়, এসব উর্বর সমভূমিতেই প্রাচীনকাল থেকে জনবসতি গড়ে উঠে। এসব এলাকায়ই গড়ে উঠেছিল প্রাগৈতিহাসিককালের রাঢ়-সুমা-কোম অধ্যুষিত রাঢ় সুহ্মজনপদ। রাঢ় অঞ্চল হিসাবেই এ অঞ্চলের সমধিক পরিচিতি। আজকের পশ্চিম বাংলা এই রাঢ় অঞ্চলের অপভ্রংশ। এ অঞ্চলের প্রকৃতির শান্ত স্থৈর্য জনগণকে করেছিল সংসার বিরাগী, জীবন সংগ্রামে নিরুৎসাহ। সংগত কারণেই এই পুরাভূমি কঠিন কাঁকরাকীর্ণ ভূখণ্ড থেকে প্রাচীনকাল থেকেই স্থলপথ আন্তঃ ও বহির্দেশীয় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ফলে তাম্রলিপ্ত থেকে একটি পথ বর্তমান হুগলি, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদের কর্ণ সুবর্ণ বা গৌড় হয়ে মালদহের পশ্চিমাংশ অতিক্রম করে রাজমহল পাহাড়ের পাশ দিয়ে তেলিয়াগড়ী সিক্রিগলির পাহাড়ী পথে একাকার হয়েছে। সেখান থেকে এ পথ চম্পা, পাটলীপুত্র, বুদ্ধ-গয়াকে সম্পৃক্ত করে বারানসী অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সেখান থেকে আরও দূরে সিন্ধু-সৌরাষ্ট্র গুজরাট পর্যন্ত এ সংযোগ পথটি প্রসারিত ছিল। এই প্রাচীন ঐতিহাসিক পথ ধরেই আর্যরা এদেশে এসেছিল। মৌর্যগুপ্ত, পাঠান-মোঘলদেরও আগমন ঘটেছে এই চেনা পথে।

তাম্রলিপ্তি থেকে আর একটি বহির্মুখী পথ ওড্র, কঙ্গোদ, উড়িষ্যা, কোশল, অন্ধ্র হয়ে চোল এবং মহারাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত । চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের রাঢ়-বঙ্গ আক্রমণ ও জয় এ পথেই ঘটেছিল। দক্ষিণ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম প্রভাব এই পথেই রাঢ় পুণ্ড্র বঙ্গে এসেছে।

রাজমহলের উত্তরে গংগা অতিক্রম করে, মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর পার হয়ে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত পুরাভূমি অঞ্চল

বিস্তৃত। তাই এই পুরাভূমির অনুর্বর, বালুকাময় মাটি রংপুর, আসামেই বেশি দেখা যায়। একই ভূমির উচ্চ গৈরিক এলাকা রাজশাহীর উত্তরাংশ, দিনাজপুরের পূর্বাংশ ও বগুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে প্রাগৈতিহাসিককালে গড়ে উঠেছিল পুন্ড কৌম অধ্যুষিত পুন্ড জনপদ বা পুণ্ড্রবর্ধন। এই জনপদের দক্ষিণে পদ্মা আর পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের স্রোত প্রবাহ। স্থল যোগাযোগ ছিল রাজশাহী মালদহের ভিতর দিয়ে রাজমহলের সাথে। যেখান থেকে পদ্মা পার হয়ে একদিকে কর্ণসুবর্ণ বা গৌড় হয়ে তাম্রলিপ্ত। অপর পথটি যুক্ত ছিল চম্পা–বারানসী অযোধ্যাভিমুখী পথের সাথে। এ কারণে প্রাচীনকাল থেকেই রাঢ় এবং পুণ্ড্রের সংগে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। যদিও পুন্ড রাজ্যের দক্ষিণ–পূর্ব দিকে বংগ জনপদ, তবু পদ্মার বিশাল ভয়াল খরস্রোত তাকেও বহুলাংশে দুরতিক্রম্য করে রেখেছিল। আজও পুণ্ড্র অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের সাথে ঢাকার যোগাযোগ প্রাকৃতিকভাবে আয়াসসাধ্য। পুন্ডের সংগে প্রাচীনকাল থেকেই কামরূপ তিব্বত হয়ে চীনের সংগে স্থলপথ বাণিজ্য সংযোগ ছিল। এই বাণিজ্য পথের আর একটি শাখা মণিপুর বিভক্ত করে আফগানিস্তানের সাথে যুক্ত ছিল। পুন্ড–চীন যোগাযোগের আরও একটি পথ সেকালে ছিল। এ পথটি হচ্ছে জলপাইগুড়ি দার্জিলিং অঞ্চল থেকে সিকিম ভুটান পার হয়ে হিমালয় গিরিপথের ভিতর দিয়ে তিব্বত অতিক্রম করে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিভিন্নমুখী যোগাযোগ সুবিধার জন্যই সম্ভবত এসব এলাকার জনরক্তে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত রক্তধারা মিশেছে।

চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্টের (সিলেট) পূর্বাংশ, কাছাড়–এর উত্তরাংশ, ময়মনসিংহের মধুপুর গড়, ঢাকার ভাওয়ালের গড় গৈরিক প্রাচীন পুরাভূমি দ্বারা গঠিত। ঢাকা এলাকা থেকে একটি স্থলপথ কামরূপ হয়ে আসামের পার্বত্য এলাকার পাদদেশ থেকে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে পুণ্ড্র বা বর্তমান উত্তরবঙ্গের সাথে যুক্ত ছিল। চীনা পরিব্রাজক এ পথেই পুণ্ড্র থেকে বংগ সমতটে এসেছিলেন বলে জানা যায়। ত্রিপুরা অঞ্চলের পুরাভূমির পশ্চিমাংশ অর্থাৎ ময়নামতি থেকে দুটি বর্হির্দেশীয় স্থলপথ পূর্বগামী সম্প্রসারিত । একটি পথ কাছাড় সুরমা উপত্যকা দিয়ে, বর্তমান সিলেট শিলচরের মধ্য দিয়ে লুসাই পাহাড় পার হয়ে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্য পথটি চট্টগ্রামের ভেতর দিয়ে আরাকানের পর্বতশৈলী পেরিয়ে

ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব পথ দিয়েই মংগোলীয়, ব্রহ্ম জনগোষ্ঠীর রক্ত আদি অষ্ট্রেলীয় মানুষের সাথে সংমিশ্রিত হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত পুরাভূমির সীমা বাদ দিলে বাকি এলাকাসমূহ ভাগিরথী, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও তার শত শত শাখা-প্রশাখা বিধৌত পলিবাহিত নতুন ভূমি। কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, ফরিদপুর, টাংগাইলের পশ্চিমাংশ (ঢাকার উত্তরাংশ বাদে) সবটুকুই এই নবগঠিত পলিবিধৌত এলাকার অংশ বলে ঐতিহাসিকরা একমত। তবে ঠিক কখন থেকে এই নদীর বুকে পলিগঠিত নতুন ভূখণ্ড গড়ে উঠেছে, অথবা কোন্ সময় থেকে এসব এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠেছে, সেটা নির্ণয় করা কঠিন। কেননা, পলিগঠিত নরম পেলব মাটি খুব বেশিদিন এসব জনপদের কীর্তিরাশি ধরে রাখতে পারেনি। নদী তীরবর্তী জনপদগুলো নিয়ত ভাঙ্গা-গড়ার লীলাখেলার শিকার। কোন একটি জনপদ তীব্র খরস্রোতকে অগ্রাহ্য করে খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। আজও পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী সহ শত শত নদী শাখা নদীর তরঙ্গাভিঘাত তার দু'কূলের জনপদ নির্মম আক্রোশে ভেঙ্গে একাকার করছে। ঠিক একইভাবে নদী-মেখলা-পলিবাহিত এ এলকাকায় নতুন জনপদ ভূখন্ড গড়ে উঠছে।

তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এসব নব্য ভূমির জনবসতি পুরাভূমির প্রায় সমসাময়িক। নদীর বুকে দিগন্ত বিস্তৃত চরাভূমি দৃশ্যমান হয়ে উঠলে অপেক্ষাকৃত পুরনো সভ্যতার উত্তরাধিকারিগণ তাদের সহজাত লোভ সামলাতে পারে কিভাবে ? সভ্যতার কিংবা নতুন জনপদের ভিত্তি গড়ার জন্য চাই মাটি। বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের জন্য চাই উর্বরা ফসলের মাঠ। প্রাকৃতিক জীবতাত্ত্বিক নিয়মে যখন মানুষের বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, যখন তার আয়ত্তাধীন ভূখণ্ড তার প্রয়োজন পূরণে অকিঞ্চিৎকর প্রমাণিত হয়, তখন সে নতুন জনপদের অন্বেষণ করে। মানব চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য আদিম এবং অকৃত্রিম। তাছাড়া কলমুখরিত জনপদের দৃষ্টিসীমায় নদীর বুকে কোন নতুন চরাভূমি বেশিদিন বিরাজমান থাকতে পারে না। মানুষের অন্তহীন আবিষ্কারের নেশা ও নতুনের সাথে সখ্যতা স্থাপনের রোমাঞ্চ তাকে গহীন অরণ্যে, দুর্গম পাহাড় কিংবা

তরঙ্গসংকুল নদী-সাগর পাড়ি দিতে বরাবরই প্রেরণা যুগিয়েছে। তবে এসব নব্য ভূমির প্রকৃতি যেমন বৈরী, আবহাওয়া তেমনি লোভনীয়, নাতিশীতোষ্ণ, ও সহনীয়। দিগন্ত বিস্তৃত উদ্দাম উর্বর ফসলের মাঠ, অযত্ন রক্ষিত ফলমূল, শাকসব্জির অফুরান সম্ভার আর নদী-সাগরে প্রাণ ধারণের সহজলভ্য মাছের বিপুল প্রসারিত নিয়ামত মানুষের রক্তে হৃদয়ে শুরু থেকেই দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি করে থাকবে। আর সে কারণেই পুরনো জনপদের জনগোষ্ঠী নতুন ভূখন্ডে অধিকার প্রতিষ্ঠায় তেমন বিলম্ব করেনি। আজ যেমন নতুন ভূখন্ডের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উন্মত্ত প্রতিযোগিতা দৃশ্যমান, সেদিন এতটা তীব্র না হলেও ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তবে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, দস্যু, ডাকাত, কুমিরের বৈরী আচরণ মুকাবিলা করেই এখানকার মানুষ সভ্যতার আবাদ গড়ে তুলেছে। আজও সেই একই প্রাকৃতিক বৈরিতা তাদেরকে মুকাবিলা করতে হচ্ছে। প্রকৃতির দেয়া সফেদ চরাভূমিই আজ সভ্যতার বিপুল সম্ভার বুকে নিয়ে টিকে আছে। খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, জেলাসমূহের নিম্নভূমির গঠন প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত।

এই নব্য গঠিত শত শত নদী বেষ্টিত ভূখন্ডে প্রাচীন কৌম বঙ্গজন অধ্যুষিত বঙ্গ জনপদ গড়ে উঠেছে। সংগত কারণেই এখানকার জনগণের চরিত্র ও মানস গঠনে আঞ্চলিক প্রকৃতি সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। দৃশ্যত এ প্রকৃতি শান্ত স্নিগ্ধ মোহ বিস্তারকারী। কিন্তু দুরন্ত, বৈরী, ক্ষ্যাপা। হঠাৎ করেই এখানকার প্রকৃতি বিগড়ে যায়। 'ভাঙ্গিছ গড়িছ নিতি আপন মনে'-কবির এই অনুভব এই নব্য ভূমিতেই যেন দৃশ্যমান হয়ে উঠে। পদ্মা-মেঘনার দুরন্ত বৈরিতাকে মুকাবিলা করেই এখানে গড়ে উঠেছে সভ্যতা। সে কারণে এলাকার জনগোষ্ঠী সাহসী, প্রকৃতির মতো উচ্ছল, দিগন্ত প্রসারী মাঠের মতো উদার। প্রতিরোধে দৃঢ়, সংগ্রামে নির্ভীক, আতিথেয়তায় অকৃপণ। নদী ঘর ভাঙ্গে, ফসল কেড়ে নেয়, ফুঁসে উঠা সমুদ্র কিংবা খরস্রোতা নদী স্বপ্ন কেড়ে নেয়। তারপর আবার নতুন করে নির্মাণের চেতনায় সংগ্রামশীল, ভাঙ্গার বেদনায় মুষড়ে পড়ে না, সবার আনন্দে কর্মমুখর। প্রকৃতির বৈরিতার সাথে জীবনের নোঙ্গর বেঁধে এ এলাকার মানুষ বাঁচে, স্বপ্ন দেখে।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই নদী তীরে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন জনপদ, গঞ্জ, বাজার, নগর, শহর। স্থলপথ যোগাযোগ দুর্গম ছিল বলেই নৌ-পথের যোগাযোগ ছিল একমাত্র নির্ভরতা। রাঢ় অঞ্চলের সাথে বঙ্গ জনপদের জনগোষ্ঠীর সামাজিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস স্বতন্ত্র।

বর্তমান রাজশাহী জেলার পশ্চিম সীমা বরাবর কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা ভাগিরথী নামে দক্ষিণবাহী হয়ে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চুঁচুড়া, উলুবেড়িয়া হয়ে সাগর মুখে মিশেছে। প্রাচীনকালে ভাগিরথী এখনকার মতো নিস্তেজ স্রোতহীন ছিল না। আর তার গতিপথও একই ধারায় আবর্তিত হয়নি। ভাগিরথী একাধিকবার তার গতিপথ বদলিয়েছে। ভাগিরথীর জন্যই প্রাচীনকালে রাঢ় থেকে সহজসাধ্য কোন যোগাযোগ বংগের সাথে ছিল না।

পদ্মা হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশের সঞ্জীবনী ধারা। গঙ্গা নদীই বাংলাদেশে পদ্মা। গঙ্গা রাজশাহীর দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ রাষ্ট্রসীমা নির্দেশ করে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে কুষ্টিয়ার উত্তর সীমায় পদ্মা নামে বাংলাদেশে পরিচিত। পদ্মা একই খাতে প্রবাহিত হয়নি। জনপদ, সংসার জীবন কিভাবে ধ্বংস করে আবার সৃষ্টি করেছে পদ্মা, তার ধারণা পাওয়া যাবে এর গতিপথ লক্ষ্য করে।

প্রাচীনকালে পদ্মা রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া হয়ে, সিংড়ার চলনবিলের মধ্য দিয়ে ধলেশ্বরীর সংগে মিলিত হয়ে প্রবাহিত ছিল। ঢাকার নিচের বুড়িগঙ্গা প্রাচীন পদ্মার প্রবাহ পথের সাক্ষী। চতুর্দশ শতাব্দীতে পদ্মা দক্ষিণ-পূর্বের প্রায় চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর নিকটেই পদ্মার প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র প্রবাহের সাথে মিলিত হতো। বর্তমান পদ্মা অনেক দক্ষিণে সরে গেছে। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মিলন এখন গোয়ালন্দের নিকট। আর এই মিলিত স্রোত চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নাম নিয়ে বদ্বীপের কাছে সমুদ্রে পড়েছে। এই পদ্মাই দক্ষিণের পুণ্ড্র জনপদকে বঙ্গ থেকে আলাদা করে রেখেছে।

পদ্মা থেকে উৎপন্ন বেশ কয়েকটি শাখা নদী যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। কুমার নদী হচ্ছে এগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম নদী। মধ্যযুগে ভৈরবও ছিল উল্লেখযোগ্য নদী। শাখানদী মধুমতি যশোর-ফরিদপুরের সীমানা নির্দেশ করে ফরিদপুরের কোটালীপাড়ার দক্ষিণ থেকে সোজা দক্ষিণামুখী হয়ে মঠবাড়ীয়ার পশ্চিম দিয়ে হরিণঘাটায় গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। এই কুমার নদীর সাগর মোহনাই সম্ভবত টলেমী উল্লিখিত কাম্বেরীখন। আলেকজান্ডারের কালে এখানেই সম্ভবত গড়ে উঠেছিল শক্তিশালী গংগা রাষ্ট্রের রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র গংগা নগর, গংগা বন্দর। সমুদ্র তখন ফরিদপুরের হাওর ও বিল অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মনে হয়। ফরিদপুরের কোটালীপাড়ার ভগ্নাবশেষ এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের যোগান দেয়।

কুমিল্লার ময়নামতির খননকার্য উত্থিত এবং বঙ্গের নানা জায়গায় প্রাপ্ত শিলালিপি, মুদ্রা, মূর্তি ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ইতিপূর্বেকার ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করছে। এর আগে আমরা জানতাম মৌর্যগুপ্তদের ইতিহাসই আমাদের ইতিহাস। শশাঙ্ক, পালরাজা আর সেন রাজাদের ইতিহাস বঙ্গ রাষ্ট্রের ইতিহাস। কিন্তু ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, গৌড়, মগধ-পুন্ড্রনগর বা পুণ্ড্র রাষ্ট্রের ইতিহাস, বঙ্গের ইতিহাস নয়। শশাঙ্ক ও পাল রাজাদের উপেক্ষার মাধ্যমে বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস চাপা পড়ে থাকে দীর্ঘদিন।

প্রাগৈতিহাসিক কাল

ভাগিরথীর পূর্ব অঞ্চলের নব্যভূমিতে এ্যালপাইন আদি–অষ্ট্রো নরগোষ্ঠীর আষ্টিক ভাষী বঙ্গ ট্রাইব বা কৌমের বাসস্থান। এখানেই তারা গড়ে তোলে বঙ্গ জনপদ। বঙ্গ জনপদের উত্তরে পদ্মা নদীর ওপারের পুরাভূমিতে গড়ে উঠেছিল পুন্ড্র জনপদ, তারও পশ্চিমে অংগ।

বঙ্গ জনপদ ইতিহাসের কোন্ সময়টিতে গড়ে উঠেছিল, তার সঠিক নির্দেশিকা নিয়ে বিতর্ক আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায়, বঙ্গরাষ্ট্র খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রের নামকরণ অজ্ঞাত। স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের যথার্থ সীমানা, রাষ্ট্র শাসন–রীতি সম্পর্কে জানা যায় না। তবে এখানকার কার্পাস বস্ত্র মসলিন যে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ছিল, তার বিবরণ আছে।

অবশ্য 'বঙ্গ' শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক'–এ। সেখানে বঙ্গকে মগধের সংগে সম্পৃক্ত করে দেখানো হয়েছে। তবে 'বঙ্গ'–এর ভৌগোলিক সীমারেখার কোন ধারণা দেয়া হয়নি। গবেষক–ঐতিহাসিকগণ রামায়ণ মহাভারত রঘুবংশ বোধায়ণ সূত্র ইত্যাদির সংকেত অনুসরণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভাগিরথীর পূর্ব অঞ্চলের নব্য ভূমিতে এ্যালপাইন আদি অষ্ট্রো নরগোষ্ঠীর অষ্টিকভাষী বঙ্গ ট্রাইব বা কৌমের বাসস্থান। এখানে তারা গড়ে তোলে বঙ্গ জনপদ। এদের প্রতিবেশী জনপদের খোঁজ–খবর পাওয়া যায়। বঙ্গ জনপদের পশ্চিমে ভাগিরথীর ওপারের পুরাভূমিতে ছিল সুহ্ম জনপদ। উত্তরের জনপদ ছিল রাঢ়। 'বঙ্গ' জনপদের উত্তরে গঙ্গা নদীর ওপারের গৈরিক পুরাভূমিতে ছিল সুহ্ম জনপদ। তার পশ্চিমে অংগ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ পুন্ড্র সমুদ্রকে ম্লেচ্ছ, অসুর, পক্ষী বলে উপহাস করা হয়েছে। বোধায়ণ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে 'বংগজ' পুন্ড্র সুহ্মে

এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মহাভারত-ভগবত-এর প্রাচীন আখ্যানভাগেও বংগজন ও তার প্রতিবেশীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। মোদ্দাকথা, উপমহাদেশে আর্যদের আগমনের আগে, এ দেশে কোন সভ্য জাতির আবাস ছিল, তা তারা স্বীকার করে না। বহিরাগত বর্ণাশ্রয়ী আর্যরা অভিশপ্ত ইহুদীবাদী ইসরাইলীদের মতোই একটি জাত্যাভিমানী জনগোষ্ঠী। অন্তত তারা তাদের প্রাচীন ইতিহাস ও বর্তমানের আচরণে এটাই প্রমাণ করেছে। অথচ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে ইতিহাসের পাথরচাপা সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা সেই আর্য সভ্যতার চেয়েও সার্বিক বিচারে উন্নত ছিল, তা এখন স্পষ্ট। ঠিক একইভাবে 'বঙ্গ' জনপদে প্রাক আর্য-ব্রাহ্মণ যুগে যে উন্নত এক সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, তাও আমাদের জানতে হয়েছে ময়নামতীর খনন-কর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। আর্যরা তাদের গ্রন্থসমূহে প্রাক-আর্য সভ্যতার খবরের কোন সূত্র রেখে দেয়নি। দীর্ঘদিন আর্য-মানস তাড়িত বিকৃত ইতিহাসের সূত্রসমূহ আমাদের প্রকৃত ইতিহাসের সত্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। "বঙ্গ" জনপদের কোন গৌরবময় সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে, আর্যরা তা সর্ব প্রযত্নে গোপন করেছে। ইতিহাস-জ্ঞানের অভাবহেতু আমাদের মাঝে কিছুটা হীনমন্যতার লক্ষণও ছিল।

প্রাসঙ্গিক বিষয়-ভিত্তিক ইতিহাস প্রণেতারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এভাবে তাঁদের মত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রাচীনতর তথ্য-সূত্রে জনপদগুলোর নাম আমরা যেভাবে পাই, তা ঠিক জনপদ বা স্থানের নাম নয়, কৌমের নাম। যেমন ঃ বঙ্গা, রাঢ়া, পুন্ড্রা, গৌড়া, বঙ্গজ, বঙ্গ-গৌড়-পুন্ড্র-রাঢ় কৌম অর্থে । কিন্তু এই মতও অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নেয়া কঠিন। বঙ্গ জনপদে কোন একক সংস্কৃতি ও ধর্মানুসারী জনগোষ্ঠীর বাস ছিল, প্রমাণটা সংগ্রহ করাও দুরূহ।

ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়াও রঘুবংশ রামায়ণ-মহাভারতের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেও বঙ্গ জনপদের রাষ্ট্রসত্তা ও প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। রঘু বংশের চতুর্থ সর্গের ৩৬ শ্লোকে বিবৃত হয়েছে-রঘুর 'বঙ্গ' জয়ের কথা। "বঙ্গ বাহিনী নৌ-বাহিনী সাজাইয়া মহাবীর রঘুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। রঘু

তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গঙ্গা স্রোতের মধ্যবর্তী দ্বীপে জয়স্তম্ভাবলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"

এখানে প্রকারান্তরে অনেকগুলো সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক. তথাকথিত রঘুকে যাদের সাথে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তারা নিতান্ত অশ্রুতপূর্ব উপেক্ষিত কোন রাষ্ট্র-শক্তি ছিল না। মোটামুটি শক্তিশালী না হলে এবং তাদের কোন প্রতিরোধ শক্তি না থাকলে রঘুকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল কেন? দুই. উন্নত ও প্রাচীন রাষ্ট্রশক্তি না হলে নৌ-বাহিনী থাকতে পারে না। বহিরাগত পররাজ্য আক্রমণকারী 'আর্য বীর' রঘুপতিকে এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে মুকাবিলা করতে হয়েছিল, এ কথা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন নিজেদের বীরত্ব জাহির করতে গিয়ে।

যদিও 'মহাবীর রঘু' বঙ্গ শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন কি না, তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। আর্য ইতিহাস বহুলাংশে মিথ্যাশ্রয়ী ও বিদ্বেষ প্রসূত। আপন বীরত্ব প্রমাণের জন্য তারা মিথ্যা অবলম্বন করাকে অধর্ম মনে করে না।

রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে ১০ম সর্গে, রামাভিষেক বার্তা শ্রবণে বিষণ্ন কৈকেয়ীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রাজা দশরথ বলেছিলেন, "বংগ-অংগ-মগধ-কোশল প্রভৃতি দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের কৈকেয়ীর যা পছন্দ হবে, তাই তাকে এনে দেবেন।" এ থেকেও দুটি সূত্রের সন্ধান মেলে। এক, "বঙ্গ রাষ্ট্রশক্তি" সম্পর্কে আর্যদের বহু আগে থেকেই একটি ধারণা ছিল। দুই, 'বঙ্গ' সংস্কৃতি শিল্প প্রাগ্রসর না থাকলে 'বঙ্গ' থেকে কৈকেয়ীর 'পছন্দ মতো' দ্রব্য এনে দিয়ে তাকে খুশি করার প্রশ্ন আসত না। নিশ্চয়ই 'বঙ্গ' জনপদে এমন মনোহারী দ্রব্য উৎপন্ন হতো, যা দিয়ে বিষণ্ন কৈকেয়ীর মন তুষ্ট করা যেত। শুধু আর্য-শাসিত রাষ্ট্রসীমায়ই নয়; বরং ভিনদেশেও বঙ্গ শিল্পদ্রব্যের খ্যাতি ছিল ঈর্ষণীয়। মহাভারতের এই ভাষ্য সত্য হলে একথা বলতেই হবে যে, এ উপমহাদেশে আর্যদের আগমনের আগেই 'বঙ্গ' সুসভ্য রাষ্ট্রসত্তা ছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক, জৈন গ্রন্থ, মহাভারত, ভাগবতে আর্য-বহির্ভূত বঙ্গ ও তার প্রতিবেশী জনপদসমূহের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির যে কদর্য ছবি আঁকা হয়েছিল, তার মূল কারণ সম্ভবত এই সভ্যতার সাথে তাদের সংঘাত। আর্যরা যে সংস্কৃতি সাথে করে নিয়ে এসেছিল, বঙ্গে প্রতিবেশী জনপদের চেয়ে উন্নততর সভ্যতা বর্তমান ছিল। কিন্তু আর্যরা অন্তঃসারশূন্য এক জাত্যাভিমানে তাকে আদৌ স্বীকারই করেনি। তারা শক্তি-শঠতায়, অসাধুতায় ঐ সংস্কৃতি-সভ্যতা বিনাশে উদ্যত হয়েছিল বলেই তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। তা আজও অব্যাহত আছে।

প্রাচীন গ্রীক লেখকের বিবরণ সূত্রের উপর ভিত্তি করে প্রফেসর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী রাষ্ট্রের পশ্চিম সীমা ভাগিরথীর পূর্ব তীর বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সুতরাং গঙ্গারাষ্ট্র ও বঙ্গজনের ইতিবৃত্ত অভিন্ন। তবে সে আমলে কুমার নদীর মোহনা যে কোটালীপাড়ার দক্ষিণে ছিল, এ বিষয়ে অনুমান করা চলে। ইতিহাসে এ কথা সাক্ষ্য দেয় যে, গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় গঙ্গা ও প্রতিবেশী প্রাচ্য রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। আলেকজাণ্ডার এ কারণেই অভিযানে সফল হতে পারেননি। এ কথাও জানা যায় যে, আলেকজাণ্ডারের ব্যাবিলন ফিরে যাবার পর এক সময় চন্দ্রগুপ্ত তার মন্ত্রী কৌটিল্যের বুদ্ধির সাহায্যে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের স্থায়ীকাল খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দ থেকে খৃঃ পূঃ ১৮৭ অব্দ পর্যন্ত।

পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বঙ্গরাষ্ট্র খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। রাজধানী গংগা বন্দরের সাথে রোম, মিসর, চীন, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপরাষ্ট্র ও ভারতের অন্যান্য এলাকার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রে স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন ছিল। স্বর্ণ-মণি-মুক্তা, রেশম, কার্পাসজাত বস্ত্র, মশলা, গন্ধদ্রব্য, যুদ্ধোপকরণ হিসেবে হাতি বিদেশে রপ্তানী হতো। টলেমী বঙ্গরাষ্ট্রে স্বর্ণখনি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। বঙ্গের এই ধন-ঐশ্বর্যের জন্যই চন্দ্রগুপ্ত থেকে শুরু করে উত্তর ভারতীয় আর্য সাম্রাজ্যবাদী চক্র ও ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের এত উন্মাদনা। মৌর্য

সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রের বৈভবে বঙ্গ জনপদের সম্পদ রয়েছে। ঠিক একইভাবে দিল্লী–আগ্রার চোখ ঝলসানো স্থাপত্য কীর্তিতে রয়েছে বঙ্গ সম্পদ। কলকাতা–লণ্ডনের চোখ ঝলসানো সমৃদ্ধিতেও বঙ্গ সম্পদের হিস্যা রয়েছে।

চতুর্থ শতকের প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত এবং তার পরবর্তীকাল বঙ্গদেশের ইতিহাস। এ সময় থেকেই বঙ্গ–জনপদ ভূভাগের নাম সমতট, হরিকেল ইত্যাদি হিসেবে পরিচিত হয়। ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে পশ্চিমের ত্রিপুরার নিম্নপুরাভূমি, উত্তরে পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীর থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী ভূভাগ বঙ্গ কোম জন অধ্যুষিত এলাকা––এটাই বঙ্গা ঃ বঙ্গজনপদ–গঙ্গারাষ্ট্র–বঙ্গরাষ্ট্র।

'বঙ্গ' যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল, তখন খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। সপ্তম শতকের শেষ দিকে শশাঙ্কের নেতৃত্বে রাঢ়–পুন্ড ঐক্যবদ্ধ গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ৫২৫ থেকে ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গোপালচন্দ্র ও তাঁর বংশ রাজত্ব করে। ৬৫০ পর্যন্ত ভদ্র বংশের শাসন বিস্তৃত। ৭১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খড়্গ–কি রাত লোকনাথ বংশ রাজত্ব করে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তার গৌড় রাজ্য বিপর্যস্ত হয়। গৌড়ে তখন বিশৃঙ্খলার বিস্তার। তবে বঙ্গে তার ছায়াপাত ঘটেনি, বঙ্গে তখনও ভদ্র বংশের রাজত্ব। ভদ্র বংশের পর রাজভট্ট দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। ঢাকা–ফরিদপুর এলাকায় তাদের রাজধানী ছিল। এরপর কিরাত বংশ এবং লোকনাথ বংশীয় শাসকরা বঙ্গের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেন। এদের সম্মিলিত শাসনকালে অষ্টম শতকের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৭১০–৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গে মাৎসন্যায়–এর অরাজকতার শাসনকালের অভিশাপে জর্জরিত ছিল। এই অরাজকতা অনধিক পঁচিশ বছর অব্যাহত ছিল। ৭৪০ থেকে ৮০০ পর্যন্ত দেব বংশের শাসনকাল । এ সময় বঙ্গের সামন্তগণ গোপালকে সিংহাসনে বসান। অনেকের অনুমান, কুমিল্লার 'আনন্দরাজের বাড়ী' হয়তো শ্রী আনন্দদেবেরই স্মৃতি বহন করছে। এরপর হরিকেল বংশের শাসনকাল ৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তা বিস্তৃত। ১০৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল চন্দ্র বংশের শাসনকাল। এরা এক শ' বছরেরও বেশি রাজত্ব

করেন। ১০৫০ থেকে ১০৭৫ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে বর্মণ, রাজবংশ বঙ্গ সমতটের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। এদের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। এদের শাসনকাল ৪৬ বছর।

এর পরের ইতিহাস বঙ্গের স্বাধীন শাসনকালের ইতিহাস নয়। বরং সেন রাজাদের গৌড়ীয় শাসনকালের ইতিহাস। সেন রাজাদের শাসনকাল প্রাক-মুসলিম বিজয় পর্যন্ত প্রসারিত । লক্ষ্মণ সেন 'গৌড়েশ্বর' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এর পর ১২২৫–১৩৩৮ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানী শাসন, ১৩৩৮–১৫৩৮ পর্যন্ত স্বাধীন সুলতানী যুগ, ১৫৩৯–১৭৪০ পর্যন্ত মোঘল শাসনকাল, ১৭৪০–১৭৫৭ পর্যন্ত সতেরো বছরের স্বাধীন নবাবী শাসনকাল, ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন, ১৯৪৭–১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসন, এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

আর্য–আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্য নসাৎ করে বঙ্গ রাঢ় পুন্ড্র যখন স্বীয় শক্তিমত্তা ও আপন সাংস্কৃতিক বৈভবে বিকশিত সেই সামাজিক স্থিতির সময় বৌদ্ধ ধর্ম–স্রোত আর একবার এক অহিংস জীবনবাদী সংস্কৃতির অভিঘাত নিয়ে আছড়ে পড়ে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই রাঢ় এবং পুণ্ড্রে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তবে বঙ্গে তার প্রভাব আরও ব্যাপক ও গভীরতর হয়েছিল।

পাল রাজাদের চার শ' বছর শাসনকালেও গৌড় বঙ্গের রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি। বঙ্গরাষ্ট্র তার সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র ভৌগোলিক বিভক্তি নিয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র থেকে গেল। বরং এই চার শ' বছরের মধ্যে গৌড়–বঙ্গের সাংস্কৃতিক ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য আরও দৃঢ় হলো।

বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস আবেদনে বঙ্গ গৌড়ের সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। সম্ভবত প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্যই পাল রাজারাও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। এর পেছনে ধর্মীয় হৃদয়বৃত্তির টান যতটা না ছিল, রাজনৈতিক কারণ ছিল তার চেয়ে অধিক ক্রিয়াশীল। বৌদ্ধ–পাল শাসকরা নিজেরা আর্য–ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তারা অনেকেই ব্রাহ্মণ রাজাদের

কন্যা বিয়ে করতেন। এভাবে পারিবারিক পর্যায়ে পাল শাসকরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বৃত্তে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেন। বোধগম্য কারণেই পাল রাজারা আর্য সংস্কৃতির কূট-কৌশলের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম আর্য-সংস্কৃতির আগ্রাসনের কাছে অভ্যন্তরীণভাবেই পরাস্ত হয়, তার সূত্রপাত ঘটেছিল সম্ভবত অন্দরে ব্রাহ্মণীদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার সূত্রে। ঠিক একইভাবে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মোঘল বাদশারা যখন দেশ শাসনের অধিকার কেড়ে নিলেন, তখন আর্য-ব্রাহ্মণরা রাজপুত নন্দিনীদের মোঘল হেরেমে ঢুকিয়ে দিয়ে একই কায়দায় সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। সারধাণভাবে আর্য-ব্রাহ্মণরা ছুঁৎমার্গ কুলীনতন্ত্র ও বর্ণাশ্রয়ী এক সংস্কৃতি পালন করে থাকে অত্যন্ত সযতনে। কিন্তু অপরের সংস্কৃতি-স্বাতন্ত্র্য লুণ্ঠন করার জন্য, বিনাশ করার জন্য তাদের 'কুলীন'রাই কন্যা-জায়াদের অপরের হেরেমে ঢুকিয়ে দিতে কুণ্ঠিত নয়। এ কৌটিল্য নীতি এখনও অব্যাহত।

শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ, নিগ্রহ সর্বকালের নির্যাতনের ইতিহাসকে ম্লান করে দেয়। শশাঙ্কের বৌদ্ধ নির্যাতন, বুদ্ধ গয়া বিনাশ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে শোকাবহ ও ভয়াবহ স্মৃতিতে কলংকিত। শশাঙ্ক যে বৌদ্ধ নিগ্রহের সূচনা করেছিলেন তার কদর্য রূপ ষোলকলায় পূর্ণ হয় সেন রাজাদের আমলে। বৌদ্ধরা আর্য-মানসিকতাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাদের ধর্মের উৎসস্থল ত্যাগ করে বঙ্গ দেশের পাহাড়-জংগল সহ তিব্বত-চীনে হিজরত করতে বাধ্য হয়।

শশাঙ্ক আমল থেকেই গৌড়জন উত্তর ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিকে আপন ভাবতে থাকে। তাদের শাসক অভিজাত শ্রেণী দেশজ সাধারণ মানুষ ও তাদের সংস্কৃতিকে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করে উত্তর ভারতীয় স্বজাতি ও স্ববর্ণের লোকের সংগে আত্মীয়তার সূত্র আবিষ্কারে সচেষ্ট ছিল। ফলে এই রাষ্ট্রীয় বিদ্বেষ-বৈরিতার জন্য গৌড়ীয় বৌদ্ধরা দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম অনেকটা মাটির উপর শিকড় বিস্তার করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসে নির্বাণবাদ এ দেশের মানুষকে একক

সাংস্কৃতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে পারল না। একটা শূন্যতা তাদের পরিব্যাপ্ত করে রাখল। ক্রমশ তারা আদি জনগোষ্ঠীর কুসংস্কারবাদ যাদু বিশ্বাসের দ্বারা আক্রান্ত হলো। ফলে তাদের জীবনে তান্ত্রিকতার ছোঁয়া লাগল। এ কথা সত্য যে, বৌদ্ধ ধর্ম শুরুতে সুখ, সাম্য ও সামাজিক শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তির আশা দিয়েছিল, যদিও সেটা উচ্চকিত ছিল না। তা সত্ত্বেও শোষিত নির্যাতিত জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মের মাঝে সামাজিক-রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন থেকেও 'নির্বাণ' পাবে, এমন একটা প্রত্যাশায় পঙ্গপালের মতো বৌদ্ধ গয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েও যখন তারা আত্মরক্ষা করতে পারল না, তখন এক ধরনের হতাশাজনিত জীবন-বিমুখতা তাদের পেয়ে বসলো। এই শূন্যতার সুযোগে দেশজ তান্ত্রিকতা-যাদুতন্ত্র তাদের মনে বাসা বাঁধল।

মূলত বৌদ্ধদের অহিংস-নির্বাণবাদ মানুষের ইহ ও পরকালের মুক্তি-মন্ত্র ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মের উৎস-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলা যায়, পুরো ধর্মের দার্শনিক ভিত্তিই নির্মিত হয়েছে একটি নেতিবাচক আত্মরক্ষামূলক জীবন বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গির উপর। সংঘাত-বহিরাক্রমণ, ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধর্মীয় আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার বা প্রতিরোধের কোন দীক্ষা বৌদ্ধ ধর্মে নেই বলেই তাদের আর্য-ব্রাহ্মণদের কোপানলে আত্মাহুতি দিয়ে 'মহানির্বাণ' খুঁজতে হয়েছে। অথবা দেশ ত্যাগ করে সাময়িক মুক্তির পেছনে দৌড়াতে হয়েছে। যারা এ দুটোর কোনটাতেই সক্ষম হয়নি, তারা হিন্দু আর্য-সংস্কৃতির পুরানো বৃত্তেই ফিরে গেছে।

অথচ এর পাশাপাশি আমরা যখন ইসলামের সাথে আর্য-হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিরন্তর সংঘাত-বৈরিতার ইতিবৃত্ত নিয়ে পর্যালোচনা করবো, তখন দেখবো আর্যরা সেখানে পরাভূত; হাজার বছরের সংঘাতেও আর্য-ব্রাহ্মণরা মুসলমানদের উৎখাত বা বিনাশ করতে পারেনি। এর তাৎপর্য হচ্ছে, ইসলাম নিজেই তার অনুসারীদের রক্ষা করার সামর্থ্য রাখে।

সেন রাজারা ছিলেন উগ্র সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ-গোঁড়া ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা বঙ্গজনদের মানুষের তো মর্যাদা দিতেই প্রস্তুত নয়। 'বংগাল' বলে বঙ্গজনদের

তুচ্ছ করার সূত্রপাত সেন আমলেই। আজও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সমশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে এখনও বিয়ে পর্যন্ত হয় না। আর্যদের প্রবর্তিত বর্ণভেদ প্রথা সমাজ-শক্তিকে শতধাবিভক্ত করে দেয়। শূদ্র শ্রেণীর কোন সামাজিক অধিকারই স্বীকার করা হতো না। পাল আমলে অঙ্কুরিত বঙ্গ ভাষার আদি উৎস-প্রাকৃতকে পর্যন্ত সেন রাজারা 'পক্ষী ভাষা' বলে উপেক্ষা করেছে। তারা এদেশে বাস করে ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সেবক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল। দেশজ জনের ভাষা বলতেই তারা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে নাসিকা কুঞ্চিত করত। তারা নিজেদের উচ্চ বর্ণের গৌড়ীয়জন বলে পরিচয় দিত, বংগজন বলে তারা কখনও নিজেদেরকে পরিচয় দিত না। সোনার গাঁয়ে রাজত্ব করলেও তারা নিজেদের গৌড়েশ্বর বলে পরিচয় দিত। এর ফলে গৌড়ীয় সাধারণ জনের কাছেও বংগাল-বঙ্গ সংস্কৃতি অশালীন অসংস্কৃত বলে ঘৃণিত হতো। অথচ বাংগালী জনের জীবন-সাহিত্য রচিত হলো প্রাকৃতজনের বঙ্গ ভাষায়। কিন্তু তার আদি কবিরা হলেন 'সংস্কৃতজনদের' কাছে উপেক্ষিত।

গৌড়ীয় সংস্কৃতির বর্তমান ধার করা কলকাতাকেন্দ্রিক আর্য-বেদ-উপনিষদাশ্রিত দর্শনের উপর ভিত্তি করে এক নয়া সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে। তাদের চত্বরে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারের ফিরিঙ্গি দর্শন আধুনিকতার নামে জায়গা পেলেও বঙ্গজনের দেশজ সংস্কৃতি মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবনের সংলাপ ঠাঁই পায়নি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আর্য সংস্কৃতির উত্তরসূরী কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কৌশলী প্রচারণায় 'আর্যদের' গণবিরোধী চরিত্র আড়াল করে রাখতে বহুলাংশে সফল হয়েছে। কিন্তু শাশ্বত মানব ধর্ম ইসলাম এ দেশে এসে স্থানীয় ভাষায় গণমানুষের মানবিক সৌকর্যকে আত্মস্থ করে নিলেও তা এখনও তথাকথিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কাছে বহিরাগত প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট।

সেন শাসনে গৌড় বংগের ব্রাহ্মণ্যধর্মী জনগণ যখন নিয়তি-নির্ভর এক অবাস্তব আত্মাভিমানে নিমগ্ন থেকে সংগ্রাম বিমুখ, শূদ্ররা যখন অধিকার হারিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করত, বৌদ্ধরা যখন প্রাচীন কৌম-যাদু বিশ্বাস-তন্ত্র-মন্ত্রের কাছে সমর্পিত, সেই অন্ধকারকালেই গৌড় বঙ্গে কালোত্তীর্ণ বিশ্ব-ধর্ম

ইসলামের আগমন ঘটে এক বৈপ্লবিক আদর্শ নিয়ে মানুষকে শৃঙ্খল মুক্তির অংঙ্গীকারসহ। ইসলাম এসে ঘোষণা করল ঃ মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী, জন্মের জন্য নয়। নিয়তি নয়–মানুষের সদাচার ও অধ্যাত্মবাদ–নিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডই তার পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করে; ধর্ম জীবনের জন্য, ধর্মের জন্য জীবন নয়। সকল মানুষ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমান। মানুষ মানুষে ভেদাভেদ নেই। খৃষ্টীয় পোপতন্ত্রবা হিন্দুদের পুরোহিততন্ত্র ইসলামে নেই। যা কিছু মানব প্রকৃতি ও স্বভাবের পরিপন্থী, তার বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ করার অধিকার শুধু স্বীকৃতই নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রীতিমত সংগ্রাম করার জন্য তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এভাবে ইসলাম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্থিতাবস্থাকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিল। দলে দলে লোক ইসলামকে মুক্তিপথ বলে গ্রহণ করে নতুন আলোকের সন্ধান পেল।

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বঙ্গ জনপদের বৌদ্ধ ও শূদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছে স্বেচ্ছায়, শাসকের অনুগ্রহ পাবার প্রত্যাশায় নয়; বরং জীবনমুখী গতিশীল ধর্মের মানবিক মহত্তের আকর্ষণে। তবে নদী বিধৌত 'বঙ্গ'–এর যেসব সমতল ভূমির বসতি বিলম্বিত, সে সব স্থানে ইরান, তুরান, আফগান মুসলমানদের আগমনও ঘটেছে ব্যাপকভাবে। এটা নির্ণয় করা কঠিন যে, এ অঞ্চলের কত ভাগ লোক ধর্মান্তরিত আদি জনগোষ্ঠীর, আর কত অংশ বহিরাগত তুরানী মুসলমান। গৌড়ীয় জনদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম। মনে হয়, আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক শৃঙ্খল ও কঠোর সংরক্ষণবাদী নীতিই এক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। অনেকটা ইহুদীবাদী ইসরাঈলীদের মতো এক অবাস্তব উন্নাসিকতা তাদের বিবেচনাবোধ ও সত্য গ্রহণের মানসিক ঔদার্যকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অবশ্য মুসলমান বিজয়ীর হাতে গৌড়েশ্বর লক্ষণ সেনের পরাজয় ছিল গৌড়জনদের জন্য গ্লানিকর, দুর্বিষহ। ইসলামকে তারা ঐ সময় থেকেই ঘৃণামিশ্রিত ভয়ের চোখে দেখতে থাকে। ইসলামকে গ্রহণে তাদের অনীহার উৎস এখানেই। শুধু তাই নয়, ক্রমপ্রসারমান মুসলিম শক্তিকে সরাসরি প্রতিহত করতে অক্ষম, আর্য–ব্রাহ্মণরা তাদের সামাজিকতা ও ধর্মাচরণে এমন কিছু আচার অনুষ্ঠান যাগ–যজ্ঞের উদ্ভব ঘটালো, যার ফলে ইসলাম ও তার অনুসারীদের সাথে প্রাত্যহিক সংঘর্ষ বেঁধে যায়। যে গরুকে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র

রাহে কুরবানী দেয়, সে গরুকেই তারা তাদের 'দেবতা' রূপে পূজা করার রেওয়াজ প্রবর্তন করলো। অথচ এর আগে তারা যজ্ঞে গরু বলি দিত। কঠিন সংরক্ষণশীল সামাজিকতার উগ্র বিদ্বেষের বৃত্তে বন্দী গৌড়ীয় সাধারণ লোকেরা ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে 'জাত' বাঁচালো। সম্ভবত বঙ্গে মুসলিম শক্তির হাতে গৌড়েশ্বর-এর ঐ পরাজয়ের গ্লানি 'গৌড়জনরা' বিস্মৃত হতে পারেনি। তারা ১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভক্তি স্বেচ্ছায় মেনে নিয়ে তাই প্রমাণ করলো। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গকে তারা ঠেকিয়েছিল শুধু একটি কারণে। আর তার কারণ ছিল মুসলিম প্রাধান্যের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করবে না। উত্তর ভারতীয় আর্য-উদ্ভব ব্রাহ্মণ আর মাড়োয়ারী বেনিয়াদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও অর্থনৈতিক শোষণ মেনে নিয়ে কলকাতার বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বাংলাভাষী হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গকে ঠেকায়। আবার একই কারণে তারা ১৯৪৭ সালে বংগ বিভক্তিকে মেনে নেয়। আজও পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা দিল্লীর শোষণে কঁকিয়ে মরছে। তবু আর্যদের খাতক-অনুগামী হয়েই তারা থাকবে।

বঙ্গ জনপদ বা আজকের বাংলাদেশের এমন বহু এলাকা আছে, যেখানে অমুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য। এ থেকে অনুমান করা খুবই অসম্ভব যে, মুসলমানদের বিপুল সংখ্যা ধর্মান্তরিত প্রক্রিয়ায় ইসলামে দাখিল হয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম যদি শক্তি ও মুসলিম শাসনের প্রভাবে সম্প্রসারিত হতো, তা হলে শত শত বছর যে দিল্লী ছিল মুসলিম শাসনের কেন্দ্রবিন্দু, সেখানে কেন হিন্দু সংখ্যাধিক্য থাকবে ? এসব সূত্র বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা সম্ভব যে, এ বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই বাইরে থেকে এসে বিরাট বিস্তৃত জমিনে জনপদ গড়ে তুলেছেন। সমুদ্র-নদী থেকে উত্থিত নব্য ভূমি এবং গহন বিপদ-সংকুল ঘন অরণ্যকে বহিরাগত মুসলমানরাই সম্ভবত আবাদ করে জনবসতি গড়ে তুলেছিলো। এবং এ কারণে ঐ সব জনপদের মুসলমানরাই হচ্ছেন প্রথম পত্তনকারী ও অধিবাসী। বাংলাদেশে এখনও বহু অঞ্চল রয়েছে, সেখানে একই গ্রামের বিভিন্ন পাড়া বা মহল্লায় নিরঙ্কুশ মুসলমান ও হিন্দুদের আলাদা আলাদা বাস। এরা বেশির ভাগই তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত নমশূদ্র গোষ্ঠীর লোক। প্রশ্ন উঠে, একই গ্রামের দুই প্রান্তে মুসলমান ও হিন্দু পল্লী টিকে রইলো কিভাবে!

ধর্মান্তরই যদি মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণ হয়, তা হলে গোটা একটি পাড়া কি করে পুরোপুরি ইসলামের বাইরে রইল ? আবার দেখা যাবে যে, একটি গ্রাম বা ইউনিয়নের পাশে একটি পুরো গ্রাম বা ইউনিয়নে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বহাল রয়েছে। এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মুসলমানরা বাইরে থেকে 'মুসলমান' হিসেবে এসেই সেটল্ড্ হয়েছেন। ভূমির মালিকানা বা স্বত্বাধিকারী প্রথা বৃটিশ শাসনের আগে এ দেশে ছিল না। পতিত জমি যেখানে মুসলমানরা পেয়েছেন আল্লাহ্র নিয়ামত হিসেবে সেখানেই তারা বসতি গড়েছেন। তবে নদী তীরে, সহজ নৌ-যোগাযোগ আছে, এমন স্থানেই সম্ভবত তারা ঘর বেঁধেছেন। অনেক এলাকায় দেখা যাচ্ছে, নমঃ শূদ্র সম্প্রদায়ের লোকগুলো, যাদের গায়ের রং মিশমিশে কালো, আকৃতিতে বেঁটে-খাটো, কঠোর পরিশ্রমী ,তারা কৃষিকাজে একনিষ্ঠ। এর সাথে ছোটখাটো ব্যবসা বা শিল্প কর্মে তাদের আগ্রহ থাকলেও মূল পেশা এখনও কৃষিকর্ম। অন্য দিকে এর পাশাপাশি যেসব মুসলমান আছেন, তারা বেশির ভাগই ভূস্বামী-ব্যবসায়ী। এ থেকেও এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মুসলমানদের আগমন বাইরে থেকেই। সিপাহী বিদ্রোহের পতনের পর বা তার আগে মোঘল-পাঠান দ্বন্দ্বে পাঠানদের শোচনীয় পরাজয় পর্বে মোঘলদের ভয়ে অনেক তুরানী মুসলমান তাদের পদবী গোপন রেখেছিলেন। এর ফলে তাদের পদবী কালক্রমে হারিয়ে যায়। এভাবেও অনেক তুরানী মুসলমানের পরিচয় বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়। তবে বঙ্গ জনপদের বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ ও শূদ্র ইসলাম গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে যান, এ ব্যাপারে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই একমত। ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণ সূত্রে একথা বলতে হয় যে, মুসলমানদের কাছে পরাজিত উন্নাসিক জাত্যাভিমানী উচ্চ বর্ণাশ্রয়ী আর্য মানস সবসময়ই পরাজয়ের মানসিক গ্লানি বহন করে নেতিবাচক ঐহিকতায় দু' বাংলার মাঝে বিভেদের প্রাচীর খাড়া করে রেখেছে, দুই বাংলার গণমানসের বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা-সূত্র সম্ভবত এখানেই পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে একটি জাতীয়তা গড়ে উঠে মূলত বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে। ঐতরেয় আরণ্যক আর জৈনগ্রন্থের সীমাবদ্ধতা, শশাঙ্কের অবজ্ঞা, পাল

রাজাদের অবহেলা ও সেন রাজাদের উপেক্ষায়–'বংগাল'–এর নাম অন্তর্হিত হয়ে গৌড়–বংগ সুলতানী আমলে একীভূত হলো। মুসলিম স্বাধীন সুলতানী আমলেই বঙ্গ তার গ্লানি ও অপমান থেকে অব্যাহতি পায়। শশাঙ্ক থেকে সেন আমলের প্রারম্ভ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শ' বছরের গৌড় ও বঙ্গের রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের অবসান ঘটে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে। স্বাধীন মুসলিম সুলতানী আমলে বৃহৎ বাংলায় রাষ্ট্রীয় ঐক্য সূচিত হলেও আর্য–মানসিকতা পীড়িত গৌড় বংগের হিন্দুরা কখনও মৃত্তিকা সংলগ্ন 'বাংগালী' বলে নিজেদের ভাবেনি। সেন রাজাদের পরাজয়ের গ্লানি তারা নিজেদের ঘাড়ে বহন করে মুসলমানদের প্রতিপক্ষই থেকেছে। একই মিথ্যা অহমিকার দায় বহন করেই তারা মুসলিম শাসনের অবসান ঘটবার জন্য বৃটিশের সহযোগী হয়েছিল। জগৎশেঠ, রাজবল্লভ উর্মিচাঁদরা সেনরাজাদের পরাজয়ের গ্লানিকে এভাবে উপলব্ধি করেছে।

সুলতানী আমলেই ক্ষয়িষ্ণু বাংলা ভাষা, যা সংস্কৃত ভাষার 'দুহিতা' হয়ে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছিল, তা পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়। অনেক দুর্বলতা নিয়ে রাঢ় এলাকা, উচ্চবর্ণ অঞ্চল এড়িয়ে প্রাকৃতজনের পর্ণকুটিরে লালিত, বর্ধিত হতে হয়েছে এ ভাষাকে। সুলতানিগণ তাঁকে রাজপ্রাসাদে স্থান দিলেন।

১৫৩৯ সালে বঙ্গদেশ তার স্বাধীনতা হারালো। বাংলাদেশ মোঘল সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়। নাম হয় 'সুবে বাংলা'। উপমহাদেশ জুড়ে পাঠান–মোঘলের দ্বন্দ্ব এবং বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের অবসানের সুযোগে উচ্চবর্ণের আর্য–জাত্যভিমানী গৌড়জনরা কূট–কৌশলের আশ্রয় নিয়ে নতুন খেলায় মেতে উঠল। মোঘলরা রাজনৈতিক প্রয়োজনে আর্য–হিন্দুদের তোষণ করে। সম্রাট আওরংগজেবের আমলে এই নীতির অবসান ঘটে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলার জনগণকে মোঘলরা কখনই প্রশ্রয় দেয়নি, তাদের সংস্কৃতি–সাহিত্যের বিকাশও চায়নি। এই সুযোগে বর্ণ–হিন্দুরা সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষার একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। মোঘ সম্রাটদের তারা 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা', বলে প্রণাম করেছে; ঠিক যে গৌড়েশ্বরকে প্রণাম করেছে। এখনও তাই রাঢ় বঙ্গের গৌড়–জন আনুগত্য পোষণকে ধর্মীয় কর্তব্যের মতোই মনে করে।

বাংলাদেশের ভূ–তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয়। সবাই জানেন প্লাইস্টোসিন যুগের প্রারম্ভে জলবায়ু খুবই ঠাণ্ডা ছিল, ভূভাগের অনেকাংশ ছিল বরফাচ্ছন্ন। তখন বঙ্গোপসাগরের পানির তলদেশ অনেক নিচে নেমে যায়। কালক্রমে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে থাকে, জলবায়ু শীতল ও শুষ্ক হয়ে ক্রমে উষ্ণ ও আর্দ্রতর হয়, আর অধিক বৃষ্টিপাত ও বরফ গলার ফলে বঙ্গোপসাগরের পানিতল ক্রমে উপরে উঠতে থাকে। এটা ক্রমে এত উপরে উঠে যে, হিমালয় পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত সবটাই পানিতে নিমগ্ন হয়। আজও প্লাইস্টোসিন যুগের লাল–পলি অঞ্চল আমরা বরেন্দ্র ও মধুপুরে দেখতে পাই। (এম.আই. চৌধুরী ঃ আকরম হোসেন পঠিত 'বাংলাদেশ' প্রবন্ধের আলোচনা।)

"প্লাইস্টোসিন যুগ যদি দশ লক্ষ বছর ব্যাপৃত থাকে, তাহলে এ ঘটনার সময়কাল অন্তত পাঁচ লক্ষ বছর ধরা চলে। অধিকাংশ গবেষক–পন্ডিতদের এই অভিমত। তারপর নদী–নালা দ্বারা বাহিত পলিমাটি, কাঁকর, বালি ইত্যাদি জমে বাংলাদেশের ভূভাগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সমুদ্র গর্ভ হতে ভূমি জেগে উঠতে যদি আরও দু'লাখ আড়াই লাখ বছর লেগে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের জন্ম মোটামুটি দু' থেকে আড়াই লাখ বছর বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।" (এম.আই. চৌধুরী)

পন্ডিত–গবেষকরা এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে, বাংলাদেশ কখন থেকে জন অধ্যুষিত হয়, তার সঠিক– কাল নির্ণয় দুরূহ। ইয়াল–কেমব্রিজ অভিযানের ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায় যে, "উপমহাদেশের অনেক স্থানেই বরফ যুগের মধ্যবর্তী সময়ে লোকবসতি ছিল। বিশেষ করে হিমালয়ের পাদদেশ, দক্ষিণ ও ভারতের পূর্ব উপকূলে; কিন্তু বাংলাদেশের কোথাও জনবসতির চিহ্নের বাংলা। পাওয়া যায়নি। এমনকি, সমগ্র গাঙ্গেয় অববাহিকায় ৫০০০–

আমলে। ঐত

৭০০০ বছর আগেও কোন জনবসতি ছিল না।" (বাংলাদেশ ঃ আকরম হোসেন প্রসঙ্গ প্রাগুক্ত, এম.আই, চৌধুরী)।

পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত কিংবা বৈদিক যুগের গ্রন্থসমূহ যেসব তথ্য উপাখ্যান দিয়েছে, তাও অনির্ভরযোগ্য, অতিকথনে দুষ্ট এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিবর্জিত। ঐ সময় উত্তর ভারতের নদী অববাহিকায় জনবসতি ছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বাংলাদেশ সংলগ্ন মগধ ও চম্পা রাজ্য দুটিতে জনবসতি ছিল।

গবেষক-পন্ডিতরা এ ব্যাপারে একমত যে, খৃষ্টপূর্ব ৩১০০ বা ৩১০২ সনে এ পৃথিবীর অনেক স্থানেই এক মহাপ্লাবন ঘটে। এ উপমহাদেশও এ প্লাবন হতে মুক্ত ছিল না। হতে পারে এটি পবিত্র কুরআন বর্ণিত নূহ (আ)-এর সময়কার মহাপ্লাবন। তবে এই অনুমানের কোন প্রমাণ সূত্র নাই। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম, আগ্রা এবং বদ্বীপ অঞ্চলের অন্যত্র মাটির নিচে বড় বড় প্রস্তর ও উপলখন্ডের এক বিরাট স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। এ প্লাবনের সাথে তার যোগ আছে। এ হতে প্রমাণিত হয় যে, প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বেও বদ্বীপ অঞ্চল সাগর গর্ভে নিমজ্জিত ছিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ জেমস ফারগুসন পূর্ব ভারতের প্রাচীন নগরীর এক গবেষণামূলক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, আজকের ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকার মতোই ৫০০০ বছর আগে গংগা নদীর অববাহিকাও ছিল তেমনি স্যাঁতস্যাঁতে জঙ্গলাকীর্ণ ও মানববসতির অনুপযোগী। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগেও বাংলাদেশে মানব বসতি ছিল না। নানা দিক বিশ্লেষণ করে পন্ডিত গবেষকরা মোটামুটি একমত হয়েছেন যে, বাংলাদেশের জনবসতির ইতিহাস ৩০০০ বছরের। কিন্তু এই মতও যে সর্বজনগ্রাহ্য হবে, তা বলা চলে না। অগ্রসরমান গবেষণাকর্ম এবং মানুষের অন্তহীন আবিষ্কারের নেশা, তার সৃজনশীল চৈতন্য হয়তো আরও নতুন সত্যের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবে।

বাংলাদেশ পরিচিতি

বিশ্ব মানবচিত্রে বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক অস্তিত্ব ইতিহাসের কোন্ সময়টিতে মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে, তার সঠিক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব না হলেও ভূতাত্ত্বিকরা এ ব্যাপারে একমত যে, বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। এ নিয়ে পন্ডিত-গবেষকরা যেসব তথ্য-উপাত্তের সন্ধান আমাদের দিয়েছেন, তার অনুসরণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

বাংলাদেশ কবে, কখন সমুদ্রগর্ভ থেকে ভেসে উঠেছে এবং মানব বসতির উপযুক্ততা অর্জন করতে তার কত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, এ জিজ্ঞাসার জবাব উদ্ধার করাও সহজসাধ্য নয়। প্রকৃতির ভাঙ্গাগড়া, মহাকালের অবক্ষয়-ধ্বংস, অবলুপ্তি ইত্যাদি সৃষ্টির পাশাপাশি চলতে থাকে। ভাঙ্গাগড়ার সেই নিষ্ঠুর খেলায় বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ডটি কখন কিরূপ ছিল, তা-ও নিরূপণ করা কঠিন।

মানব জাতির আদি বসতি কোথায়, তা নিয়ে গবেষণা অনেক হলেও বিষয়টি আজও রহস্যাবৃত্ত। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, হযরত আদম, যিনি প্রথম মানুষ, তিনি বর্তমান শ্রীলংকা (সিংহল বা সরণ দ্বীপে) নিক্ষিপ্ত হন। ঐ সময়ও বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডের অস্তিত্ব থাকা বিচিত্র নয়। এখন আমরা পৃথিবীর বিস্তার ও বিন্যাস যেভাবে দেখছি, অতীতেও এমনটাই ছিল, এর কোন প্রামাণ্য দলীল আমাদের হাতে নেই। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ মহাদেশগুলোকে আমরা এখন যেভাবে প্রত্যক্ষ করছি, পৃথিবীর আদি উৎসে এমনটা ছিল, এ কথা বলা যাবে না। এমনটা হওয়াও বিচিত্র নয় যে, গোটা পৃথিবী একদা পরস্পর সন্নিবদ্ধ ছিল, দূরত্ব ছিল সীমিত। ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনে সবকিছু উলট-পালট হয়েছে। এখনও যখন নদীগর্ভে জনপদ বিলুপ্তি, নতুন করে চর জেগে উঠা কিংবা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিরাট ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন সাধন করছে, তখন রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ার প্রভাব কিভাবে কোথায় কতটা পড়েছে, সেটা বলা কঠিন।

মোটামুটি ইতিহাসের জ্ঞাত অধ্যায়সমূহে বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডটি কিভাবে গড়ে উঠেছে, কিভাবে পরিবৃদ্ধি লাভ করেছে এবং জনবসতি বৃদ্ধি পেয়েছে, তার একটি খতিয়ান আমরা উদ্ধার করতে চাইবো। পরবর্তী অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আলোচনা করবো।

আজকের বাংলাদেশ ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিত

আজ বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম একটি স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম দেশ। প্রায় এগারো কোটি জন-অধ্যুষিত এ দেশটি পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জনসংখ্যার শতকরা পঁচাশি ভাগ মুসলমান। ইসলাম জনগণের ঐক্য ও সংহতির মূল সূত্র। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে আমরা এ সত্যে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামই মূলত এ উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সত্তায় পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। '৪৭-এর দেশ ভাগের সূত্রে প্রাপ্ত 'পাকিস্তান'-এর পূর্বাংশ নিয়েই আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। তবে কেবল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই নয়, মোঘল আমলেও বাংলার এই এলাকার জনগণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে টিকে থাকার জন্য দুরন্ত সংগ্রাম করেছে। সংগ্রামে, সংকটে, দুর্যোগে এ অঞ্চলের জনগণ কখনও পিছু হটেনি। ইতিহাস এ ব্যাপারে স্পষ্টবাক যে, বাংলাদেশের জনচরিত্রে এই যে অন্তহীন সংগ্রামের প্রেরণা, তার মূল উৎস হচ্ছে, শাশ্বত জীবন-ধর্ম ইসলাম। বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ ইসলামের অনুসারী। ইতিহাস এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য উপস্থাপনে অপারগ যে, এই বিশাল জনসংখ্যার কত ভাগ স্থানীয় আদিবাসী ধর্মান্তরিত মুসলমান, আর কত ভাগ বহিরাগত মুসলমান, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে এই সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ডে এসে নোঙ্গর গেড়েছিল। যারা ইসলামের উদার বিশ্বজনীন আবেদনে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিলেন, তারা এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী। এ এলাকার নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের সাথে আগে থেকেই তারা যথেষ্ট একাত্ম ছিলেন। তবে ইসলাম যখন একটা গোটা জনগোষ্ঠীর জীবনধারা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ায়, তখন অবাধ আন্তঃবিবাহের মাধ্যমে জাতিসত্তার নব রূপায়ণ হয়। ইসলামে যেহেতু শ্রেণীভেদ বা বর্ণাশ্রম প্রথার কোন স্থান নেই, সে কারণে স্থানীয় ধর্মান্তরিত ও বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ ছিল অবারিত। ফলে এই ভূখণ্ডের মুসলমানদের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে এবং তাদের নৃতাত্ত্বিক অবয়বও ক্রমশ

রূপান্তরিত হয়ে একটি নতুন অবয়ব নির্মাণ করে। এই অনুসিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করা কঠিন।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর মক্কায় ক্ষুদ্র মুসলিম জামাতটি কোরেশ-কাফিরদের নানারূপ ষড়যন্ত্র ও শত্রুতার শিকার হন। এক পর্যায়ে ইসলামের মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করা হয়। এই বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রকে তাৎক্ষণিকভাবে মুখোমুখি শক্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মুকাবিলা করার কৌশল পরিহার করে মহানবী (সা) তাঁর কতিপয় প্রিয় সাথী সহ মদীনায় হিজরত করলেন। এটি ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশ। হিজরতের মাধ্যমে ইসলাম মানবজাতি এবং বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে জাতীয়তার এক নতুন ধারণা উপস্থাপন করে। এতকাল জাতীয়তা ছিল ভূখণ্ড কেন্দ্রিক, গোত্রভিত্তিক। দেশপ্রেম অর্থে দেশের মাটির পূজা করা হতো এবং এটি পৌত্তলিক দর্শন-উৎসারিত। ফলে মানুষের প্রয়োজন পূরণ তথা ব্যবহারের জন্য যে বিপুল নৈসর্গিক সৃষ্টি-সম্ভার দৃশ্যমান, তাকেই মানুষ ভক্তি ও প্রণতি জানাতে থাকে। কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই শুধু নয়, বিশ্বের অনেক শক্তিমান কবিই মানুষের মেধা-মনন, ঐশ্বর্য ও অন্তর্নিহিত সৌকর্য-চিৎপ্রকর্ষ ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কাছে সমর্পিত হয়েছেন। দেশকে, দেশের মাটিকে, নিসর্গকে মানুষের চেয়েও মর্যাদাকর কিছু মনে করেছেন। ফলে মানুষ সেখানে উপেক্ষিত হয়েছে, সেখানে মানুষের চিত্তের ঐশ্বর্য, আদর্শিক দিক-নির্দেশনা অথবা চিরন্তন মূল্যবোধসমূহ, তার অন্তরের বিশ্বাস, স্রষ্টার প্রতি সমর্পণের চিরন্তন আকুতি প্রকৃতি পূজার কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। মানুষ, মানুষের আদর্শ, ধর্মীয় চেতনা কিংবা ঐশী শিক্ষা ছাপিয়ে জড় প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণের আকুতি প্রাধান্য পেয়েছে। অনেকেই তাই মাটিকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন, 'ওমা তোর চরণ তলে ঠেকাই মাথা' ইত্যাদি ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এটি মূলত জড়বাদী-পৌত্তলিক বিশ্বাসেরই নির্যাস। মানুষের মহত্ত্ব, তার ঐশ্বর্য, তার চিরন্তন আনন্দ, স্রষ্টার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ইত্যাদির বিনিময়ে দেশের মাটির মায়ায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকার কোন যুক্তি নেই। ইসলাম এসে জড়বাদের ভিত্তিতে প্রচণ্ড আঘাত হানে,

মাটির প্রেম, ভূখণ্ডের দাবি যে আপন বিশ্বাস এবং ধর্মীয় নির্দেশনার কাছে তুচ্ছ, মূল্যহীন, ইসলামই আনুষ্ঠানিকভাবে সে সত্য তুলে ধরেছে। অবশ্য প্রায় প্রত্যেক নবীকেই স্রষ্টার বাণী প্রচারের দায়ে জন্মভূমি থেকে 'হিজরত' করে অপেক্ষাকৃত অনুকূল ভূখন্ডে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। যখন নবীদের কাছে জন্মভূমির চেয়েও মিশনারী দায়িত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে, যখন মাটি ও আদর্শ এই দু'য়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তখন নবী প্রভু বাণী বাহকের মর্যাদাশীল দায়িত্বটি পালনের তাকিদে হাসিমুখে জন্মভূমি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসতি গেড়েছেন। মহানবী (সা) জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় যাবার সময় মক্কার জন্য বেদনা অনুভব করেছেন ঠিকই। কিন্তু মদীনাকেও তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। ইসলামের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। আর তাই তাঁর ও প্রিয়জনসহ বহু সাহাবী মদীনার শান্ত-স্নিগ্ধ মরু প্রান্তরে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। পবিত্র কা'বা তাওয়াফকারী প্রতিটি নবী প্রেমিক মুসলমান তাই মদীনা যিয়ারত না করে মানসিকভাবে পরিতৃপ্ত হন না। প্রতিটি হজ্জযাত্রী একবার চিরনিদ্রায় শায়িত নবীজী (সা)-র দরবারে হাজিরা দেন। ইসলামের ইতিহাসে হিজরত এক যুগান্তকারী বিপ্লবী ঘটনা। হিজরতের প্রসঙ্গ এ জন্যই উল্লেখ করছি যে, 'হিজরত'-এর অনুমোদন যদি না থাকত, তাহলে মুসলমানরা এত দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারত না, ইসলামও স্বল্প সময়ে এতটা সম্প্রসারিত হতে পারত না। হিন্দু ধর্মে সমুদ্র যাত্রা ছিল নিষিদ্ধ। ফলে নিজস্ব পরিচিত ভূখণ্ডের গণ্ডীর বাইরে তাদের স্থানান্তরিত হয়ে পুনর্বাসনের কথা তারা কল্পনাও করতে পারত না। মাটি ও মাতৃভূমিকে আজও তারা 'মা' মনে করে এবং মায়ের আরাধনা উপাসনাকে তারা ধর্মীয় কর্তব্য বলেই মনে করে। ফলে যে কোন রাজনৈতিক বাস্তবতায় রাষ্ট্রীয় সীমানার অনিবার্য পরিবর্তনকে তারা সহজে মেনে নিতে পারে না। এটাকে তারা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন বলে মনে করে। ১৯০৫ সালে এ দেশে রাজনৈতিক প্রয়োজনে যে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে হিন্দু জনগোষ্ঠী ধর্মীয় আবেগ সঞ্চারিত করে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ধর্মীয় আবেগের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা ঐ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের

তীব্রতার মুখে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে দিতে বাধ্য হন। হিন্দু জনগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ সন্তানরা সকলেই ঐ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো 'উদারচেতা' কবিও ধর্মাশ্রিত উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে বাধ্য হলেন। এই পটভূমিতে তিনি বেশ কিছু দেশাত্মবোধক গান (যার অধিকাংশই নিসর্গ-বন্দনা ও মাতৃ বন্দনায় আকীর্ণ) লেখেন।

'৪৭ সালের দেশ বিভক্তির অন্তর্জ্বালা আজও কিন্তু কার্যত হিন্দু জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীরা ভুলতে পারেননি। সুযোগ পেলেই তারা 'অখণ্ডতার' দোহাই দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের কোন সময়ই গোটা ভারতভূমি একটি অখণ্ড রাষ্ট্র না থাকলেও হিন্দু ধর্মীয় উপাখ্যান ও জনশ্রুতিকে অবলম্বন করে আজও 'অখণ্ড রাম রাজ্য' প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলছে। এ প্রসঙ্গটি এ জন্যই উত্থাপন করছি যে, ইসলামের জাতীয়তার ধারণা, জাতীয়তা বোধ ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিবেশী আর একটি জাতির একই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, তার একটি তুলনামূলক ভাষ্য পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা। বস্তুত আমাদের দেশে আজও জাতীয়তা বলতে অনেকে মাটি-নিসর্গের সাথে সন্ধিকে বুঝে থাকেন।

ইতিহাস এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে একমত যে, এ উপমহাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী, যারা হিন্দুধর্মের অনুসারী, তারা বহিরাগত এবং আর্য জনগোষ্ঠীই এ দেশে প্রথম সভ্য মানুষ নয়। আর্য নামে পরিচিত এই ভাগ্যান্বেষী জনগোষ্ঠী প্রধানত পৌত্তলিকতার অনুসারী, মূর্তি ও প্রকৃতি পূজক। এরা সম্ভবত মানবজাতির সেই ধারার প্রতিনিধি, যারা খোদায়ী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত। অনেকটা গ্রীক জীবন দর্শন ও পারসিক অগ্নি উপাসকদের ছায়াপাত আর্যদের জীবনধারা ও আচরণে দৃশ্যমান। তবে এরা সাধারণত অহংকারী বর্ণাশ্রম প্রথায় বিশ্বাসী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, হিংস্র, উগ্র, অসহিষ্ণু, অনুদার এবং সংকীর্ণ। এরা মনে করে যে, এদের ধর্ম, কৃষ্টি ও জীবনধারার চেয়ে ভালো ও শ্রেষ্ঠ কিছু এ পৃথিবীতে নেই। অন্যকে গ্রহণ করার ব্যাপারে এরা যেমন সংকুচিত, সতত বিব্রত, তেমনি অন্য কোন জীবনধারার সাথে ভাব বিনিময়েও এরা শংকিত।

এরা মনে করে, রক্ষণশীলতার মধ্যেই তাদের অস্তিত্ব টিকবে, উদার ভাববিনিময়ে তাদের স্থিতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে এ উপমহাদেশ ছাড়া আর কোথাও হিন্দু ধর্মের কোন অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। এদের অহমিকা এতটা আকাশস্পর্শী যে, প্রতিবেশী নেপালী হিন্দুদেরকেও এরা খাঁটি হিন্দু মনে করে না। আর্য–ব্রাহ্মণ্যবাদী অহমিকার এই প্রাচীর তাদেরকে বিশ্ব মানব সমাজের অপরাপর অংশ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

অথচ মুসলমানদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলমানরা 'মুক্ত দেশে মুক্ত ইসলাম' চান। উপমহাদেশের মুসলমানদের নৃতাত্ত্বিক উৎস সন্ধান করলে একথা বলতে হয় যে, তারা প্রধানত মিশ্র নৃতাত্ত্বিক উপকরণের সমন্বয়ে একটি নতুন জাতিসত্তা নির্মাণ করেছেন। যুদ্ধ–বিগ্রহ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জীবন–জীবিকার আদিম তাড়না ইত্যাদি মিলে এ ভূখন্ড অগণিত মানবগোষ্ঠীকে প্রলুব্ধ করেছে। সঙ্গত কারণেই এ অঞ্চলে ইসলামের প্রাচীনত্ব দেড় হাজার বছরের সীমা অতিক্রম করে নেয়া সম্ভব নয়। কেননা, ইসলামের উদ্ভবই হয়েছে মাত্র চৌদ্দ শ' বছরেরও কিছু কম সময় আগে। ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তৌহিদ, একত্ববাদ, এক আল্ল্যাহ্‌র কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই তৌহিদের মূল শিক্ষা। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ 'দীন' হিসেবে মহানবী (সা)–এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলেও সমসাময়িক আরব ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে তৌহিদের মূল চেতনা খন্ডিতভাবে হলেও বহুলাংশে জনচিত্তে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানব সমাজের একটি অংশ কোন না কোন পর্যায়ে পৌত্তলিকতার কলুষিত জীবন উপেক্ষা করে একত্ববাদের মূল শিক্ষা অনুসরণ করতো। বনি ইসরাঈল ও ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী বহু ধার্মিক ব্যক্তি তখনও ছিলেন। ভারতের এই অংশেও একত্ববাদের অনুসারী জনগোষ্ঠীর সাক্ষাত পাওয়া যায়। আর্যদের আগে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাকেন্দ্রিক যে উন্নততর সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে, ঐ সভ্যতার জনগোষ্ঠী আর্যদের মত পৌত্তলিক ছিল কি না বলা মুশকিল। ইতিহাসের সকল মানবসমাজই কোন না কোন ধর্ম অনুসরণ করেছে। ভারতে এক সময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। ঐ দু'টি ধর্ম বহিরাগত আর্যদের মতো পৌত্তলিকতাশ্রয়ী নয়। বৌদ্ধ ধর্মের আগে সিন্ধু তীরের সুপ্রাচীন

সভ্যতায় কোন্ ধর্ম প্রচলিত ছিল তা অবশ্য নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, এ উপমহাদেশে বিগ্রহের উপাসনা বহিরাগত আর্যদেরই আমদানী। এই পৌত্তলিক আর্যরাই পরবর্তী পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্ম, কৃষ্টি, স্থাপত্য ও জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার এক উন্মত্ত অভিযান চালায়। ফলে বৌদ্ধরা আজ তাদের মূল উৎসভূমি ছেড়ে চীন, বার্মা, বাংলাদেশে ঠাঁই নিয়েছে।

আগেই বলেছি, হিন্দু ধর্ম সংরক্ষণবাদী; ফলে সবসময়ই এ ধর্মানুসারীরা বাইরের সংশ্রব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়। সমুদ্র যাত্রাকে তাই হিন্দু ধর্মে কঠিন ধর্মীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। একটা বিষয় আমরা খুব তাৎপর্যের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ঈসায়ী ধর্মের উৎপত্তি প্রায় দু' হাজার বছর আগে হলেও মাত্র দু'শ বছর আগে এ উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমনের আগে কিন্তু 'খৃস্টবাদের' কোন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এখানে আসেনি। কেন আসেনি, এটি অবশ্যই গবেষণার বিষয়। জারের রাশিয়াও যেখানে 'খৃস্টবাদের দ্বারা প্লাবিত' হলো, সেখানে বিশাল ভারত কিভাবে খৃস্টবাদের প্রভাবকে এড়িয়ে থাকলো ? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব বিশ্লেষণসাপেক্ষ এবং ঐতিহাসিক গবেষকরাই এর সদুত্তর দিতে পারবেন। তবে আমাদের বিবেচনায় এটা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, এর প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, সমসাময়িক ভারতীয় ভূখন্ডে এমন কিছু উন্নততর ধর্ম ও কৃষ্টি প্রচলিত ছিল, যার কাছে 'খৃস্টবাদ' কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। অথবা সচেতনভাবেই সমসাময়িক ভারতের জনগোষ্ঠী যে কোন বহিরাগত নতুন ধর্মের প্রভাব এড়িয়ে গেছেন। এমনও হতে পারে যে, পরিকল্পিত ও সংগঠিতভাবে কেউ এ দেশে ঈসা (আ)–এর বাণী প্রচারের উদ্যোগ নেয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে ঈসা (আ)–কে গ্রহণের মাঝে যে স্বতঃস্ফূর্ততা দৃষ্টিগ্রাহ্য, পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে 'খৃস্টবাদ' গ্রহণ ততটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথা রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় 'খৃস্টবাদ' সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রধানত রাজারা রাজনৈতিক প্রয়োজনে একটি ধর্মীয় ঢালের প্রয়োজনে 'খৃস্টবাদের' আশ্রয় নিয়েছেন। রাজ্য বিস্তারের জন্য শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ম বিস্তারে প্রেম ও উদারতা মানুষকে

আকৃষ্ট করে। শাসক অধিকাংশ মানুষের ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে নির্বিবাদে শাসন কাজ চালাতে চায়। প্রজারা রাজার ধর্মকে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে এবং কোথাও রাজার ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়েছে এমন ঘটনা বিরল। ঐ সব রাজা প্রজাদের নিঃশর্ত আনুগত্য পাবার জন্য 'শাসকরা খোদার প্রতিভূ' এমনভাবে চালিয়েছেন এবং এটা ধনন্তরীর মতোই ফলপ্রসূ হয়েছে। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, শুধু ভারতই নয়, এশিয়ার অন্যান্য দেশ যথা–চীন, জাপান, বার্মা, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান, কোরিয়া, প্রভৃতি দেশও 'খৃষ্টবাদ' –কে গ্রহণ করেনি। এসব দেশে আজ যে মুষ্টিমেয় খৃস্টান দেখা যাচ্ছে, তা ঔপনিবেশিক শাসনের সাম্প্রতিক ফলশ্রুতি। অথবা এটি আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা–সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত দু'চারজনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এশিয়ায় ব্যাপকভাবে খৃষ্টবাদ গ্রহণের কোন প্রমাণ নেই। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এশিয়ার জনচিত্ত বহিরাগত কোন ধর্ম গ্রহণে উৎসাহী ছিল না। অন্তত ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের হৃদয়ে কোন তৃষ্ণা বা শূন্যতা ছিল না। সম্ভবত এশীয় বা প্রাচ্য জনগোষ্ঠী আগে থেকেই যে ধর্ম অনুসরণ করতো, তার ঐশ্বর্য ও সারবত্তা খুব একটা নিকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু ইসলামের বেলায় আমরা কি লক্ষ্য করছি ?

ইসলাম সারা বিশ্বে এক বিপ্লবের বার্তা নিয়ে এলো। ইসলাম যেহেতু আল্লাহ্‌র ধর্ম, মানব জাতির একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা এবং ফিত্‌রাত বা স্বভাবের ধর্ম, সে কারণে ইসলামের একটি অপ্রতিহত স্বাভাবিক বিশ্বজনীন আবেদন আছে। ইসলাম তার আগমনের মাত্র দু'তিন দশকের মধ্যেই অর্ধেক পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। ইসলাম কোথাও তরবারির নৃশংসতায় নয় ; বরং মানবিক উদারতায়, মহত্ত্বে, ঔদার্যের পরশমণি দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে। তাই তো ইসলাম আজও কালজয়ী, কালোত্তীর্ণ। দেশে দেশে যুগে যুগে ইসলামই তার অনুসারী জাতিসত্তাকে রক্ষা করেছে, ইসলাম কারও অনুগ্রহ নিয়ে বাঁচেনি। ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শের অন্তঃসলিলা শক্তি মাহাত্ম্যই ইসলামকে দুর্জয় আর্থ–সামাজিক রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত করেছে।

ইসলাম বিজয়ীর বেশে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার বহু আগেই ইসলামী সমাজের একটি গণভিত্তি নির্মিত হয়েছিল। অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রয়োজন

ছাড়াই ইসলামের প্রথম যুগের প্রচারকরা ভারতীয় উপকূলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের মহান বাণী নিয়ে আসেন। ইতিহাসের সুপ্রাচীনকাল থেকেই আরবীয় বণিকদের সাথে ভারতীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভাস্কো দা গামার ভারত 'আবিষ্কার' খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। এখন গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভাস্কো দা গামাকে যিনি পথনির্দেশ করে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি একজন মুসলিম নাবিক, তাঁর নাম আবদুল মজিদ। এ তথ্যটি সম্প্রতি রাশিয়ার পন্ডিতরাও স্বীকার করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানরা বহু আগে থেকেই ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

মুসলমানরা বিশ্বের যে স্থানেই বসতি স্থাপন করেছেন, সেখানেই তাঁরা স্থায়ী হবার চেষ্টা করেছেন। নতুন স্থানের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি, পরিবেশ-প্রতিবেশ ইত্যাদির সাথে একাত্ম হয়েছেন। কোন আভিজাত্য বোধ কিংবা নতুনকে গ্রহণ করার মানসিক বৈকল্য বা পীড়ন তাঁরা অনুভব করেননি। এর ফলে দেখা গেছে যে, মুসলমানরা স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রভূত উৎকর্ষ করেছেন। নতুন ভূমিতে তাঁরাই হয়ে উঠেছেন মূল জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের মুসলমানরাও তেমনি এ ভূখণ্ডকে হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে আপন করে নিয়েছেন। বহিরাগতের হীনমন্যতা বা উগ্র আভিজাত্য তাঁদেরকে কখনও বিভ্রান্ত করেনি। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশে মুসলমানদের একক অবদান প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের কোন বহির্দেশীয় আনুগত্য (Extra Territorial loyalty) নেই। তাদের প্রধান আনুগত্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর প্রতি। আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান, এ বিশ্ব একটি একক ইউনিট। আদর্শ স্থানকেন্দ্রিক নয়। আদর্শের স্থিতি মানুষের হৃদয়ে, তার বিকাশ মানুষের আচরণে। এ জন্য চাই একটি ভূখন্ড। এই বিশ্বাস থেকেই মুসলমানরাই একটি বিশ্বজনীন তৌহিদী জাতীয়তার গ্রন্থি রচনা করেছে। এ জাতীয়তা আগ্রাসী নয়, সমন্বয়ধর্মী ও মধ্যপন্থী। উগ্র নয়, সহনশীল, অনুদার নয়, উদার, মহৎ মানবিক মূল্যবোধের দ্যোতক। আর এ কারণেই ইসলামের সাথে চরম বিপরীত মতেরও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বাধা নেই।

বিশ্বনবী (সা) 'মদীনা ঘোষণা'র মাধ্যমে বহু ধর্মের এক রাষ্ট্রে বাস করার একটি চার্টার বা সনদ বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে গেছেন। আজও ঐটি বিভিন্ন ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ম্যাগনাকার্টা। ধর্মীয় উত্তেজনা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ইত্যাদির কারণে মানবজাতি যেখানে জাহান্নামসম অগ্নি দহনে পীড়িত, সেখানে ইসলামই পারে আপন সত্তা অবিকল রেখে গোটা মানব জাতিকে একটি অখন্ড ঐক্যসূত্রে সংহত করতে।

প্রাচীন ভারত ও তার জনসমষ্টি

গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের হিন্দুস্তানে আসার আগে দৈহিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্থানীয় জনসমষ্টির রূপ কি ছিল, সে সম্বন্ধে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'জাতীয় সংহতি' (ভারতীয়) বিষয়ক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়–এর এক ভাষণ থেকে খুব সহজে ও সংক্ষেপে ধারণা করা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

'We have in India, to start with, the *Negritos* probably the earliest people who came to India, and made this land their home. This was apart from some likely prehistoric autochthones, who are problematical. Then came the *Austrics* possibly a very clear offshoot of a Primitive Mediterranean people, who became characterised within India as *Kols* (Mundas) and *Mon-Khemers* (including the Khasi and the Nicobores). Then after, here arrived the Dravidians, who are generally considered to be a branch of the Mediterranean race, but some hold them as having been of unknown origin, as a *Melanindian* or Black Indian people, finding home in India from prehistoric times. Then we have the Aryans of Indo-European origin related to the Iranians.'

প্রাচীন ভারতীয় জনসমষ্টি দৈহিক গঠন ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুনীতি কুমার 'কিরাত–জন–কৃতি', 'বটল্‌স্ এ্যান্ড এরিয়ানস্', 'ইন্ডিয়ানিজম', 'ইরানিয়ানিজম', 'ইন্ডিয়া', *এ পলিগলট্* নেশন' প্রভৃতি বইয়ে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই জনসমষ্টিকে নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বর্তমানে চারটি সাধারণ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ নিষাদ, দ্রামিড় বা দ্রাবিড়, কিরাত বা ভারতের মঙ্গোলীয় এবং আর্য।

প্রাচীন ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীনতম আর্যদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন নামে ইউরোপ ও এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রকম একটি আর্য জনগোষ্ঠী উত্তর-পশ্চিম হয়ে ক্রমশ ইরান হয়ে আরও দক্ষিণে এগুতে থাকে। এই জনগোষ্ঠীকে ইন্দো-ইরানিয়ান বলতে পারি এবং বেদ-এ ও আবেস্তা-তে এদের দেবতাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার বালটিক উপসাগরের তীরবর্তী বটলদের লোকসঙ্গীতের ভাব-ভাষা ও ধ্বনির সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের ভাব-ভাষা ও সংস্কৃত ধ্বনির গভীর সাদৃশ্য আছে। বালটিক উপসাগরের তীরবর্তী আর্যদের সঙ্গে সিন্ধু তীরবর্তী আর্যদের কোন এক সময়ে নিকট আত্মীয়তা থাকতেও পারে। অনুমান করা যায়, দক্ষিণগামী আর্যরা কিছুকালের জন্য ইরানে স্থিতি লাভ করে। কোন এক সময় দৈব বা দেব এবং অসুর বা অহুরের উপাসনা নিয়ে এদের মধ্যে মতভেদ হয়, ফলে তারা দু'টি দলে ভাগ হয়ে যায়। এদের একটা দল চলে আসে ভারতে। ডঃ সুনীতি কুমার বলেছেন যে, "ভারতীয় আর্য এবং ইরানী আর্য একই জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসেবে একাত্মবোধ করতো। 'অসুর' শব্দটিকে ভারতীয় আর্যরা অত্যন্ত ঘৃণা ও প্রতিহিংসার সাথে উচ্চারণ করতো। দেব আর অসূরের প্রসঙ্গে আমরা কোন সঠিক তথ্য পাই না। বহিরাগত ভারতীয় আর্যরা স্থানীয় বিজিত দ্রাবিড়দের 'অসূর' শক্তিরূপে চিহ্নিত করতো। আজও দেখা যায় যে, আর্যদের আরাধ্য দেবী গৌরবর্ণের দুর্গা কৃষ্ণবর্ণের বিশাল দেহী অসূরকে পর্যুদস্ত করে পরম তৃপ্তি পাচ্ছে। সুতরাং দেব ও অসূর একই জনগোষ্ঠীভুক্ত এমন কথা বলা যায় না। অনুমানটা এ ক্ষেত্রে অর্থভিত্তিক নয়।

পারস্য বা ইরান থেকে আগত বৈদিক আর্যদের পরে বহু বিদেশী দলে দলে ভারতে প্রবেশ করেছে। বিজয়ীর পদভারে এখানকার নগর-সভ্যতা জনজীবন বিনষ্ট করেছে। এখানকার প্রচলিত সমাজরীতি ও কাঠামো পরিবর্তন করেছে। আবার নিজেরাও পরিবর্তিত হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। দুস্তর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মানব জাতির সাংস্কৃতিক প্রবাহের স্বাভাবিক ধারায় স্থানীয় ধর্ম সংস্কৃতির দ্বারা বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ "এই বিদেশীদের অনেকেই ছিল আর্য ভাষী, কিন্তু বিভিন্ন কোম, কুল, যুথ বা সম্প্রদায়ের সাধারণত বিভিন্ন নাম থাকত আর সে সব নামের বিশেষ অর্থও

থাকত। যেমন মদ্র বলতে তাদের বোঝানো হতো যারা গর্বিত বা প্রমত্ত বা প্রফুল্ল, শব্দটা এসেছে গর্ব বা প্রফুল্লভাবোধক-সংস্কৃত মদ শব্দ থেকে। মহাভারতে উল্লেখিত মদ্র দেশ হলো একালের পাঞ্জাবের উত্তরাংশ। শকরাও আর্যদেরই একটি শাখা অর্থাৎ আর্যভাষী, শক্ত বা শক্তিমান অর্থে শকরা নিজেদের পরিচয় দিত। বৈদিক আর্যদের আগেও ভারতবর্ষে আর্যদের কোন কোন শাখা এসে থাকতে পারে। কিন্তু তা প্রমাণ করা কঠিন। তাদের পরে আর্যদের আরও অনেক শাখা তো এসেছে। কিন্তু বৈদিক আর্যরাই বোধকরি সর্বপ্রথম 'রিলিজিয়ন' অর্থে একটা সুস্পষ্ট বিশ্বাস নিয়ে এ দেশে আসে।" (ভারতবর্ষ ও ইসলাম)।

ভারতীয় বিপুল জনগোষ্ঠীর মাঝে কত জনস্রোত এসে একাকার হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মানব সমাজের উত্থান ও বিকাশের ধর্মই বুঝি এমন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভাগ্যান্বেষণের সুতীব্র অনুভব মানুষকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে তাড়িত করে। এভাবে অচেনার সাথে জানাশোনা হয়, নতুনের সাথে সন্ধি হয়। এভাবেই বিশ্ব মানব সমাজ ঐক্যের গ্রন্থি রচনা করে। ভারতীয় জনগোষ্ঠী নৃতাত্ত্বিক উৎস সন্ধানেও আমরা একই সত্যের পরিচয় পাই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নিষাদ, দ্রাবিড়, কিরাত প্রভৃতি জাতির অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, তাদের পরে এসেছে বৈদিক আর্যরা। গ্রীকরা এ দেশে এসেছে সৈনিকের বেশে, রাজ্য বিস্তারের নেশায়। আর রোমানরা এসেছিল বণিকের বেশে। এ ছাড়াও এসেছে গুর্জর প্রতিহার কুষাণ, হুণরা এসেছে। আরব ও তুর্কীরা এসেছে। আবিসিনিয়া থেকে হাবশী ও কাফ্রীরা এসেছে। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদীরা কেরলে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে। গোয়া ও সুন্দরবনের মতো সমুদ্র তীরে পর্তুগীজ এবং আরও পরে অন্যান্য ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী এসেছে। এতসব বিচিত্র জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটার কারণে ভারতের জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উদ্ধার করা খুবই জটিল এবং বহুলাংশে দুঃসাধ্য।

প্রাক–আর্য যুগে ভারতীয় সভ্যতা

বৈদিক আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বেও উন্নত সভ্যতার বিস্তৃতি ছিল, সে কথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। দুর্ভাগ্য, প্রাক–আর্য বৈদিক যুগে জন ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাই আমাদের জন্য এক ধরনের ট্রাজেডী। আর্য–পূর্ব যুগের ভারতীয় সভ্যতার যেটুকু পরিচয় থাকতো, তাও আর্যদের সযত্ন প্রচেষ্টায় বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। ফলে ঐ সভ্যতার কোন সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত ইতিহাসের সন্ধান আমরা জানতে পারছি না। যা–ও পাচ্ছি, তাও হীনতাগ্রস্ত এক বিভ্রান্তিকর ইতিহাসের শামিল। এর একটি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি আছে।

আর্যরা এ উপমহাদেশে এসে একটি উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাক্ষাত পায়। কিন্তু সে তথ্যটি মানব জাতির পরবর্তী বংশধরদের জন্য যাতে উন্মুক্ত না থাকে, সে জন্য আর্যদের পরিকল্পনার অন্ত ছিল না। এ কথা সত্য যে, দ্রুতগামী ও শক্তিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়তে অভ্যস্ত আর্য জনগোষ্ঠী অনার্যদের ওপর শক্তির দাপটে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তবে আদি অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিজিত জনগোষ্ঠীকে তারা দাসানুদাসে পরিণত করেছিল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি

এ প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও পরিচয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। এ উপমহাদেশে ইসলামকে প্রধানত হিন্দু ধর্মের প্রতিভূ বহিরাগত আর্য–ব্রাহ্মণদের মুকাবিলা করতে হচ্ছে। অন্তহীন এ সংঘাত। আজও চলছে এ সংঘাত। যেহেতু উপমহাদেশে ইসলামের প্রধান প্রতিপক্ষ সামাজিক–সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক শক্তি হচ্ছে পৌত্তলিক 'হিন্দু' ধর্ম, সে কারণে এ ধর্মের উৎপত্তি ও পরিচয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখা ভালো। একই সাথে অন্তহীন এ দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও পরিচয় আমাদের জানতে হবে। এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের উত্থান–ভূমি মক্কায়ও পৌত্তলিকতার সাথেই ইসলামের সংঘাত হয়েছে।

ভারতের ভৌগোলিক সংজ্ঞা ও নামের তাৎপর্য অন্বেষণ সূত্রে উল্লেখ্য, বর্তমান ভারতের সংবিধানের প্রথম ব্যাখ্যাটিই হচ্ছে, 'India that is Bharat, will be a union of States' অর্থাৎ যার পরিচয় ইণ্ডিয়া, তার নামই ভারত। অনুরূপ যার নাম ইরান তারই নাম পারস্য, যার নাম আবিসিনিয়া তারই নাম ইথিওপিয়া। তবে ভারতের সংবিধানের কোথাও ভারতকে 'ভারতবর্ষ' বলা হয়নি, ভারত-ই বলা হয়েছে। 'ভারতবর্ষ' বলতে পুরো উপমহাদেশকে বোঝায়, এমন কোন ভৌগোলিক প্রমাণও নেই। ১৯৪৭ সালের বিভক্তির পর এ ভূখণ্ড একটি ভারত এবং অপরটি পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অবশ্য তদানীন্তন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। তবে এখানেও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদই মূল ভিত্তি। তবে এখনও রাজনৈতিক অর্থে 'ভারতবর্ষের' কোন অস্তিত্ব নেই।

ভারতকে বোঝাবার জন্য কখনও সর্বসম্মতভাবে 'ভারতবর্ষ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। আগেও ভারতই বলা হতো। তবে ভারত কখনও অতীতে এক রাষ্ট্র ছিল না। আর্য-হিন্দুরা তাদের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ধর্মীয় আবেগের খোলসে 'ভারতবর্ষ' শব্দটি চালু করে। এটি অখণ্ড-বৃহৎ রাম রাজত্বের সমার্থক। নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সিংহল ও ভারতের মধ্যে বহু সাদৃশ্য থাকলেও তা আফগানিস্তানের মতো স্বতন্ত্র একক সত্তা নিয়ে টিকে আছে। তবে অনেকে মনে করেন, সিংহলের জনগোষ্ঠীর সাথে মাদ্রাজের দ্রাবিড় কিংবা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অধিকতর নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য রয়েছে। ভারতের তামিলনাড়ুর জনগোষ্ঠী ভারতীয় ইউনিয়নে বাস করেও তাদের প্রাচীন জাতিসত্তার অহংকার নিয়ে বাঁচতে চায়। সঙ্গত কারণেই তারা সুদূর দিল্লীর নিয়ন্ত্রণকে সাদরে গ্রহণ করতে পারছে না। ঠিক একইভাবে শ্রীলংকার জনগোষ্ঠীও প্রকৃতিগতভাবে ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বিরোধী; বাংলাদেশের জনগণের মানসিকতার সাথে যার সাদৃশ্য রয়েছে। শ্রীলংকার (সিংহল) তামিল জনগোষ্ঠীর বর্তমান স্বাধিকার আন্দোলন এবং মাদ্রাজের সাথে ঘনিষ্ঠতা তারই প্রমাণ।

ভারতকে 'হিন্দুস্তান' বলেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। মাত্র বিংশ শতাব্দীতেই ফারসী হিন্দুস্তান শব্দটি হিন্দী হিন্দুস্তান শব্দে রূপান্তরিত হয়। কেউ

কেউ আবার হিন্দুস্তান বলতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেশ বুঝে থাকেন। তবে পন্ডিত-গবেষকরা এ ব্যাপারে একমত যে, হিন্দুস্তান শব্দের সাথে হিন্দু ধর্মের কোন আবশ্যিক যোগসূত্র নেই। হিন্দুস্তান বলতে উত্তর ভারতকে বুঝাতো, যার অপর নাম আর্যাবর্ত। হিন্দুধর্ম কোন প্রাচীন ধর্মীয় পরিচয় নয়। হিন্দুধর্ম মূলত দেশভিত্তিক পরিচয়জ্ঞাপক। হিন্দুস্তানে (সিন্ধু তীরবর্তী) বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আচরিত ধর্মই কালক্রমে হিন্দুধর্ম রূপে পরিচিত হয়।

আর্য-জনগোষ্ঠী ভারতের প্রাচীনতম আদি জনগোষ্ঠী নয়, এটা আজ অসন্দিগ্ধভাবে সকল গবেষকই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। আর্যদের যে অংশটি ভারতে চলে আসে-তারা ছিল পৌত্তলিক, গ্রীক পুরাণে বর্ণিত ধর্মীয় চেতনায় সম্ভবত তারা উদ্বুদ্ধ ছিল। সবদিক বিবেচনা করে এ কথা বলা যায় যে, 'হিন্দুস্তান' শব্দটির কোন ধর্মীয় তাৎপর্য নেই। যা আছে, তা খাঁটি ভৌগোলিক তাৎপর্য।

গবেষকরা এ ব্যাপারে একমত যে, হিন্দুস্তান বা হিন্দ্ শব্দটির মূলে আছে সিন্ধু নদ। 'স'-এর উচ্চারণ প্রাচীন পারস্যবাসীদের জিহ্বায় 'হ' হয়ে যায়। যেমন 'প'- এর উচ্চারণ আরবদের জিহ্বায় হয় 'ফ এবং তার পারসী শব্দটি ফারসীতে রূপান্তরিত হয়। পারসীরা সর্বশক্তিমানকে বলতো অহুর মাজদা। অহুর মানে দৈহিক বলে বলীয়ান আর মাজদা মানে বুদ্ধির তেজে দীপ্তিমান। ভারতীয়দের জিহ্বায় অহুর-এর 'হ' হয়ে যায় 'স' এবং তার থেকে আসে 'অসূর' শব্দ। এভাবেই সিন্ধু নদের তীরবর্তী অধিবাসীরা অভিহিত হয় হিন্দু বলে। এখন সিন্ধু নদীর নামের উৎপত্তিও আর এক গবেষণার বিষয়। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, আজকের যুগে ভৌগোলিক অর্থে যারা হিন্দু, (সিন্ধুর তীরবর্তী এলাকার লোক), তারা রাজনৈতিক অর্থে পাকিস্তানী। সিন্ধুর উচ্চারণ যেমন পারসীদের জিহ্বায় হিন্দু হয়, তেমনই গ্রীকদের জিহ্বায় হয় ইন্দু এবং ইন্দু থেকেই ইণ্ডিয়া শব্দটির উৎপত্তি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ 'দি হিন্দু ভিউ অব লাইফ' বক্তৃতামালায় বলেছেন, 'The term 'Hindu' had originally a terri - torial and not a credal significance. It implied residence in a well-defined geograplical area'. অর্থাৎ সংকীর্ণ অর্থে হিন্দুস্তান অর্থ উত্তর ভারতকে বোঝালেও কালক্রমে বিজয়ী আর্যরা পুরো ভারতকেই হিন্দুস্তান রূপে

চিহ্নিত করতো। রাধাকৃষ্ণণের বিশ্লেষণ অনুসারে এই হিন্দুস্তানে প্রস্তরযুগীয় সভ্যতার মানুষ থেকে শুরু করে সুসংস্কৃত দ্রাবিড়, বৈদিক আর্য এবং আরও অনেক জনগোষ্ঠীর বাস। সম্ভবত 'হিন্দুস্তান'–এর পরে 'ভারত' শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। এটি রামায়ণে রচিত 'ভরত'–এরই নামানুসারে বিজয়ী আর্যদের দান।

'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' নামক বইয়ে সুরজিৎ দাসগুপ্ত লিখেছেন ঃ ''প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা– সংস্কৃতি অষ্টিক, দ্রাবিড়ীয়, আর্য প্রভৃতি ভাষা গোষ্ঠীগুলোর সমন্বিত উদ্যমের ফসল এবং এদের সমন্বিত ধর্ম–রূপটাই পরে হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত হয়, অর্থাৎ হিন্দুধর্মে একাধিক ভাষাগোষ্ঠীর ধর্ম চিন্তার মিশ্রণ ঘটেছে. . . . ।"

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'দি হিষ্টি এণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পীপল' –শীর্ষক গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ড 'দি স্ট্রাগল ফর এমপায়ার'–এ একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণিত আছে। 'রিলিজিয়ন এণ্ড ফিলজফি' শীর্ষক অধ্যায়ে সম্পাদক লিখেছেন ঃ

In any case the term Hidu comes into general use during this period and it would be convenient to refer, henceforth to the Indians, other than Muslims, and their religion as Hindu. As is well known, Hindu, a modified form of Sindhu, was originally a geographical term used by the western foreigners to denote first the region round the Sindhu river, and then the whole of India. The Indians, however, never called themselves by this name before the Muslim conquest. It was re-introduced after that event, with the added significance of a particular form of religious persuasion. Historically, therefore, 'Hindu' really signifies the aggregate of people in India and their culture and religion as distinguished from Muslims.''

হিন্দু বলতে তিনি এমন এক জনসমষ্টিকে বোঝাচ্ছেন, যারা এক বিশেষ ভূখণ্ডের অধিবাসী, যারা এক সংস্কৃতির অধিকারী এবং এক বিশেষ ধর্মের অনুসারী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের আগমন

মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার একমাত্র মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের আবির্ভাব বিশ্ব ইতিহাসের অতি প্রাচীন ঘটনা নয়। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মানব জাতির বহু ঐতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী, মরু আরবের মক্কায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অভ্যুদয়। এই মক্কায় মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর সাথে বিবি হাওয়ার মক্কায় হয়েছিল। সেই অপূর্ব মিলনের ঐতিহাসিক পবিত্র ঘটনাকে স্মরণ করে আজও মুসলমান হজ্জ্বযাত্রীরা সেখানে সমবেত হয়ে থাকেন। আবার বিশ্বমানবের পবিত্র কেবলাগাহ্ ও মিলনকেন্দ্র পবিত্র কা'বার নির্মাতা মুসলিম উম্মাহ্‌র পিতা নবী ইবরাহীম (আ)-এর পূণ্য স্মৃতিবিজড়িত মক্কা নগরী। মুসলিম মিল্লাতের প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ) মিলে পবিত্র কা'বার যে নির্মাণ কাজ করেছিলেন, তারও সাক্ষী মক্কা। 'মাকামে ইবরাহীম' কা'বা চত্বরে আজও সংরক্ষিত। যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আ) উচ্চতা অতিক্রম করে কাবা ঘরের নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছিলেন, সেই পাথর খণ্ড দ'ুটি আজও তাঁর পদভারের ক্ষয় চিহ্ন নিয়ে কাঁচের বেষ্টনীতে শোভিত। এই 'মাকামে ইবরাহীমে' দাঁড়িয়ে আজও হজ্জ্বযাত্রীরা সওয়াবের আশায় নামায পড়েন। কা'বার অদূরেই রয়েছে শিশু ইসমাঈলের পদাঘাতে সৃষ্ট সেই অন্তহীন রহমতের উৎস জমজমের পবিত্র ধারা। নির্বাসিতা ইসমাঈল জননী বিবি হাজেরা দিশেহারা হয়ে পানির সন্ধানে বের হয়েছেন। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে দেখেন, শিশুপুত্র ইসমাঈলের পায়ের নিচ দিয়ে অঝোর ধারায় পেয় পানি বয়ে যাচ্ছে।

এই মক্কা নগরীর অদূরেই রয়েছে মীনা প্রান্তর। এখানেই শিশু ইসমাঈলের কুরবানী আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে নিয়েছিলেন এবং বিনিময়ে নবী ইবরাহীম (আ)-কে পশু কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই মীনায়ই ইবলিস ইসমাঈলকে

বিভ্রান্ত করে আল্লাহ্‌র রাহে আত্মত্যাগে বিরত করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। সেই দৃঢ়চেতা বান্দা ইসমাঈলের স্মরণে মীনায় শয়তানের উদ্দেশ্যে হাজীরা পাথর নিক্ষেপ করেন। এই মীনা প্রান্তরেরই অদূরে রয়েছে আরাফাতের ময়দান। এখানে রয়েছে জবল–এ–রহমত। এ স্থানে দাঁড়িয়ে হযরত আদম (আ) মহান প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করেছিলেন এবং ঐ তওবা গৃহীত হয়েছিল। এখানেই হয়েছিল বিবি হাওয়ার সঙ্গে হযরত আদমের দুনিয়ায় প্রথম সাক্ষাত ।

এতসব স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র মক্কা নগরীতেই ইসলামের চূড়ান্ত অভ্যুদয় ঘটেছে। ইসলামের শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্‌, আর মায়ের নাম আমিনা।

নবী ইবরাহীম (আ) আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মহান আল্লাহ্‌র কাছে এই সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর জন্যই মুনাজাত করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁরই বংশে তাই শেষ নবী ইসলামের পরিপূর্ণ বার্তাবাহককে পাঠিয়েছেন। ইনিই নবীকুলের শিরোমণি খাতামুন নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা)। গোটা মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌ তাঁকে উত্তম আদর্শ করে পাঠিয়েছেন। তাঁর আদর্শ (সুন্নাত) পরিপূর্ণরূপে অনুসরণের মাধ্যমেই মানব জাতির মুক্তি নিহিত। হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবূয়তের সিলসিলা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এবং তাঁরই মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, আর কোন নবী আসবেন না এবং ইসলামকে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে মানুষের হিদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন। মহানবী (সা) তাঁর সুবিখ্যাত বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন ঃ মুসলমানদের জন্য তিনি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছেন। এক. পবিত্র কুরআন– আল্লাহ্‌র কালাম এবং দুই. সুন্নাহ–আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ও অনুমোদিত পথে তাঁর নবীর জীবনাদর্শ বা সমগ্র কর্মকাণ্ড। মুসলমানরা যতদিন পর্যন্ত এই দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং তাদের জীবনে প্রতিফলিত করবে, ততোদিন তারা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মর্যাদার আসনে সমাসীন থাকবে। যে দিন তারা ঐ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে, সেদিন তারা হবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত এবং মানব জাতির 'তাগূতী' অংশ তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। বর্তমান

বিশ্বে মুসলমানদের হতাশাগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত অবস্থা দেখে আমরা খুব সহজেই বলতে পারি যে, ইসলামের পবিত্র আদর্শ থেকে মুসলমানরা লক্ষ যোজন দূরে সরে গেছে বলেই তাদের এই বিপর্যয়।

ইসলাম কেন এসেছিল? ইসলামের সত্যিকার তাৎপর্যই বা কি? অথবা ইসলামের আগমনের প্রাক্কালে তদানীন্তন আরব ভূখণ্ড ও গোটা বিশ্বের অবস্থাই বা কি ছিল? এসব প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তব সত্য এই যে, ইসলাম হচ্ছে মানুষের ফিত্‌রাত বা প্রকৃতির ধর্ম। পবিত্র কুরআনে ইসলামকে 'আদ-দীন' বা একমাত্র ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের দুটি মৌলিক ভাষ্য বা ব্যাখ্যা রয়েছে। এর একটি হচ্ছে 'হাক্কুল্লাহ', যাতে বান্দার সাথে প্রভু আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নির্ধারিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এবং অপরটি হচ্ছে 'হাক্কুল ইবাদ', যার সীমা নির্ধারিত রয়েছে মানুষে মানুষে সম্পর্ক থেকে শুরু করে অন্যান্য জীব ও প্রাকৃতিক জগত ও পরিবেশ-প্রতিবেশির সাথে। প্রথমটি পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক চেতনায় সমর্পিত। দ্বিতীয়টি ইহজাগতিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক কল্যাণ সম্পর্কিত।

ইসলামের মূলকথা হচ্ছে তৌহিদ বা একত্ববাদ, যা সর্বশক্তিমান অব্যয় অক্ষয় আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপক, কালাতিক্রমী অবিনাশী সার্বভৌম শক্তিকে নির্দেশ করে। তৌহিদের মর্মবাণী হচ্ছে : এক আল্লাহ্‌র আত্মসমর্পণ, যা ইসলামের বিপ্লবী কালেমায় সহজভাবে উৎকীর্ণ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্-নাই কোন মাবুদ, প্রভু-শাসক, পালনকর্তা, আইনদাতা, রিযকদাতা, আল্লাহ্ ছাড়া এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র রসূল-বাণী বাহক, পথ প্রদর্শক,সর্বোত্তম আদর্শ।

হযরত আদম (আ) থেকেই এই তৌহিদের বাণী বুলন্দ হয়ে এসেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে; ইসলাম দুনিয়ায় মানব জাতির আগমনের সূচনা থেকেই বর্তমান ছিল। মানুষের প্রকৃত বাসস্থান

বেহেশ্‌ত, যেখানে তার অনন্তকালব্যাপী অবস্থান হবে। মূলত মানুষ বেহেশ্‌তেই অবস্থান করছিল।

ইসলামের দৃষ্টিতে ইহজাগতিকতাই চূড়ান্ত নয়। এটি পারলৌকিক সাফল্য লাভের একটি পরীক্ষাগার বা প্রস্তুতি ক্ষেত্র। ইসলামী জিন্দেগী 'আমর বিল মারুফ ওয়া নেহি আনিল মুনকার'–অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের উপর প্রসারিত। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সৎকাজের প্রতিযোগিতায় তাকওয়া ও পরহেযগারীর পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হবেন, তাঁরাই পরকালে পুরস্কৃত হবেন। আর যারা চির বিদ্রোহী ইবলিসের আনুগত্য করে বিকৃতির পথে জীবনকে পরিচালিত করবে, তাদের জন্য রয়েছে চরম শাস্তি। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে, সকল প্রকার পাপকাজ থেকে নিজেকে হিফাযত কর এবং অন্যকেও হিফাযত থাকার শিক্ষা দাও। সামাজিক অন্যায়, যুলুম, শোষণ, অবিচার, মানবীয় বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার। মহানবীর হাদীসের শিক্ষা, 'অন্যায়কে শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ কর, না পারলে মুখে প্রতিবাদ কর, তা–ও যদি না পার, মনে মনে অন্যায়কারীকে ঘৃণা কর। সেটা হবে দুর্বলতম ঈমানের পরিচয়।' ইসলাম যেমন ঈমানের উপর গুরুত্ব দেয়, তেমনি আমল বা আদর্শ রূপায়ণে মানুষের নিষ্ঠা ও সততারও পরীক্ষা নেয়।

দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষ যাতে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তারা যাতে অন্ধকারে পথ হাতড়ে না ফেরে, ইসলামের সওগাত আল্লাহ্‌ সে জন্যই দিয়েছেন। সেই সাথে মানব জাতির মধ্য থেকেই একজন রসূল মনোনীত করে তাঁর মাধ্যমে ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করে একটি শাশ্বত নিখুঁত মডেল উপস্থাপন করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আগমনের প্রাক্কালে সমসাময়িক আরব ভূমিসহ গোটা বিশ্ব চরম জাহিলিয়াতের আঁধারে ডুবে ছিল। তৌহিদের শিক্ষা বিলুপ্ত প্রায়। মানব জাতি আল্লাহ্‌র ইবাদতের বদলে তাদের নিজেদের হাতে গড়া দেব–দেবী ও মনগড়া ধর্মের উপাসনা করত। খোদ কা'বাঘরেই ৩৬০টি মাটি ও পাথরের

তৈরি মূর্তি ছিল। তৌহিদের নূর নিভে গিয়ে জাহিলিয়াতের আঁধার গোটা বিশ্বে ছিল পরিব্যাপ্ত। পবিত্র ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় মানুষ ছিল বিভ্রান্ত।

মূসা নবী (আ)-এর মাধ্যমে 'তৌরাত' কিতাব পাঠানো হয় বনী ইসরাইলের মাঝে। কিন্তু বনী ইসরাইলের লোকেরা নিজেদের 'ইয়াহুদ' হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রথম বর্ণবাদের উগ্রতার জন্ম দেয়। পরবর্তীকালে ঈসা (আ)-এর কাছে যখন 'ইনযীল' কিতাব অবতীর্ণ হয়, তখন তারা তাদের মনগড়া ধর্মের কিচ্ছা-কাহিনীতে মশগুল রইলো। এক পর্যায়ে ইহুদীরা নবী ঈসা (আ)-কেও হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ্ ঈসা মসীহ্ (আ)-কে অলৌকিকভাবে তুলে নিয়ে ইহুদীদের চিরস্থায়ী বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখেন। খৃস্টানরা আজও মনে করে যে, তাদের যীশুখৃস্টকে (ঈসা আ) ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। এই বিভ্রান্তির সূত্র ধরে খৃস্টানরা যিশুখৃস্টের ক্রশবিদ্ধ কল্পিত মূর্তি বানিয়ে প্রকারান্তরে পৌত্তলিকতার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা বাইবেলকেও (ইনযীল) পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলেছে। এমনকি তারা ঈসা মসীহ্ (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) বলে প্রচার করেছে। এখান থেকেই খৃস্টানরা আহলে কিতাব হয়েও কুফরীর মাঝে ডুবে আছে।

ইসলামে অতীতের সকল নবী ও পবিত্র আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনয়নকে সামগ্রিক ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছে। একই সাথে অন্যান্য আহলে কিতাবীদের প্রতি ইসলামে দাখিল হওয়া ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খতমে নবুয়তের প্রতি ঈমান ঘোষণার আহবান জানিয়েছে। কিন্তু অজ্ঞতা ও অহমিকাবশত এবং সর্বোপরি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তারা শুধু ইসলামের নবীকে অস্বীকারই করেনি, তাঁর ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তহীন ষড়যন্ত্র করেছে। এমনকি নবীকে স্বদেশভূমি থেকে বিতাড়িত করাসহ তাঁকে হত্যারও চক্রান্ত করা হয়। মহানবী (সা)-এর ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনের অধিকাংশ সময় প্রতিপক্ষ কাফির মুশরিক ও বৈরী শক্তির সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটাতে হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ঘোষণার মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সেতুবন্ধ রচনার পটভূমি

তৈরি করেছে। এটিকে বনী ইসরাঈল ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ঈসায়ীরা প্রতিহিংসা ও অজ্ঞতার কারণে অস্বীকার করে মানব জাতির মাঝে বিভক্তি ও বিদ্বেষের সঞ্চার করেছে। এই অযৌক্তিক ও পাশবিক উন্মত্ততার গর্ভেই খৃস্টীয় ইউরোপে ইসলামের বিরুদ্ধে শতাব্দী কালব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা। ক্রুসেডের কালব্যাধি আজও মানব জাতির দুটি বৃহত্তর ধারাকে বিভক্ত করে রেখেছে।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আগমনের প্রাক্কালে গোটা আরব সীমাহীন পাপ-পঙ্কিলতার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছিল। মানবতা ছিল ভূলুন্ঠিত, নারীত্ব ছিল যৌনতার সহচর। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। পণ্যসামগ্রীর মতো বাজারে-বন্দরে মানুষ কেনাবেচা হতো। দাস ব্যবসা ছিল সেকালের অন্যতম বৈধ লাভজনক ব্যবসা। সমাজে কোন নৈতিকতার মানদণ্ড ছিল না। শক্তিই ছিল ন্যায়দন্ডের নিয়ামক। রক্তপাত, হিংস্রতা, হানাহানি, লুন্ঠন ছিল স্বাভাবিক সামাজিক দৃশ্য। এই ধরনের একটি পাপদগ্ধ সমাজে পরিপূর্ণ ইসলামের আগমন।

সীমাহীন সামাজিক নৈরাজ্য ও স্থিতিহীনতার মাঝে ইসলাম এসে প্রথম ঘোষণা করলো তৌহিদের বিপ্লবী বাণী। মানুষ সৃষ্টির সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত-আশরাফুল মাখলুকাত। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাছে মানুষ মাথা নত করবে না, মানুষের আনুগত্য পাবার কেউ নেই আল্লাহ্ ছাড়া। মানুষ মানুষের ভাই। সকল মানুষ একই উৎস থেকে এসেছে। কেবলমাত্র তাকওয়া ও পরহেযগারীই মানুষকে শ্রেষ্ঠ কিংবা নিকৃষ্ট করতে পারে। এই শিক্ষা দিকে দিকে বিপ্লবের আদর্শ ছড়িয়ে দিল। এক নতুন চেতনার জন্ম দিল।

ইসলামের আগমনের সময় সমসাময়িক বিশ্বে দু'টি বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল। একটি ক্ষমতাগর্বী রোম সাম্রাজ্য এবং অপরটি সভ্যতাগর্বী পারস্য সাম্রাজ্য। বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও কম-বেশি রাজতন্ত্র ও গোত্রীয় শাসন চলতো। মক্কায় তখন ছিল কোরেশদের গোত্রীয় শাসন। মানুষকে শৃঙ্খলিত করে শোষণ করাই ছিল ঐ সময়কার শাসক মহলের লক্ষ্য। রাষ্ট্র শাসনে খিলাফতী আদর্শ বা কোন মহৎ মানবীয় মূল্যবোধ কিংবা নৈতিকতার অস্তিত্ব ছিল না। রাজারা জনগণের

নিরঙ্কুশ আনুগত্য আদায় করে নিত। সেই চরম দুর্গতির মাঝে বিপন্ন মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্ ইসলামকে মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ঘোষণা করে তাঁর রসূল (সা)–কে পাঠালেন।

মহানবী (সা) মাত্র ২৩ বছরে একটি নতুন জাতি, একটি অবিনাশী আদর্শ এবং একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতি যে একটি ঐক্যসূত্রে সন্নিবদ্ধ, আল্লাহ্‌র রসূল (সা) সেই সত্যই প্রতিষ্ঠা করলেন। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করার ঘটনা প্রথম ঘটে ইউরোপে। ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা করে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার সৃষ্টি করা হলো। প্রাচ্যের দার্শনিক কবি ইকবাল বলেছেন ঃ ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করলে বাকি থাকে শুধু 'চেঙ্গিজী'। ইসলামের মূলনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের এজেন্টরা 'মৌলবাদী চেতনার উন্মেষ' বলে একে প্রতিহত করার কথা বলছে। পুঁজিবাদী বিশ্বের উদরে ইসলাম বিরোধী একটি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাবের জন্ম হয়। যারা পাশ্চাত্যের মাথাগুনতি গণতন্ত্রের নামে, স্বৈরতন্ত্র অথবা রাজতন্ত্রের নামে জনগণকে শৃঙ্খলিত করে রাখতে চায়, তারাই নানা অজুহাত তুলে ইসলামের বিপ্লবী অভ্যুদয়কে প্রতিহত করতে চায়।

মহানবী (সা)–এর প্রচেষ্টায় অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আরবে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল নবীন ইসলামী রাষ্ট্র। মদীনা ছিল ঐ রাষ্ট্রের রাজধানী এবং মসজিদুন নববী ছিল ঐ রাষ্ট্র প্রধানের সচিবালয়। মহানবী (সা)–এর বিশেষত্ব এখানেই যে, তিনি শুধু একজন আধ্যাত্মবাদী ধর্মপ্রচারকই নন, তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, রাষ্ট্রনেতা, সমাজ নির্মাতা এবং একজন মহান সেনাপতি। ধর্মতাত্ত্বিক প্রচায়ে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ইসলাম জীবনের যে ব্যাখ্যা দেয়, সেখানে ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ–কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। কালেমা হচ্ছে মৌল বিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)–এর সাথে মু'মিনের পবিত্র চুক্তি কালেমার মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয় এবং যিনি

এই কালেমার শর্তকে স্বেচ্ছায় মেনে নিলেন, তাঁকে ইসলামী সমাজ নির্মাণের সর্বাত্মক জিহাদে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হয়। নামায হচ্ছে প্রভুর সমীপে বান্দাহ্'র আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশের আল্লাহ্ নির্দেশিত ফরয। নামাযের মাধ্যমে একজন বিশ্বাসী এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং ভবিষ্যত জীবনে তাঁরই রেযামন্দী অনুযায়ী জীবন পরিচালনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। একই সাথে পরকালীন জীবনে আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্তি তথা নাজাতলাভের মাধ্যমে বেহেশ্‌ত পাবার আর্তি প্রতিধ্বনিত হয় নামাযের আনুষ্ঠানিকতায়। আল্লাহ্ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, নর-নারী, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মকান্ডের মাধ্যমে যা সঞ্চয় করবে, তার জন্য সে নিজেই দায়ী হবে, অন্য কেউ নয়। অন্য কারও পুণ্য ধার নিয়ে কেউ উৎরে যেতে পারবে না। এ জন্যই নামাযের মাধ্যমে প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র দরবারে নাজাত চাইতে হয়।

এরপর আসে যাকাতের দায়িত্ব। যাকাত আদায়ের প্রতীকী পরিচয় যদিও আর্থিক মানদন্ডে নিরূপিত, তা সত্ত্বেও 'যাকাত' নিছক অর্থনৈতিক দায়িত্ব নয়। 'যাকাত' হচ্ছে একটি ধর্মীয় চেতনাসঞ্জাত অর্থনৈতিক দায়িত্ব। সকল অর্থ-সম্পদের মালিক যেহেতু আল্লাহ্, সে কারণে সচ্ছল ও বিত্তবানের অর্থ-সম্পদে অসচ্ছল ও বিত্তহীনের আল্লাহ্-নির্দেশিত হক বা অধিকার এই যাকাতের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা হয়েছে। যাকাতের মাধ্যমে মানুষের অর্থ-বিত্তের পবিত্রতা বিশুদ্ধতাও নিশ্চিত হয়। ইসলামের অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এই অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে ঃ সম্পদের মানবীয় মালিকানার অস্বীকৃতি। প্রচলিত অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তিগত, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। কিন্তু ইসলামের অর্থনীতির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, সম্পদের মালিকানা সার্বভৌম শক্তির মতোই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট। মানুষ সম্পদের সর্বোত্তম ও কল্যাণধর্মী ব্যবহার করবে। অপচয় কিংবা বিলাসিতায় সে সম্পদকে বিনষ্ট করবে না। অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সম্পদের ট্রাস্টি বা আমানতদার ও হিফাযতকারী। এ কারণেই যাকাত গরীবের

প্রতি কোন দয়া বা অনুগ্রহ নয়। এটি হচ্ছে স্বয়ং বিশ্ব প্রতিপালক রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে বান্দাহ্র প্রতি অপর বান্দাহ্দের দায়িত্ব। মহানবী (সা) মদীনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে সুদ নির্মূল করে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা হয়েছিল। ফলে ক্রমশ সেখানে নাগরিকদের আর্থিক সচ্ছলতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, যাকাত নেবারই লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ইসলাম অর্থ–সম্পদ উপার্জনের একটি নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে। হালাল–হারামের সীমানা মেনে পদচারণা করা ইসলামী সমাজের নাগরিকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। ইসলাম অবৈধ পথে সম্পদের পাহাড় গড়ার কোন সুযোগ কাউকে দেয় না। তেমনি অশ্লীল অনুৎপাদনশীল খাত বা অপচয় বিলাসিতায় অর্থ খরচের প্রতিযোগিতার সুযোগও কাউকে দেয় না। সমাজের নৈতিক সুস্থতা বিনষ্ট হতে পারে, এমন কোন কর্মকাণ্ডে মানুষকে স্বাধীনতা দেয় না ইসলাম। ইসলামের অর্থনীতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ নির্মাণ করে।

রোযা হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত ইবাদত। রোযার মাধ্যমে একদিকে যেমন আল্লাহ্র সাথে বান্দাহ্'র সম্পর্ক রচিত হয়, তেমনি আত্মসংযমের মাধ্যমে খাঁটি মানুষে পরিণত হওয়া যায়। একই সাথে কঠিন সিয়াম সাধনার মাধ্যমে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার বন্ধ করার মাধ্যমে ক্ষুধার্তের যন্ত্রণা অনুধাবনের মাধ্যমে মানব প্রেমের উজ্জীবন ঘটানো হয়। চারিত্রিক কলুষতা ও পঙ্কিলতা বিসর্জনের মাধ্যমে আপন আপন চরিত্রকে নিষ্কলুষ করার এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের উপর ব্যক্তিগত তাকওয়া নির্ভর করে।

ইসলামের সর্বশেষ ইবাদত হচ্ছে 'হজ্জ'। প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমানকে জীবনে অন্তত একবার মক্কায় হজ্জ করার নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কাবায় হাজির হয়ে আল্লাহ্র সম্মুখে আত্মসমর্পণ করার বিধানই হচ্ছে হজ্জ। এখানে সরাসরি আল্লাহ্র সাথে বান্দাহ্'র আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রচিত হয়। কিন্তু ইসলামে পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টির জন্য যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা দিয়েছে, তদনুযায়ী ব্যক্তি জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে যদি পুনর্গঠিত করা না যায়, তাহলে আল্লাহ্র হুকুমই মানা হলো না।

ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার রয়েছে। ইসলামের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন শুধু মসজিদে হয় না; এটা করতে হয় সমাজে। আর সে জন্যই নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হবার পরই সর্বস্তরে আল্লাহ্র হুকুম ও রাসূল (সা)–এর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হয়। তবে মসজিদই হবে ইসলামী সমাজের সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সে কারণেই ইসলামী সমাজকে অন্য অর্থে মসজিদভিত্তিক সমাজ বলা যায়।

ইসলাম তদানীন্তন আরবেই শুধু নয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমসাময়িক পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক এলাকা বিপ্লবের প্লাবনে ভাসিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও অতুলনীয় আল্লাহ্ ভীতির ফলে। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)–এর প্রতি পূর্ণমাত্রায় আনুগত্যশীল। তাঁদের জীবনকে আল্লাহ্র রাহে ও রাসূল (সা)–এর নির্দেশের কাছে তাঁরা সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। বিশ্বাস ও কর্মে, বক্তব্যে ও চরিত্রে, চিন্তা ও দায়িত্বে তাঁরা ছিলেন প্রকৃতই আল্লাহ্র সৈনিক। তাঁরা সবাই সৎ কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতেন এবং অন্যায়, অসৎ ও মিথ্যা থেকে নিজেরা দূরে থাকতেন। ইসলাম তাত্ত্বিকভাবে যা প্রচার করেছে, মুসলমানরা তাঁদের চরিত্রে তারই পরিপূর্ণ রূপ প্রতিফলিত করেছেন। ফলে আরবের গন্ডী অতিক্রম করে ইসলাম এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের সর্বত্র ব্যাপকভাবে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে ইসলামের খিলাফতী শাসন পরিত্যাগ করে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটল। কারবালায় মহানবী (সা)–এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা)–এর শাহাদতের মাধ্যমে ইসলামের খিলাফতী যুগের অবসান ঘটে। অবশ্য আবূ সুফিয়ান–পুত্র আমীর মুআবিয়ার হাতেই খিলাফতের প্রাথমিক পতন সূচিত হয়।

আমীর মুআবিয়া মহানবী (সা)–এর একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবা ছিলেন। তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন মহানবী (সা)–এর জানী দুশমন এবং কোরেশ কাফিরদের নেতা, নবীজীর প্রতিদ্বন্দ্বী তাগূতী শক্তির প্রতিভূ। মক্কা

বিজয়ের পরে অবশ্য আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন। কিন্তু রূঢ় হলেও সত্য যে, মহানবী (সা)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী তথা ইসলামের উত্থান পর্বের প্রবল প্রতিপক্ষ আবূ সুফিয়ানের পুত্রের হাতেই ইসলামের খিলাফতী শাসনের চরম বিপর্যয় ঘটে। উমাইয়াদের হাতেই পরবর্তীতে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

এরপর ইসলামের ইতিহাসের ট্রাজেডী শুরু হয়। ইসলাম বিশ্বব্যাপী যে বিপ্লবী শক্তিমত্তা নিয়ে আবির্ভূত হতে যাচ্ছিল, সেটিকে রাজতন্ত্রের উদ্ভাবকরা বিপথগামী ও নিষ্ক্রিয় করে । ফলে খিলাফতপন্থী হযরত সালমান ফারসীরাসহ অনেকেই কোণঠাঁসা হয়ে পড়েন। রাজতন্ত্রবাদীদের নতুন উত্থান ঘটে উমাইয়াদের ষড়যন্ত্রের প্রাসাদে। আজও মুসলমানরা সেই অবক্ষয়ের ধ্বস নিয়ে পড়ে আছে। বর্তমান নব্য সাম্রাজ্যবাদের দোসর রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রই অধিকাংশ মুসলিম দেশের ভাগ্যলিপি।

কোন কোন মুসলিম দেশে পাশ্চাত্য ধাঁচের নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র থাকলেও বৃহত্তর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-চেতনা রাষ্ট্র শাসনের নীতিমালায় সংযোজিত নয়। এ গণতন্ত্রের মৌলিক ত্রুটি হলো, এতে দৃশ্যত মানুষের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করা হয়। কিন্তু কার্যত জনগণের মত প্রকাশের মাধ্যম ভোটাধিকারই বহলাংশে অস্বীকৃত। সামরিক স্বৈরতন্ত্র কিংবা দলীয় একনায়কতন্ত্র বহাল রাখার স্বার্থে যতটুকু সীমিত গণতন্ত্র দেয়া দরকার, ততটুকুই দেওয়া হয়। ফলে এসব দেশে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা প্রহসনের নামান্তর। প্রথমত জনগণ অবাধে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেও নির্বাচনের ফল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত মতের ভিত্তিতে হয় না। অন্যদিকে কতিপয় মুসলিম দেশে এখনও মধ্যযুগীয় এজিদী ধারার রাজতন্ত্র চলছে। ইসলামের খিলাফতী শাসনের কবর রচনা করে আমীর মুআবিয়ার হাতে যে রাজতন্ত্রের ধারার সূচনা হয়েছিল, তা'ই তাঁর পুত্র এজিদের নেতৃত্বে কারবালার নৃশংস ও বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি স্থায়ী ধারায় পর্যবসিত হয়। আজও ঐ রাজতান্ত্রিক ধারাটি বিভিন্ন খোলসে অব্যাহত রয়েছে।

ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালায় মানুষের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন স্বীকৃতি নেই। ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত। আসমান, যমীন ও তার মধ্যবর্তী সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আইন-বিধানও হবে আল্লাহ্‌র আইনের ধারার অনুকৃতি, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন মুসলিম দেশগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতেই আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অস্বীকৃত। পাশ্চাত্যের তাগূতী শক্তির অনুসরণে সংবিধানে জনগণের সার্বভৌম অধিকার সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, যা ইসলামী দৃষ্টিতে স্পষ্ট কুফরী। অবশ্য জনগণের নামে এ সার্বভৌম অধিকার শাসকরাই স্বেচ্ছাচারিতার সাথে ব্যবহার করে থাকেন। জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ভোট প্রয়োগের প্রহসনের মধ্যেই সীমিত থাকে।

কালেমার বিপ্লবী ঘোষণা ঃ মানুষ তার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ভূমিকার কোথাও আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারও আনুগত্য করবে না, আর কোন শাসকের কাছে মাথা নত করবে না। তবে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের যিনি বৈধ খলীফা বা শাসক হবেন, তাঁর আনুগত্য করা নাগরিকের বৈধ দায়িত্ব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি শরীয়তের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আনুগত্য পাবার হক আছে। তবে হাদীসে আছে ঃ 'যালিম শাসকের কাছে হক কথা বলা উত্তম জিহাদ।' ইসলামে জবরদস্তি ক্ষমতা দখল কিংবা অবৈধ প্রক্রিয়ায় জনগণের মতামত উপেক্ষা করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। এমন কি ক্ষমতা গ্রহণে উগ্র আগ্রহ পোষণ ইসলাম স্বীকৃত পন্থা নয়। ইসলাম ক্ষমতা শব্দটির বদলে দায়িত্ব (Responsiblity) শব্দটি ব্যবহারে অধিকতর স্বচ্ছন্দ বোধ করে আর শাসন (Rule) শব্দটির বদলে 'সেবা' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

বাংলার মুসলমান ঃ উদ্ভব ও বিস্তৃতি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। এই সূত্রে প্রশ্ন আসে, বাংলা অঞ্চলে ইসলামের বয়স কত? বাংলাদেশে ইসলামের প্রাচীনত্ব কি আরব দেশের সমসাময়িক? এই সাথে আরও একটি প্রশ্ন আসে, আরবদের সাথে বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় কি ইসলাম পরবর্তীকালের ঘটনা? নাকি, এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম-পূর্বকালের কোন ঐতিহাসিক যোগসূত্র কার্যকর রয়েছে?

এসব প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য জবাব উপস্থাপন করার আগে আমরা অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। আমরা খুব সহজেই একথা বলে থাকি যে, ইসলামের বয়স দেড় হাজার বছর। অথচ পৃথিবীতে মানুষের আগমনের দিন থেকেই তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রচারের তাকিদ ছিল। হযরত আদম (আ) যেমন মানব জাতির উৎস-পিতা, তেমনি প্রথম নবীও। তাঁর কাছে সরাসরি ঐশী নির্দেশনা এসেছিল। মানুষ তার স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়ায় আসার আগেই আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ্‌ই তার মাবুদ, স্রষ্টা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও আইনদাতা। আল্লাহ্ যখন সকল রূহ্‌কে সম্বোধন করে জানতে চেয়েছিলেন, 'আমি কি তোমার প্রভু নই' ; তখন সবাই সমস্বরে 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দিয়েছিল। আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও রবুবিয়াতের কাছে সমর্পিত মানবাত্মা দুনিয়ায় এসেও ইবলিসী প্ররোচনায় পড়ে ভুলের পূর্বানুবৃত্তি করতে থাকে। মানব জাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে তাই ধারাবাহিকভাবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দু' লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন, এমন কোন মানবগোষ্ঠী নেই, যাদের কাছে ঐশী বাণীবাহক আসেনি। কেননা, মানুষ তো জন্মগতভাবেই সত্যধর্মে জন্মগ্রহণ করে। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে পারিপার্শ্বিকতা, পারিবারিক সংস্কৃতি,আচার-ঐতিহ্য ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি তাকে প্রভাবিত করে। তবে আল্লাহ্ মানুষের অন্তর্গত বিবেককে মুক্ত ও স্বাধীন করে তৈরি করেছেন। দিয়েছেন

মানুষকে তার ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। আর সে কারণে সত্য-মিথ্যা যাচাই করে তা গ্রহণ ও বর্জনের রয়েছে মানুষের একক কর্তৃত্ব। এ কারণেই মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। আমার আলোচনার প্রতিপাদ্য হচ্ছে, মানুষ সৃষ্টির মতো তৌহিদের ধারণাও আদি ও অকৃত্রিম। বরং বলা যায়, তৌহিদী চেতনা মানব জাতির আদি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। বাংলাদেশে ইসলামের সময়কাল দেড় হাজার হোক কিংবা তার চেয়ে কম হোক, এ মুহূর্তে আমরা সে বিতর্কে না গিয়ে বলতে চাই যে, বাংলা অঞ্চলে যখন থেকে মানব বসতি গড়ে উঠেছে, তখন থেকেই এ অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের মাঝে তৌহিদবাদী চেতনার অস্তিত্ব বা পরিচয় ছিল। বাংলার এই অঞ্চলে বা ভারতের বিশাল বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মাঝে হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি, এমন কথা বলার প্রমাণ যখন আমাদের হাতে নেই, তখন সম্ভাব্য ঐ তথ্যকে অস্বীকার করি কিভাবে ? তৌহিদের সুপ্ত ধারণা ইসলামের পরশমণির স্পর্শে আরো দীপ্ত, শাণিত ও পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র। ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত আদম (আ)-এর মর্ত্যে আগমনের স্থান হিসেবে আজকের শ্রীলংকা বা সরণ দ্বীপকে নির্ণয় করা হয়। কিন্তু তার পরের জ্ঞাত ইতিহাসে যেসব নবী পয়গম্বরের সন্ধান আমরা পাই, তাঁদের অধিকাংশেরই আবির্ভাব ঘটেছে মধ্যপ্রাচ্যে, আরব মুলুকে, দজলা-ফোরাত-নীলনদ তীরবর্তী জনপদে। বর্তমানে এশীয় মানচিত্র বা পৃথিবীর মানচিত্র আমরা যেমনটা দেখছি, অতীতের দুর্নিরীক্ষ্য সময়কালে এই মানচিত্র অবিকল এমনটা ছিল, তা বোধ হয় জোর দিয়ে বলা যাবে না। অর্থাৎ ঐসব প্রধান প্রধান নবী-পয়গম্বরের আগমনের সময় বাংলা-ভারতের এই জনপদটি সন্নিহিত থাকলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। যদি এমনটাই সত্যের কাছাকাছি হয়, তাহলে নবূয়তী ফরমান ও পয়গম্বরী শিক্ষার সাথে আদিকাল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষের ধারণা না থাকার তো কারণ দেখছি না।

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আবির্ভাব ঘটলেও ইসলামের প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে দুনিয়ার প্রচলিত ও পরিচিত সকল ধর্মগ্রন্থেই উদ্ধৃতি ছিল। সুতরাং ইসলাম এ অঞ্চলে বহিরাগত হলেও অবাঞ্ছিত

নয়; ইসলামের জন্য আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি যে কারো ছিল না, এ কথাও বলা চলে না। ধর্মগ্রন্থ সূত্রের এ শিক্ষা ছাড়াও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, আরবদের সাথে এ অঞ্চলের মানুষের ব্যবসায়িক সম্পর্ক, তাবের লেনদেন, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কও অতি প্রাচীন। বরং বলা যায়, আরব উপদ্বীপের জনবসতির মতোই এ ইতিহাস অনেকটা প্রাচীন। সে কারণেই বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের সময়কালকে অনেকেই মহানবী (সা)–এর আগমনের সমসাময়িক কাল হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। এবং এর পক্ষে কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ ও যুক্তিও উল্লেখ করা যায়। প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ হাসান জামান বলেছেন যে, মহানবী (সা)–এর সময়ই কমপক্ষে দুজন সাহাবা বাংলাদেশের এই জনপদে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। ইসলাম–পূর্বকাল থেকেই আরব–বাংলা নৌ–পথে যোগাযোগ থাকা যদি ইতিহাস সমর্থিত সত্য হয়, তাহলে ইসলামের সূচনায়ই বাংলা মুলুকে পরিকল্পিত ইসলাম প্রচারে সাহাবাদের আগমনকে অস্বাভাবিক ঘটনা মনে করার কোন কারণ নেই। ইতিহাস এ কথার পক্ষে রায় দেবে যে, ভারতে আর্য আগমনের অনেক আগে থেকেই আরবদের সাথে বাংলাদেশের জনগণের বহুমুখী সংযোগ ছিল। বাংলা অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের যোগাযোগ মুহাম্মদ বিন কাসিমের ঐতিহাসিক সিন্ধু বিজয়ের বহু আগে থেকেই সংস্থাপিত হয়েছিল।

মানব জাতির যোগাযোগ সূত্র হিসেবে নিশ্চিতভাবেই নৌ–পথকে নির্দিষ্ট করা যায়। নৌ–পথে যোগাযোগ বিস্তৃত হবার পরই স্থলপথে মানবজাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে থাকবে। ফলে খুব সঙ্গতভাবেই ভারতে আর্য–অনার্য, শক–হুণদের স্থলপথে আগমনের বহু আগে থেকেই বাংলা অঞ্চলের সাথে আরবদের নৌ–পথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

সমাজ বিজ্ঞানী গবেষক ডঃ হাসান জামানের মতে, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)–এর আমলে হযরত মামুন, হযরত মুহায়মেন, হযরত আবূ তালিব প্রমুখ সাহাবী এ দেশে ধর্ম প্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্যে আগমন করেন। এ

ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাস এ কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, আর্যদের ভারতে আগমনের আগেই বাংলা জনপদে অত্যন্ত সুসভ্য জনগোষ্ঠীর আবাস ছিল। সমুদ্র-নদীবেষ্টিত বৈরী প্রকৃতির এসব জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজন ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই অত্যন্ত সাহসী ও সমুদ্রবিহারী নাবিক-বণিক হতে হয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর ছিল আরব বণিকদের যোগসূত্রের মাধ্যম। অন্য কথায় চট্টগ্রামই ছিল এ অঞ্চলের বহির্যোগাযোগের সূত্র। গোটা ভারতে যখন আর্য ক্ষাত্রশক্তির আসূরিক দাপট, তখনও এ অঞ্চলের অনার্য সেমেটিক জনগোষ্ঠী অনার্য স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। আর্যদের পৌত্তলিক আচারের প্রতি শুধু অনীহাই নয়, এ অঞ্চলের জনগণ ঐ বিকৃত ধর্মাচার থেকে নিজেদেরকে সবসময়ই নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখেছে। আজও ভারতের সমুদ্র সংলগ্ন এলাকার জনগোষ্ঠী দক্ষিণ ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে বেঁচে আছেন। তামিলনাডু কিংবা আসামের জনগোষ্ঠী আজও বিদ্রোহী। দীর্ঘদিনেও তাদের অনার্য স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করা সম্ভব হয়নি। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, আর্যদের আনীত হিন্দু ধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র ও জাতিভেদের অভিশাপ ব্যাপকভাবে প্রবেশ করলে তার মুকাবিলায় উপমহাদেশে যে বৌদ্ধ-বিপ্লব সংঘটিত হয়, তাতে বাংলা প্রচণ্ডভাবে সাড়া দেয়। বৌদ্ধ-পীড়ক ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজা শশাংক সপ্তম শতাব্দীতে বাংলা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনে সক্ষম হন। এ সময় হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীদের হাতে ইতিহাসের জঘণ্যতম গণহত্যার মাধ্যমে উপমহাদেশের সর্বত্র বৌদ্ধ নিধর্ন ও উৎখাত যজ্ঞ শুরু হয় এবং বৌদ্ধ গোষ্ঠীর বিরাট অংশ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে পড়ে ইহলীলা সাঙ্গ করতে বাধ্য হয়। প্রাণে যারা বাঁচলো, তারা পালিয়ে গেল তিব্বত, চীন, শ্রীলংকা, বার্মা প্রভৃতি অঞ্চলে অথবা দেশে প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে পৈত্রিক প্রাণ রক্ষা করলো। (ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ঃ আবদুল গফুর, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা ঃ এপ্রিল-জুন ঃ ১৯৮৪)

বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত প্রতিরক্ষা শক্তির অনুপস্থিতি স্বীয় ধর্মের অনুসারীরা আর্যদের আসূরিক নির্যাতনকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিল না। ফলে বিপুল

সংখ্যক মানুষ নতুনভাবে একটি শক্তিশালী ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ছত্রছায়ার প্রয়োজন অনুভব করলো। আরবদের সাথে বাংলা-ভারত অঞ্চলের জনগণের প্রাচীন সংশ্রব থাকায় তাদের জন্য ইসলামের সাক্ষাত পাওয়া খুব সহজতর হয়। ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা প্রতিকূলতার মধ্যেও কখনও মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়নি। বৃটিশ-হিন্দু নির্যাতনের মুখেও মুসলমানদের স্বধর্মচ্যুত করা যায়নি। এম. এন. রায় 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' শীর্ষক সমীক্ষায় লিখেছেনঃ ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি বৌদ্ধ বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করলো, তাতেই প্রচলিত ধর্ম বিরোধী অগণিত মানুষ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে নীড়হীন নির্যাতিতের মতো দিশেহারা হয়ে ফিরেছে, তারাই ইসলামের মতবাদকে জানিয়েছে সাদর সম্ভাষণ।

আজকের ঐতিহাসিক বাস্তবতা এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, সমুদ্র-নদী সন্নিহিত বিশ্বের বিভিন্ন জনপদ আজ মুসলিম প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের ক্ষেত্রে এ সত্য সমভাবে সত্য। এশিয়ার দিকেই চোখ ফেরানো যাক। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালয়, ব্রুনাই, মালদ্বীপ কিংবা বাংলাদেশ সবখানেই মুসলমানদের আযান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। এ থেকে আমরা পাঠককে এ সত্যের দিকেই দৃষ্টি ফেরাতে চাই যে, যেসব অঞ্চলের সাথে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আরবদের নৌ-পথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, ঐ সব এলাকাই খুব সহজে ও দ্রুত ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। তবে বাংলার ব্যাপারে আরও একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে। আর সেটি হচ্ছে, পাঠান-তুর্কীদের একটি বিরাট অংশ এসে দিল্লী থেকে দূরতম এই সমুদ্র তীরের ভূখণ্ডে আস্তানা গেড়েছে। আর তাতে ইসলামের প্রাণশক্তি আরো বেগবান হয়েছে। তবে কট্টর পৌত্তলিকতাবাদী গ্রীক-আর্য সংস্কৃতির ধারকরা ইসলামকে প্রত্যক্ষভাবে এড়িয়ে গেলেও তারা বহুলভাবে ইসলামের প্রভাবকে আত্মস্থ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইসলাম প্রসারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সত্য প্রচারের অন্তর্গত তাকিদ থেকেই প্রথম যুগের মুসলমানরা দেশ-দেশান্তরে ধর্ম প্রচারে ছড়িয়ে পড়েন। আরব বণিকরাই যে এ ব্যাপারে কার্যকর দূতের ভূমিকা পালন করেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

...এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বৈদিক আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। শুধু, হরপ্পা ও মহেনজোদারোতে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই প্রস্তর যুগীয় সভ্যতার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। অলচীন দম্পতি 'দি বার্থ অব ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন' বইটিতে যেসব স্থানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে বৈজ্ঞানিক রেডিও কার্বন পদ্ধতিতে সেগুলোর কালপরম্পরা নির্দেশ করে স্টুয়ার্ট পিগটের আরব্ধ কাজকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ক্রমশ উন্নতরূপ অর্থাৎ তাম্র সভ্যতার রূপ লাভ করতে থাকে সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর রাজপুতানা বা রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে।

"...অলচীন দম্পতির গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাক–হরপ্পা যুগের জনপদগুলো বিদেশীদের আক্রমণের আশংকাতে প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করা হতো, এর সব চাইতে স্পষ্ট প্রমাণ হলো কোটডিজি–র ধ্বংসাবশেষ। যাদের পরবর্তীকালে অনার্য নামে অভিহিত করা হয় তাদের উপর আক্রমণ ও আগ্রাসন আর্যদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়।" (ভারতবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাশ গুপ্ত ঃ পৃ. ৭)।

প্রকৃতপক্ষে ভারতে আর্য আগমনের আগেই সমৃদ্ধ সভ্যতা ছিল, যার সাথে আগে থেকে আত্মম্ভরী আর্যদের কোন পূর্ব পরিচয়ই ছিল না। আর্যরা বিজয়ী হয়ে বিজিত জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও উন্নত সভ্যতাকে অস্বীকার করতে থাকে এবং অনার্য জনগোষ্ঠীকে নানা অপমানসূচক শব্দে চিত্রিত করতে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই নিষাদ, দ্রাবিড়, কিরাত প্রভৃতি জাতির অস্তিত্ব ছিল। এদের পরে এসেছে বৈদিক আর্যরা এবং ঐতিহাসিক যুগে 'যবন' গ্রীকরা এসেছে সৈনিকের বেশে, রোমানরা এসেছে বণিকের বেশে, হূণরা এসেছে, আরব ও তুর্কীরা এসেছে। আবিসিনিয়া ও ইথিওপিয়া থেকে হাবশী ও কাফ্রীরা এসেছে, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদীরা এসে কেরালায় স্থায়ী নিবাস গড়েছে। এ ব্যাপারে পণ্ডিতরা একমত যে, বৈদিক আর্যদের ভারতবর্ষে

আগমনের অনেক আগে থেকেই অনার্যদের একটা নিজস্ব ধর্ম ও কৃষ্টি ছিল। এখানে প্রশ্ন আসে; কি সেই ধর্ম-সংস্কৃতির রূপ? এ ব্যাপারে পূর্ণ তথ্য আমাদের করায়ত্ত না হলেও এটা নিশ্চিত যে, ঐ ধর্ম সংস্কৃতি বৈদিক আর্যদের পৌত্তলিক পূজা-পার্বণ নয়। যুগ বিবর্তনে, বিস্মৃতি ও বিচ্যুতির কারণে মানুষ প্রায়শই শবাশত ধর্মের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। আর সে কারণেই মানুষকে সুপথে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ্ তা'য়লা যুগে যুগে নবী-পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় এ সত্য প্রতিফলিত। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা, ধর্ম-সংস্কৃতির পূর্ণ চিত্র পাওয়া না গেলেও এ ধারণা অমূলক নয় যে, ঐ সময় বিকৃত ও রূপান্তরিত হলেও একত্ববাদের ধারণা পরিব্যাপ্ত ছিল। আর এ কারণেই যখন পরিপূর্ণ তৌহিদের উদাত্ত আহ্বান ভারতে এলো, তখন দলে দলে জনগোষ্ঠী পঙ্গপালের মতো তাদের হারানো ধর্মের মূল স্রোতে ফিরে আসতে থাকে। সম্ভবত এ ব্যাপারে তেমন গবেষণা আজও হয়নি।

দ্রাবিড়রা সাধারণত প্রাচীর বেষ্টিত জনপদে বাস করত। তারা চরিত্রগতভাবে ছিল শান্তিবাদী, স্বাতন্ত্র্যকামী, তবে সংগ্রামী। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তারা দীর্ঘ সংগ্রামে অভ্যস্ত ছিল। 'পুর' বা নগর শব্দটি দ্রাবিড়দের উদ্ভাবিত। দ্রাবিড়দের এই 'পুর' ধ্বংসকারী আর্যদের কথিত দেবতা ইন্দ্রের আর এক নাম হয়েছে পুরন্দর বা পুর ধ্বংসকারী।

"প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর সংগে ঋগ্বেদের বর্ণনা ও প্রার্থনা মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, প্রাচীনতর ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধ্বংস করার দিকে এবং পুরের অধিবাসীদের হত্যা করার দিকে বৈদিক আর্যদের প্রবল প্রবণতা ছিল-এসব কাজে তারা উল্লাস ও গৌরববোধ করত। আবার ঐতিরীয় ব্রাহ্মণে বৈদিক দেবতা অগ্নিকে বলা হয়েছে যে, ইতস্তত ধ্বংসস্তূপগুলোতে একদা যারা বাস করত তারা অগ্নির দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অন্যান্য স্থানে চলে গেছে। যারা এভাবে বৈদিক আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তাদের নাগরিক বাসস্থানগুলো ত্যাগ করে চলে যায়, তারা ভারতবর্ষের গভীরতর অঞ্চলগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা

করতে থাকে, কিন্তু আর পুর গড়ে তোলেনি সম্ভবত এই কারণে যে, তাতে ধ্বংসকারী বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। অর্থাৎ সিন্ধু নদের উপত্যকা থেকে তাদেরকে উৎখাত করতে সমর্থ হলেও বিশাল ভারতবর্ষ থেকে তাদেরকে নির্মূল করতে বৈদিক আর্যরা সফল হয়নি। অধিকৃত জনপদে যারা থেকে যায়, তারা বিজয়ীদের সেবাতে নিযুক্ত হয় এবং এইভাবে দাস শব্দটার আর্থান্তর ঘটে, সেবার জন্য নিযুক্ত ভৃত্যের অর্থে দাস শব্দটার ব্যবহার হতে থাকে। (ভারতবর্ষ ও ইসলাম ঃ সুরজিৎ দাসগুপ্ত; পৃ. ৯১)

আর্যদের জন্য পুর–আশ্রিত সভ্যতা ধ্বংস করা যত সহজসাধ্য ছিল, ঐ জনগোষ্ঠীর ধর্ম আশ্রিত সংস্কৃতি ধ্বংস করা ততো সহজ ছিল না। সংস্কৃতি অন্তঃসলিলা ধারায় উৎসারিত এবং অপ্রতিরোধ্য গতিতে বহমান। লোক থেকে লোকান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে লোকদৃষ্টির বাইরে তার বিচিত্রগামী বিকাশ ঘটে। আর্যরা যখন দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা গ্রহণ–বর্জনের মিশ্র ধারার কূট–কৌশলের পথ ধরে এগুতে থাকে। এভাবে তারা প্রাচীন জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে আর্য ধারার অনুরক্ত করে নিয়ে নিজেদের দলভুক্ত করে নেয়। এদের সহায়তায়ই বৈদিক আর্যরা গঙ্গার তীর ধরে ভারতবর্ষের গভীরে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। বাংলাদেশের যেসব এলাকায় লোকালয় গড়ে উঠেছে, শুরুতে তার সবগুলোই সম্ভবত দুর্ভেদ্য বিপদসঙ্কুল বন–বাদাড় ছিল। অন্য দিকে, নদী মেখলা সাগর সোহাগী দক্ষিণের বঙ্গজনপদ ছিল বহুল পরিমাণে বিরান জনপদ। এসব অঞ্চলে আর্য–তাড়িত দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী দলে দলে এসে বসতি গড়ে তুলে। এবং তাদের হাতেই বঙ্গ জনপদ আবাদ হয়। তবে আর্যদের আগ্রাসী থাবা থেকে আত্মরক্ষার উদগ্র বাসনায় যারা নদী–সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে জীবনের ভেলা ভাসিয়ে নতুনতর ঠিকানার সন্ধানে নেমে পড়ে, তাদের আগেও সম্ভবত বঙ্গ জনপদে লোকবসতি ছিল। আর ঐ সকল জনগোষ্ঠী দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীরই পূর্বপুরুষ হওয়া বিচিত্র নয়। দক্ষিণের রাজ্যের রাজধানী 'বাকলা' নগর একটি সুরক্ষিত দুর্গে শোভিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদদের মতে, ঐ দুর্গটি ছিল লতা–গুল্ম–বন–জংগলে ঘেরা। শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার জন্যই এই কৌশল।

মহান আল্লাহ্ মানুষের বসবাসের জন্য যমীনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। একই সাথে প্রয়োজনে ঈমান রক্ষায় হিজরতের তাকিদও রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। মানবিক বিশ্বাস ও মর্যাদা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষা বিস্তৃত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে যারা দুঃসাহসে ভর করে আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশায় নতুন বসতির সন্ধানে জীবন-মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তেও কুণ্ঠিত ছিল না, ঐ সব জনগোষ্ঠী নিশ্চিতভাবেই মানবিক মূল্যবোধে উচ্চকিত সমকালের শ্রেষ্ঠ আদম সন্তান। সুতরাং বহিরাগত আর্যদের বিশ্বাস-ধর্মাচার আধিপত্যকে পদাঘাত করে যে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী সমুদ্রঘেরা বিরান জনপদ অথবা হিংস্র পশুর পদচারণায় প্রকম্পিত জঙ্গলাকীর্ণ ভূখন্ডে নতুন বসতি গড়েছে, মানব জাতির প্রকৃত উত্তরসূরীর ভূমিকাই তারা পালন করেছে। আর্যদের দ্বারা ভারত ভূমি পদানত হবার পাঁচ শ' বছর পর্যন্ত এ অঞ্চলে তাদের বিষাক্ত থাবা বিস্তৃত হতে পারেনি।

এ পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের উপর তেমন কোন নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। যা-ও হয়েছে, তা তথ্যপূর্ণ নয়। এ কথা সত্য যে, বাংলার এ জনপদের অধিবাসীদেরকে শুরু থেকেই এক প্রতিকূল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা মুকাবিলা করতে হয়েছে। আর্য আগ্রাসনের আগেও তাদের প্রকৃতির কঠিন বিরূপতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। বাংলার এ বিস্তৃত সমভূমি সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, টর্নেডোর কবলে বারবার মার খেয়েছে। আজও তার নিষ্কৃতি ঘটেনি। একদিকে খরস্রোতা তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদী-সমুদ্রের দুর্বিনীত আক্রোশে প্রতিনিয়ত চলছে ভাঙ্গাগড়ার খেলা। অন্যদিকে অতি প্রাচীনকাল থেকেই আর্য আগ্রাসনের কারণে তাদের শংকিত থাকতে হয়েছে। একদিকে প্রকৃতির বৈরিতা এবং অন্যদিকে ক্রুদ্ধ পরাক্রমশালী এক বিজাতীয় বহিরাগত শক্তির শ্যেন দৃষ্টি মুকাবিলা করেই এ বাংলার জনগোষ্ঠীকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। যে জাতিকে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গাগড়ার বিপাকে পড়ে জীবন যুদ্ধে লড়তে হয়েছে, তাদের পক্ষে ইতিহাসকে সুরক্ষিত দুর্গে সংরক্ষিত করা সম্ভব নয়। ফলে ঐতিহাসিক কীর্তিরাজি কালের গর্ভে বিলীন। বিশেষ করে বরিশাল এলাকার প্রাচীন কীর্তি

নদীর উত্তাল তরঙ্গকে ভ্রূকুটি হেনে টিকে থাকতে পারেনি। এ কারণেই নদী-সমুদ্র বেষ্টিত বরিশাল এলাকায় জনবসতির প্রাচীনত্ব অনুমান করা দুঃসাধ্য।

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের উপর যাঁরা আলোকপাত করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, সুখময় মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় মৈত্রেয়, নিখিল নাথ রায় প্রমুখ আলোচিত। এঁরা বাংলার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। প্রচুর পরিশ্রম করে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। একালে অবশ্য ডঃ এম. এ. রহিম বাংলার ইতিহাস এবং বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গবেষণা ধারায় এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এ ছাড়া ডঃ মোহাম্মদ মোহর আলীর 'হিষ্টরী অব দি মুসলিম বেঙ্গল' (২য় খণ্ড) এবং অধুনা রচিত আস্‌কার ইবনে শাইখ রচিত 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা' এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আমাদের পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী মহলে একটা কথা বেশ আস্থার সাথেই উচ্চারিত হতে দেখি যে, মুসলমানরা এ দেশে বহিরাগত। সুতরাং বহিরাগত আক্রমণকারী মুসলমানদের ইতিহাস বাংলার ইতিহাস হতে পারে না। যুক্তি হিসেবে এর চমৎকারিত্বে বিভ্রান্তির যথেষ্ট খোরাক আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্ব মানব জাতির ক্রম বিবর্তন, সম্প্রসারণ ও বসতি গড়ার প্রক্রিয়ার দিকে যদি আমরা তাকাই, তা হলে কোন মানবগোষ্ঠীকেই নিরঙ্কুশভাবে 'সন্‌স্ অব দি সয়েল' বলা যাবে না। তবে জনগোষ্ঠীর আবাসিক ইতিহাসের কালক্রমের ভিত্তিতে তার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। ''সত্য বটে, ৭১২ সালে সিন্ধু দেশে মোহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযান এবং এর পাঁচ শত বৎসর পর ১২০১ সালে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় আপাতদৃষ্টিতে যে কারো কাছেই বহিরাগত আক্রমণ ও দেশ বিজয়ের অভিযান হিসাবে প্রতিভাত হবে। কিন্তু ঐ দুটি অভিযানের পটভূমি বিচারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আধুনিক ইতিহাস গবেষকবৃন্দ বেশ কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষকদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, এসব আক্রমণ ও অভিযান ছিল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। যেমন ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি আজকের বাংলাদেশ। '' (ইতিহাসের বাংলা ঃ বাংলার ইতিহাস ঃ আখতার-উল-আলম, ইত্তেফাক ঃ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যা।

প্রখ্যাত মানবতাবাদী লেখক মিঃ এম.এন.রায় তাঁর The Historical Role of Islam গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "ব্রাহ্মণ শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত জাঠ ও অন্যান্য কৃষিজীবীদের সক্রিয় সহযোগিতায় মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করলেন।" সুতরাং মুসলমানদের অভিযান এবং ইসলামের বিস্তৃতির পটভূমি আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। তা না হলে স্থানীয় নিপীড়িত জনগোষ্ঠী আরব মুসলমান অভিযানকারীদের সাথে সহযোগিতা করতো না। তবে স্থানীয় জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে সহযোগিতার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। ভাষা-ধর্ম ও ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করে বহিরাগত অভিযানকারীরা কিভাবে স্থানীয় জনগণের এই সহযোগিতা নিশ্চিত করলো, তা অনুসন্ধানের দাবি রাখে। এ থেকে একটি সমীকরণ করা খুব সহজ যে, স্থানীয় নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর কাছে আরব অভিযাত্রীদের উন্নততর মানবিক মূল্যবোধ ও উদারনৈতিক ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল। এমনকি নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে ঐসব স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সন্নিকটবর্তী হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। সুতরাং মুসলমানরা স্থানীয় জনগণনন্দিত হয়েই ভারতবর্ষে অভিযান চালায়। আর্যরা যে অর্থে 'বহিরাগত' সে অর্থে মুসলমানরা নয়।

এম.এন. রায় লিখেছেন ঃ "সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাজা হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়।" তাহলেই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অসংযোগ ও বিচ্ছিন্নতার ধারা ইসলামের অভ্যুত্থানের পাশাপাশি চলেছে। একজন রাজার মৃত্যু-তিনি যত বড় হন না কেন, তা অবশ্য ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে না ; এই বিচ্ছিন্নতার কারণ ধূমায়িত হচ্ছিলো শত শত বছর ধরে। বৌদ্ধ বিপ্লবই একে রাখলো কিছু দিনের জন্য থামিয়ে ; কিন্তু সে বিপ্লবের পরাজয়ে অবস্থা আরও ক্ষিপ্র, বেগবান এবং সুতীব্র হয়ে উঠে, খৃষ্ট সন্ন্যাসশ্রম যেমন অন্যান্য জায়গায় করেছিল, তেমনি বৌদ্ধ মঠের অধঃপতন আর সমস্ত ভারতীয় সমাজের উপর তার এক বিচ্ছিন্নকর প্রভাব ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ে যথাসাধ্য সহায়তা করলো।

এ প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখক হ্যাভেল-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয়াভিযান বাইরের কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা

করা যায় না। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র আর্যাবর্তে যে রাজনৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়, তা তার জন্যই সম্ভব হয়েছিলো। নবীন সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে দিয়েছে সমান আত্মিক মর্যাদা, ইসলামকে করেছে রাজনীতি ও সমাজনীতির মিলনভূমি। আর তাই দিয়েছে তাকে জগত শাসনের ভার। জগতটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হবার বিধান হিসেবে ইসলাম যথেষ্ট। বৌদ্ধ দর্শন ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের গোঁড়ামির সংঘর্ষ যখন উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের সৃষ্টি করলো, সেই সংকটকালেই ইসলাম সঞ্চয় করেছে তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি।

হ্যাভেল তাঁর "Aryan Rule in India" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "হিন্দু সমাজ জীবনে মুসলমান রাজনৈতিক মতবাদের ফল ফলেছে দু'রকমে-জাতিভেদের গোঁড়ামিকে এ যেমন একদিকে শক্ত করেছে তেমনি অপরদিকে তার বিরুদ্ধেও সৃষ্টি করেছে এক বিদ্রোহ। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের চোখের সামনে তা এঁকেছে এক প্রলুব্ধকর ভবিষ্যতের ছবি, তাতে মরুভূমির বেদুঈনদের মতো তারাও হয়েছে আকৃষ্ট।. . . . শূদ্রকে এ দিয়েছে মুক্ত মানুষের অধিকার আর দিয়েছে ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা। ইউরোপের পুনর্জাগরণের মতো চিন্তা জগতেও তুলেছে তরঙ্গাভিঘাত, জন্ম দিয়েছে অগণিত দৃঢ় মানুষের, আর অনেক অত্যদ্ভুত মৌলিক প্রতিভার পুনর্জাগরণের মতোই এও ছিল আসলে এক পৌর আদর্শ। এরই জন্য তাঁবু ছেড়ে যেতে হয়েছে যাযাবরকে, আর শূদ্রকে ত্যাগ করতে হয়েছে তার গ্রাম। মোটের উপর এরই ফলে গড়ে উঠলো বাঁচার আনন্দে পরিপূর্ণ এক বিরাট মানবতা।"

পশ্চিমবঙ্গের গবেষক ঐতিহাসিক গৌতম রায় লিখেছেন ঃ " সে সময় হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক মাৎস্যন্যায় ও সামাজিক অবক্ষয় এমন স্তরে পৌছেছিল যে, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাজপ্রভুদের হয়ে লড়ারও কোন প্রেরণা জনগণের মধ্যে জাগেনি। জাগার কথাও নয়। তুর্কীদের চেহারা, সাংস্কৃতিক বা শাসন পদ্ধতির মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ও দানবীয় কিছু ছিল না, যা হিন্দুস্তানের জনগণ ইতিপূর্বে রাজপুতদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেননি। শুধু

বহিরাগত বিধর্মী বলেই তুর্কীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে, এমন কোন কুসংস্কার ত্রয়োদশ শতকে ছিল না। থাকলে রাজপুতদেরই কি এখানকার ভূমিপুত্ররা মেনে নিতেন ? কিংবা তারও আগে, বর্বর আর্য উপজাতীয়দের ? তুর্কীদের চেয়ে তারা তো কম বহিরাগত ছিল না, কিংবা কম বিধর্মী ? কয়েক শতাব্দী আগে তারাও (আর্য) তো তুর্কীদের ভূখন্ড থেকেই এদেশে ঢুকেছিল ? আসলে বইয়ে যা'ই লেখা হোক, তদানীন্তন জনসাধারণ তুর্কী আধিপত্যকে বিদেশী আগ্রাসন ভেবে নেয়নি। গণ প্রতিরোধও তো দেখা দেয়নি।" (মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা ঃ আসকার ইবনে শাইখ)।

বিশিষ্ট সাংবাদিক আখ্তার-উল-আলম তাঁর এক নিবন্ধে বলেছেন ঃ "মাত্র ১৮ জন সঙ্গী নিয়ে বখতিয়ার খিলজী বঙ্গ জয় করেছিলেন, এ কথা সত্য হতে পারে না, তখন আমরাও তার (বঙ্কিমের) সে কথাকে সত্য বলে মেনে নিতে চাই, তবে ভিন্নার্থে। ইতিহাসে দেখি, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই এই উপমহাদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ ছিল। এবং সেই আরবরাই এই উপমহাদেশকে প্রথম 'হিন্দ' নামে অভিহিত করে। সেই থেকে এই উপমহাদেশের লোকদের বলা হত হিন্দী বা হিন্দু। গৌতম বাবুও স্বীকার করেছেন যে, "আরবরাই প্রথম সিন্ধু অববাহিকার বাসিন্দাদের হিন্দু নামে ডাকতে শুরু করে। এবং 'বৈদিক' মৌর্য বা গুপ্ত যুগে ভারতবাসীর কাছে 'হিন্দু' কথাটার কোনও অর্থ ছিল না....তখন যেসব ধর্মীয় গোষ্ঠী এদেশে ছিল, কেউ নিজেদের 'হিন্দু' বলে জানত না, এমনকি একটি অখন্ড ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের অংশও ভাবত না।....মাত্র গত শতকে সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকেরা ১২০০ সনের আগেকার রাজবংশগুলোর উপর হিন্দুত্ব আরোপ করেন।....পাঠ্য পুস্তক পড়লে আরো মনে হবে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কোন সংঘাত-বিরোধ ছিল না। মুনি-ঋষিরা নদীর ধারে আশ্রম বানিয়ে জপ-তপ করতেন, ছাত্ররা গুরুগৃহে বেদপাঠ করত, চর্তুবর্ণে বিভক্ত সমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠরা চতুরাশ্রম অনুযায়ী জীবন-যাপন করতেন, ত্যাগে-তিতিক্ষায়, দানে-ধ্যানে নিস্তরঙ্গ নিরুপদ্রব দিন গড়িয়ে যেত। তুর্কীরা (মুসলমান) এসেই সব গোলমাল করে দিল। "কিন্তু

বাস্তব অবস্থা মোটেই সে রকম ছিল না। শ্রীলংকা ও বাংলাদেশ সহ গোটা দক্ষিণ এশিয়া বহির্বিশ্বে 'হিন্দ' নামে পরিচিত ছিল। আর আরবরাই এই নামের উদ্‌গাতা।

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেছেন। "আমার উম্মতের দুটি সেনাদলকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে হিন্দ (ভারত উপমহাদেশ) অভিযানকারী সেনাদল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে (কিয়ামতের আগেভাগে পুনরাগমনকারী) হযরত ঈসা (আ)-এর সহযোগী সেনাদল।" (নাসাঈ শরীফ)।

সুতরাং ইসলামের সূচনা মুহূর্ত থেকে আরবদের কাছে হাজার হাজার বছর ধরে পরিচিত ভারতের নিপীড়িত জনগণের মাঝে ইসলাম প্রচারে ঐকান্তিক তাকিদ থাকা ছিল খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। এ প্রেক্ষাপটে হিজরী প্রথম দশকেই নবীজির সাক্ষাত সাহাবীর ভারতবর্ষ তথা বাংলা ভূখন্ডে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে চলে আসার ঘটনাকে আরও যুক্তিযুক্ত মনে হবে। গ্রীক দেব-দেবীর অনুসরণে ভারতে আগত আর্যরাও পৌত্তলিকতাশ্রয়ী এক মানব রচিত ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে ভারতে আসে। ইসলামের অনুসারীরাই আরবে পৌত্তলিকতার চর্চা প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং ভারতের পৌত্তলিকতা কিংবা পারস্যের অগ্নি উপাসনাকে নির্মূল করে ইসলামের তওহীদের দাওয়াত দেয়া তাদের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। দক্ষিণ ভারতের সাথে অপর বিশ্বের যোগাযোগ ছিল স্থলপথে। কিন্তু বাংলার সাথে ছিল নৌ-পথে এবং তা ছিল বহু প্রাচীনকাল থেকেই। সে কারণে বাংলা অঞ্চলের সাথে আরবদের যোগাযোগই সম্ভবত সুপ্রাচীন।

স্বনামধন্য সূফী-সাধক শেখ আলাউল হকের প্রসিদ্ধ শিষ্য মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর (মৃত্যু ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ) একটি ঐতিহাসিক পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রদ্ধেয় আলঘতার-উল-আলম লিখেছেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কি চমৎকার দেশ এই বাংলা যেখানে অসংখ্য সূফী-দরবেশ ও তাপসগণ বিভিন্ন দিক থেকে আগমন করেন এবং বাংলাদেশকেই তাদের দেশ ও

বসবাসের স্থান হিসাবে বেছে নেন।.... মোটকথা, বাংলাদেশে শুধু বড় বড় শহরের কথা বলি কেন, এমন কোন গ্রাম কিংবা জনপদ নাই-যেখানে পুণ্যাত্মা সূফীবৃন্দ পদার্পণ করেন নাই ও বসতি স্থাপন করেন নাই।" (প্রাগুক্ত)

". . . . ইসলামের প্রাথমিক যুগেই অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতেই মহানবীর (সা)-এর একদল সাহাবী ইসলাম প্রচারের জন্য এ দেশে আগমন করেন এবং তাঁরা আসেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলেই (৬৩৩-৪৪ খৃ.)। এঁদের নেতা ছিলেন হযরত মামুন ও হযরত মোহাইমেন (রা)। এঁদের পরবর্তীতে এ দেশের বুকে ইসলাম প্রচারে আগতদের মধ্যে যাঁরা বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত হামেদ উদ্দীন, হযরত হাশেম উদ্দীন, হযরত মর্তুজা, হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত আবূ তালিবের নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসে এ-ও দেখা যায় যে, এ-রকম পাঁচটি গ্রুপ পর পর বাংলাদেশে আসেন। এর পরেও এ দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন আরো বেশ কয়েকটি প্রচারক দল।" (প্রাগুক্ত)

ইসলামের প্রথম যুগে বাংলার সবুজ প্রান্তরে যেসব সাধক এসেছেন, তাঁরা ছিলেন মানবতায় মুক্তির দূত। শূন্য হাতে আল-কুরআনের বাণী নিয়ে তারা এসেছেন। ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরোধিতা ছাড়া তাঁরা আর কোন অসুবিধা মুকাবিলা করেন নি। তবে সাধারণ জনগণের প্রীতি-ভালবাসা ও সমর্থন নিয়ে তাঁরা ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এঁদের অনেকের পবিত্র দেহ মুবারক এ দেশের নরম মাটিতে সবুজ ঘাসের নিচে মিশে আছে কিন্তু আমরা তাঁদের চিহ্নিত করতে পারছি না। এখানে একটি কথা অবশ্য উল্লেখ করা দরকার যে, ইসলাম কখনও আত্মপ্রচার পছন্দ করে না। আত্মপ্রচার গুনাহ্'র কাজ বলেই ইসলামের সাধক প্রচারকরা নিজেদের কর্মকান্ড সংরক্ষণ করে যাবার প্রয়োজনবোধ করেননি। ভক্ত-অনুরক্তদের মুখে মুখে উচ্চারিত ঘটনাবলীই পরবর্তীকালে ইতিহাসের অকিঞ্চিৎকর উপাদান হয়েছে। তৌহীদের দাওয়াত মানুষের কাছে সুললিত ভাষায় সহজবোধ্য করে পৌঁছে দেয়া মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। সূফী-সাধকরা তা করতে গিয়ে প্রচারের আশ্রয় নেয়া পছন্দ করেননি। তবে একথা সহজেই বোধগম্য যে, বাংলার এ অঞ্চলে শতকরা ৮৫ জন মুসলিম

জনসংখ্যার এই বিস্তৃতি কোন রকম প্রচার ছাড়া সম্ভব হয়নি। একথা অবশ্য সত্য যে, প্রাচীনকাল থেকে আরব বণিকদের ব্যবসার যোগসূত্র এ দেশের সাথে ছিল। সেই সুবাদে অনেক আরব মুসলিম বণিকই এদেশে চিরস্থায়ীভাবে থেকে যান। এঁদের সংখ্যা কম নয়। এঁরাও ইসলাম প্রচার ও ইসলামের শরয়ী শিক্ষাদানে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। শুরুতে ভাষা একটি বাধা হলেও আরব বণিকরা স্থানীয় জনগণের ভাষা শিখেই প্রচার কাজ চালাতে থাকেন। মরু আরবের কঠিন জীবনযাত্রা এবং এ দেশের চির সবুজ-মায়াবী নিঃসর্গ, অফুরন্ত সম্পদরাশি, জীবনের প্রাচুর্য আরব বণিকদের স্থায়ী বসতি গড়ায় প্রলুব্ধ করবে, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে, ইসলামের আবির্ভাবের পর নতুন ধর্মে স্থানীয় জনগণকে বায়আত করার স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগের কারণে অনেক আরব বণিকই স্থায়ীভাবে এদেশে থেকে যাওয়া স্থির করেন। শেখ-সৈয়দরা মূলত প্রাচীন আরব মুসলমানদেরই অধঃস্তন বলে দাবি করছেন। এটা অবান্তর নয়।

এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বৃহত্তর পর্যায়ে বৌদ্ধধর্ম ও লোকাচার অনুসরণ করতো। কিন্তু একদিকে যেমন বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তহীন হৃদয়বৃত্তি ও আধ্যাত্মিক খোরাক মেটাতে পারছিল না, অন্যদিকে তেমনি বৈদিক আর্যদের হিংস্র আক্রমণে তারা নিতান্তই অসহায় ছিল। ইসলাম এক বিস্ময়কর আত্মিক ও সামাজিক শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলে ঐসব জনগোষ্ঠী তাদের হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক দাবি অনুযায়ী ইসলামের আশ্রয়ে সমর্পিত হয়।

নবম শতাব্দীতে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। এরপর আসেন শাহ সুলতান বলখী মাহী সওয়ার (১০৪৭)। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে তাঁর মাযার বিদ্যমান। ১০৫৩ সালে শাহ সুলতান রুমী নেত্রকোণা এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন। বল্লাল সেনের আমলে যিনি ইসলাম প্রচারে এসে শাহাদতবরণ করেন, তিনি হলেন হযরত বাবা আদম শহীদ। এ ছাড়া আরও অনেক সূফী-সাধক, দরবেশ ইসলাম প্রচারে এ দেশে আসেন। সুতরাং ১২০১ কিংবা ১২০২ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের বহু আগেই দরবেশ-সূফীগণ ইসলামের

বিজয়ের উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করেন। বরং বলা যায়, তারও পাঁচ শ' বছর আগে থেকে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে এবং কার্যত ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের আগেই সামাজিক বিজয় সাধিত হয়।

ইতিহাস এ ব্যাপারে সমর্থন যোগায় যে, "বাংলাদেশে প্রস্তর যুগ হইতে লোক বাস করিয়া আসিতেছে। সেই (প্রস্তর যুগ) হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত আর্যরা এ দেশে আসে নাই।" (বিশ্বকোষ, মুক্তধারা ঃ বাংলা ভাষা অধ্যায়)। এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিকই একমত যে, আর্যদের আদিবাস দক্ষিণ রাশিয়া ও তুর্কিস্তান। "খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দ দক্ষিণ রাশিয়া ও তুর্কিস্তান হইতে বারংবার তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত দলে দলে মানবগোষ্ঠী দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে থাকে ; আর্যগণ ইহাদেরই একটি অংশ ছিল। . . .তাহারা পাঞ্জাব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় সমৃদ্ধ নগরগুলি লুণ্ঠন এবং স্থানীয় কৃষ্টির অনেকটা আত্মসাৎ করে। . . . . আর্যদের এই উপমহাদেশে হানা দিবার পূর্বেই এই অঞ্চলে উন্নততর সভ্যতা বিরাজিত ছিল এবং আর্যগণই তাহা বহুলাংশে ধ্বংস করে বলিয়া অনুমিত।" . . .(বিশ্বকোষ ঃ আর্য অধ্যায়)

ডঃ আসকার ইবনে শাইখ লিখেছেন ঃ "প্রথমে সিন্ধু সভ্যতা ও পরে বাংগালী সভ্যতা। ভারতের দুই প্রান্তে এই সভ্যতা (এভাবেই) ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও লাঞ্ছিত হয় আর্যদের হাতে।" তবে বহিরাগত আর্যরা ধর্ম-কৃষ্টি কিংবা রাজনৈতিক কোনভাবেই বাংলাকে পরাভূত করতে পারেনি। প্রতিবারই আর্যরা বাংগালী অনার্যদের হাতে মার খেয়েছে। মহিষাসুরকে আর্যরা পরাভূত করতে পারেনি। দুর্গা পূজার দৃশ্যকল্পে বৈদিক ব্রাহ্মণরা দ্রাবিড় ক্ষাত্র শক্তির প্রতিভূ 'অসুরকে' পায়ের নিচে ঠাঁই দিয়ে অনুগ্রহ করেছে মাত্র। অবশ্য এরও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আজও দুর্গা পূজা দ্রাবিড় অধ্যুষিত তামিলনাড়ুতে প্রবেশ করতে পারেনি। এই পূজার দৃশ্যকল্পে ধূর্ত আর্যরা স্থানীয় ক্ষাত্র শক্তির পরাজয় অংকন করে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিজয় রচনা করেছে। আর্যদের ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গদেশের লোকের নিন্দাসূচক পরিচয় রয়েছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে ও বঙ্গকে বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূত বলে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি, বৈদিক ধর্মানুসারীদেরকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, এখানে স্বল্পকাল বাস করলেও তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। (ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার)। ইতিহাসের সর্ববাদীসম্মত রায় হচ্ছে, আর্য-আগমন-পূর্বকালে বাংলাদেশ 'উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট এক সভ্যতার' অধিকারী ছিল। ইতিহাসে সেকালের বাংলাদেশের মানবগোষ্ঠীকে 'অষ্ট্রো-এশিয়াটিক' অথবা 'অষ্টিক' নামে অভিহিত করা হতো। কারও কারও মতে এদের পরিচয় ছিল 'নিষাদ' জাতি বলে। রামায়ণে 'নিষাদ' জাতিকে 'প্রাচীন অনার্য জাতি' বলে-বলা হয়েছে। ঋগ্বেদেও বলা হয়েছেঃ "নিষাদ বাংলার প্রাচীন জাতি।"

"নব্য প্রস্তর যুগের লোক হইলেও ইহারা (নিষাদ-বাংলার প্রাচীন জাতি) ক্রমে তাম্র ও লৌহের ব্যবহার শিক্ষা করে। ইহারা প্রধানত কৃষিকার্য দ্বারা প্রাণ ধারণ করিত ও গ্রামে বাস করিত। সমতল ভূমিতে ও পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে ধান্য উৎপাদন প্রাণালী তাহারাই উদ্ভাবন করে। পান, সুপারি, কলা, লাউ, বেগুন, নারিকেল এবং সম্ভবত আদা ও হলুদের চাষ করিত।. . . কুড়ি হিসাবে গণনা করা এবং চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে তিথি দ্বারা দিবা-রাত্রির মাস তাহারাই এ দেশে প্রচার করে।" (বিশ্বকোষ) এখানে দুটি কথা বলা সঙ্গত মনে করি। এক রকম খাবারে মানুষের পরিতৃপ্তি হতো না বলে মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানালে আল্লাহ্ রকমারি স্বাদের খাদ্যের সন্ধান দেন। এটি একটি প্রাচীন ঘটনা। প্রাচীন নিষাদ জাতি খাদ্যকে সুস্বাদু করার নানা উপকরণের চাষ যখন জানত, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এরা নিশ্চয়ই হেদায়েতপ্রাপ্ত কোন জাতিরই উত্তরাধিকার। চান্দ্র মাস আরবদের। অন্ধতার যুগ থেকেই এটা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন অষ্টিক জনগোষ্ঠীর চান্দ্র মাসে হিসেব করার পদ্ধতি দেখে খুব সহজেই এটা মনে হবে যে, কোন সুদূর অতীতে আরবদের সাথে আদি অষ্টিক জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক যোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আজও ইয়েমেনের লোকদের এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীরই সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। মদীনা শরীফে একজন আমাকে শ্রীলংকার লোক বলে মনে করেছিল। আদতেই শ্রীলংকার মানুষের চেহারা-আকৃতি বাংলাদেশের মানুষের মতোই।

মরু আরবে কৃষিযোগ্য জমির অভাব থাকায় ঐ অঞ্চলের জনগণ বরাবরই বাণিজ্যক মনোভঙ্গির অধিকারী। আর বাণিজ্যের কারণেই তাদের সমুদ্র বিহারী দুঃসাহসী সিন্দাবাদ হতে হয়েছে। এই সূত্রে বিশ্বের দেশে দেশে পণ্য নিয়ে বেড়াতে হয়েছে তাদের পাল তোলা জাহাজে। উত্তাল তরঙ্গ, বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে তাদের জীবনের ঠিকানা সংগ্রহ করতে হয়েছে।

নবী নূহ (আ)-এর পুত্র সেমের নাম অনুসারে আরবদের সেমেটিক বলা হয়। এরাই টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় অ্যাসিরীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার আবাদ করেছিল। সেমেটিকদের আদি পুরুষ মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ), যাঁর পরিচয় পবিত্র কুরআনে বিধৃত। বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে যে সবুজ সমতল জঙ্গলাকীর্ণ জনবসতি গড়ে উঠেছিল, তা-ও ছিল মূলত আরবীয় সেমেটিক গোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ। সে কারণে প্রাচীনকাল থেকেই আরবদের সাথে বঙ্গজনের একটি আত্মিক যোগাযোগ ছিল।

সুলেখক কবি মুফাখ্খারুল ইসলাম 'উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব 'নিবন্ধেও তাই বলেছেন ঃ"আদি মানব আদি নবী হযরত আদম আলায়হিস সালাম হিন্দ্ ভূমির দক্ষিণাংশে সরণদ্বীপ থেকে উঠে গিয়ে আরবের পাহাড় বেষ্টিত নিরাপদ 'বালাদিল আমীন' মক্কা শহরেই আদি বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখান থেকেই যে তাঁর আওলাদ আদম জাতি দুনিয়ার নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, গবেষণাকালে সেটুকু একেবারে বিস্মৃত না হলেই বোধ হয় তাঁদের প্রচেষ্টা সত্যের সূত্রে সহজে উপনীত হতে পারবে। .....প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই তো আরবদের হাতে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য মধ্যযুগের শেষভাগ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা জানা যায়। তাতে মনে হয়, আরবরা দুনিয়ার নানাদিকে ছড়িয়ে পড়া তাদেরই শরীক-শরাকতের খোঁজ-খবর করতে গিয়ে ব্যাপার-তিজারত ও তাহজীব তমুদ্দনের আদান-প্রদান ও আমদানী-রপ্তানী বজায় রেখে আসছিল।"

"....প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আরবরা তাদের আদি পিতার অবতরণ স্থান এই উপমহাদেশে যাতায়াত করে আসছে। এমনকি, এই উপমহাদেশের নামটি পর্যন্ত আরবদের দেওয়া।"

''পারসিকেরা এই মহাদেশের একটি প্রদেশ জয় করার পর সিন্দ্ নদকে হিন্দ্ নামে অভিহিত করেন এবং এইভাবে সিন্দের নামানুসারে সমগ্র দেশ হিন্দ্ নামে কথিত হতে থাকে। পারসিকগণ অপেক্ষা আরবগণ এই মহাদেশের সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন বলে তাঁরা সিন্দকে সিন্দ্ নামেই অভিহিত করতে থাকেন এবং সিন্দের বহির্ভূত ভূভাগকে হিন্দ বলে আখ্যায়িত করেন।.... মুসলিম প্রভাব দোষে দুষ্ট বলে যদি এই উপমহাদেশের হিন্দ্ নাম বর্জনীয় বিবেচিত হয়ে থাকে, তা হলে সর্বাগ্রে হিন্দী ভাষা ও হিন্দু সমাজের শুদ্ধি প্রয়োজন।"

ডঃ জেমস লিখেছেন ঃ "হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগ থেকে যে দক্ষিণ আরবের সাবা কওমের লোকেরা এই উপমহাদেশের পূর্বোত্তর এলাকায় পাল তোলা জাহাজে করে আসত, তার নিদর্শন তাদের প্রতিষ্ঠিত সাভার বন্দরের নামে রয়েছে। সাবাদের উর বা নগর–সাবাউর। এখন সাবাউরের উচ্চারণ সাভার। এই সাবা কওমের নামে আল কুরআনে একটি সূরা আছে। আরবের দজলা ফোরাতের বসরা নগরী সন্নিধানে মিলিত হওয়ার মতো সাভারের সামান্য উত্তরে ভাগে দুটি সুপ্রাচীন গংগাধারা মিলিত হয়েছে। একটির নাম কাঁকিলাজানি। আরবরা গংগাকে কাঙ্ক (কারক) বলে।

''আমাদের এই উপমহাদেশের ব্যাপক ইতিহাস ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম লিখেন মাওলানা মিনহাজউদ্দীন সিরাজী। তিনি উত্তর বাংলা বুঝাতে গিয়ে বর্‌রিন্দ লিখেছেন। ...আসলে বিশাল সাগর–মহাসাগরে আরবেরা জাহাজে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে যখন এই লালমাটি ভূমি লক্ষ্য করত, তখন আনন্দে বর্‌রি হিন্দ্, বর্‌রি হিন্দ্ বলে চীৎকার করে উঠত। সেই থেকেই এ নাম। আরবী বর্‌রি শব্দের মানে স্থলভাগ। ঢাকা–টাংগাইলে স্থলভাগকে এখনো 'ভড়' বলে। এই 'ভড়' আরবী বর্‌র্ শব্দেরই এক রূপ। হিন্দের বর্‌র, কাজেই ইযাফত সহযোগে বর্‌রি–হিন্দ, এখন উচ্চারণ হয় বর্‌রিন্দ। কেউ বরেন্দ্র বলে না।

এই যে ভৈরব নামে একটি নদী একদিকে আর ভৈরব নামে একটি বন্দর অন্যদিকে এখনো আছে, এ নাম যে 'বহর-ই-আব' শব্দ থেকে এসেছে, তা ধরতে অসুবিধা নেই। এর অর্থ হয় জলধি। বহর মানে সাগর, আর আব মানে পানি। এ হচ্ছে পানির সাগর। ....

ভৌগোলিক আরব সওদাগর সুলায়মান তাঁর সফরের যে বিবরণ রেখে গেছেন, তাতে সালাহাত ও কামরূতের নাম পাওয়া যায়। এ সালাহাত সিলেটের আরব প্রদত্ত আদি নাম। আরবী সালাহাত শব্দের অর্থ সদনুষ্ঠান। আরবেরা এখানে নেমে কি সদনুষ্ঠান করেছিল, তা জানা না গেলেও নামটিতে এখনো তাদের স্মৃতি আছে। .....

-----"বাঙ্গালী যুগে যুগে" নামক গ্রন্থের লেখক নাজীর আহমদ এ স্থানের নামটি কৌম-ই-হারূত শব্দদ্বয় থেকে এসেছে বলে উল্লেখ করেছেন। যেসব নামের প্রথম ভাগে কম, কাম বা কুম আছে, তাঁ যে আর্য ভাষা থেকে আসেনি, সে কথা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন।"

"রাধা গোবিন্দ বসাক, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, নীহার রঞ্জন রায় প্রমুখের গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত বাংলাদেশে সেকালে নতুন খিল জমি বেচাকেনার যেসব লিপি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তার মূল্যের কথায় দীনার ও ডহম (দিরহাম) এই দুই জাতীয় মুদ্রার কথা উল্লেখ আছে।" (উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব ঃ মুফাখ্খারুল ইসলাম ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন '৮৪ সংখ্যা)।

উপরিউক্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রশ্নটি খুব সহজেই উত্থিত হয় যে, প্রাচীন বাংলায় গংগা সাগর, লৌহিত সাগর কূলের লালমাটি এলাকার প্রধান আদি বাসিন্দারা কি তবে আরবরাই ছিল? নতুন উত্থিত বিরান ভূমিকে 'খিল' জমি বলা হয়। 'খিল আরবী শব্দ, অর্থ খালি বা অনাবাদী জমি। নানা প্রমাণ সূত্রে একথা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, দীনার ব্যবহারকারী আরবরাই এই এলাকার মূল বাসিন্দা। বরিশালসহ দক্ষিণ বাংলার ব্যাপক এলাকায় আজও সাধারণ কৃষকরা অনাবাদী জমিকে 'খিল' বলে। একইভাবে ঐ এলাকার

অধিবাসীরা নদীকে দরিয়া বা 'গাং' বলে। জেলে–মাঝিরা এখনও নদীতে একত্রে অনেক নৌকা চলাচলকে 'বহর' বলে। বিপদ–আপদকে ঠেকাবার জন্য অনেক নৌকা একত্র হয়ে এখনও চলাচল করে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আরব এবং তাদের বংশধররাই সম্ভবত এ এলাকার মূল অধিবাসী। সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ সত্যই স্পষ্ট হবে। নদীভিত্তিক ব্যবসা–বাণিজ্য, মৎস্য শিকার এবং ভূমিভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাই যে এ দেশের জনগণের প্রাচীন অর্থনীতির ভিত্তি একথা বলাই বাহুল্য। আর আরবদের হাতেই যে তার বিকাশ ঘটেছিল, তা–ও প্রায় নিশ্চিত।

"আরনল্ড ইসলাম প্রচার বিষয়ে ও ডক্টর তারাচাঁদ ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রাধিকারী জামোরিন তাঁর প্রজাদের মধ্যে এমন ফরমানও জারি করেন যে, প্রত্যেক মকুভান পরিবার (মৎস্যজীবী পরিবার) থেকে অন্তত এক বা দুজনকে মুসলিমরূপে মানুষ হতে হবে, যাতে আরবদের বাণিজ্য জাহাজের কাজে তারা সহায়ক হতে পারে। তিনি মনে করতেন, এই আরবদের বাণিজ্যের জন্যই তাঁর রাষ্ট্রের শান–শওকত আর জাঁকজমক এত বেড়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, 'দাকিন' হিন্দে হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইসলাম বিস্তারে সহায়তা হয়েছিল। হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে মালাবারকে কেন্দ্র করেই 'দাকিনে' ইসলাম প্রচার লাভ করে।"

"হিন্দের এই দাক্ষিণাত্যে বা 'দাকিনে' মুসলমানের অধিকার বিস্তৃত হয়েছে হিন্দুস্তান (উত্তরাপথে) অধিকার বিস্তৃত হওয়ার অনেককাল পরে। অথচ হিন্দুস্তানে ইসলামী প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার অনেক আগেই 'দাকিনে' ইসলাম বিস্তার পেয়েছে।"

"আরব সওদাগর ও ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্যে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সা)–এর ওফাতের দু শ' বছরের ভিতরে হিন্দের মালাবার উপকূলে মুসলিমদের যথেষ্ট বসতি কায়েম হয়েছে। ঈসায়ী ৮৫১ সনে সুলায়মান নামক আরব সওদাগর 'দাকিনের' উপকূলীয় শহরে–বন্দর সহ উপমহাদেশের অনেক স্থান সফর

করেন। সেসব স্থানের রাজা-প্রজার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মেলামেশাও ঘটে। তাঁর কাছ থেকেই জানা যায় যে, গুর্জর প্রতিহার রাজ ব্যতীত দাকিনের প্রায় সকল রাজাই আরবদের সঙ্গে অনুকূল ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতেন।"

''মাসউদী নামক আরব সূফী ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিন্দ্ সফর করেছেন হিজরী তৃতীয় শতকের একেবারে প্রথমে, ঈসায়ী দশম শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যেই। তিনি.... দক্ষিণ হিন্দের বহু রাজ্য সফর করে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ 'মারূযুয যাহাবে' উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দের প্রায় সর্বত্রই ইসলাম বিশেষ তাযীমের সঙ্গে গৃহীত ও সুরক্ষিত হচ্ছে। মাসউদী সাইমুর (চউল নগরী) শহরকে সাইরাফ, ওমান, বসরা, বাগদাদ থেকে আগত দশ হাজার আরব মুসলিম মুজাহিদের সঙ্গে অনেক মিশ্র রক্তের মুসলিম জাতি দেখেছেন এবং তাঁর ইতিহাসে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন।" (প্রাগুক্ত)

"খৃষ্টপূর্ব ১৭৭ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১০০ সন পর্যন্ত আগাথার সিডিঙ্গের আমলে মালাবারের লোকেরা আরবদের দ্বারা এমন প্রভাবিত হয়েছিল যে, তারা আরবদের তৎসাময়িক ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ---হিন্দের অনেক জায়গার নামও আরব প্রভাবে উৎপন্ন। জেগেরিস নামক স্থান আরবী জজীরা (দ্বীপ) থেকেই হয়েছে। সাইয়েদ সুলায়মান নদভী তাঁর 'আরব ওয়া হিন্দ কি তা'আল্লুকাত' গ্রন্থে হিন্দী শব্দও যে আরবী যবানে গৃহীত হয়েছে, তার উল্লেখ করেছেন।" (প্রাগুক্ত) যেমন হিন্দী চন্দন-আরবী সন্দল, হিন্দী কর্পূর-আরবী কাফুর, হিন্দী মুস্ক-আরবী মিশ্‌ক, হিন্দী জাফেল-আরবী জফল, হিন্দী ত্রিফল আরবী ইতৃরিফল, হিন্দী কার্পাস আরবী কারকাস, হিন্দী নীল আরবী নীলাজ, হিন্দী নারিকেল আরবী নারজিল, হিন্দী আব আরবী আম্বাজ, হিন্দী লেবু আরবী লিমুন ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় আরও অনেক মৌলিক আরবী শব্দের সন্ধান পাওয়া যাবে। এ ছাড়া গ্রাম জনপদে এখনও ব্যবহৃত বহু শব্দ রয়েছে যা স্থানীয় জবানে বেশ পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়েছে। ফরিদপুরে জাজিরা নামে একটি থানা রয়েছে। পটুয়াখালীর বাউফল থানা একটি গ্রামের নাম কর্পূর- কাঠি। এসব কারণে স্বভাবতই মনে হবে যে, বাংলার এ অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী আরব হওয়াই সঙ্গত।

"জাহিদুল হোসেন ও নজীর আহমদ বলে দুজন লেখক এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, দক্ষিণ আরবের বাণিজ্য প্রিয় অধিবাসীদের মাথার খুলি ও বাংলাদেশীদের মাথার খুলি এক আকৃতি বিশিষ্ট।" (প্রাগুক্ত)

মুফাখ্‌খারুল ইসলাম বলেছেন ঃ "ঈসা (আ)–এর জন্মের দু' হাজার বছর আগে যারা এখানে বন্দর স্থাপন করে বাস করেছে, তাদের নিজ দেশে এক নবী নাযিল হয়েছেন শুনে সে নবীর ধর্ম গ্রহণ করা তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। কাজেই হযরত রসূল (সা)–এর সমকালে এ দেশে ইসলামের আবির্ভাব একেবারে অসম্ভব নয় বলে মনে হয়।" (প্রাগুক্ত)

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের উদ্ভবকেন্দ্র আরব ভূমিতে ইসলামের প্রচার ছিল বিপ্লবী প্রক্রিয়া। মহানবী (সা) কোরেশ সরদার ও সাধারণ মক্কাবাসীদের উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে তদানীন্তন রেওয়াজ অনুযায়ী একত্রিত করে ইসলামের আহ্বান জানান। তখন মক্কার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল কুরায়শদের হাতে। এ ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে কোরেশ সরদাররা শুধু নিরুৎসাহিতই ছিলেন তাই নয়, তারা স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করলেন যে, মুহাম্মদ (সা)–এর ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন হবে। কেননা ইসলাম দু'টি মৌলিক ও কঠোর শর্ত আরোপ করে, যা পৌত্তলিক আরবদের কায়েমী স্বার্থের প্রতি সরাসরি হুমকি স্বরূপ। এক. আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও দুই. রিসালাত–আল্লাহ্‌র নবীর নেতৃত্বকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ। এই দু'টি প্রধান শর্ত গ্রহণ করলে তদানীন্তন কোরেশদের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং পুরনো পৌত্তলিক ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, এই আশংকায়ই কোরেশ সরদাররা ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক শত্রুতা করতে থাকে। কিন্তু আরবের বাইরে ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয় উপকূলে তথা বাংলার এ অঞ্চলে ইসলাম তেমন কোন প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়নি। এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অনানুষ্ঠানিক ছিল বলেই সম্ভবত গোড়ার দিকে রাজশক্তি কিংবা সামাজিক কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ইসলামে অদৃশ্য অথচ দ্রুত বিস্তার লাভের বিষয়ে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। কেননা, সুদূর অতীতকাল থেকেই এ অঞ্চলের সাথে আরবদের নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সে কারণে কিছুটা সাংস্কৃতিক

লেনদেনও হওয়া ছিল স্বাভাবিক। অন্য দকে দু'টি প্রাচীন জনপদের অর্থনীতিও একটি অপরটির সম্পূরক হয়ে দাঁড়ায়। বাণিজ্য সম্পর্ক সূত্রেই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্কের বিস্তৃতি ঘটে এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শক্তির তেমন কিছু করণীয়ই থাকে না। উপরন্তু এ অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা যদি আরব সেমেটিকদেরই উত্তরপুরুষ হয়ে থাকে, তাহলে স্বগোত্রীয়দের গৃহীত খোদায়ী ধর্মের পয়গাম যে শুরুতেই তাদের মনকে আকৃষ্ট করবে, এটা তো স্বাভাবিক। বিশেষ করে আর্যদের হিংসাত্মক ও আগ্রাসী আচরণ আদি অধিবাসীদের মাঝে যে ভীতির সঞ্চার করেছিল, তা থেকে আত্মরক্ষার তাকিদেও তারা ইসলামের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন অনুভব করে। উত্তর ভারতে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হবার পর প্রায় পাঁচ শ' বছর পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত তথা বাংলার এ এলাকা আর্য প্রভাবমুক্ত ছিল। ইতিহাস সাক্ষী, আর্যরা বাংলাকে করায়ত্ত করার উপর্যুপরি একাধিক অভিযান চালালেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে একথা বলতে হয় যে, আর্য আগ্রাসী শক্তি বাংলা এলাকায় রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সামাজিক অনুপ্রবেশ ও আত্মীকরণ নীতির কুটিল পথে তারা কিছুটা সফল হয়। এভাবে আর্যরা প্রাচীন দ্রাবিড় ও অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পুরনো ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করে বাইরে থেকে নিয়ে আসা নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে নতুন এক ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতির জন্ম দেয় ইংরেজ শাসন-উত্তর পাশ্চাত্য জাতীয়তার স্বভাবে পরবর্তীকালে যা 'ভারতীয় জাতীয়তা'র মোড়কে পরিচিতি লাভ করে। পৌত্তলিকতার ধারায় ভারতে আর্য-ব্রাহ্মণরা যে ধর্মীয় আচারের জন্ম দেয়, তা মূলত তৌহিদের অস্বীকৃতির ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং সে কারণে ইসলামের বিপরীত যে কোন দেশজ বা লৌকিক প্রথা অনুষ্ঠান-কালচারের সাথে আর্যদের আপসে কোন বাধা ছিল না। কেননা আর্যদের এই সাংস্কৃতিক বিভাজন ও লেনদেন ছিল মূলত রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ-তাড়িত। আজকে হিন্দু বা ভারতীয় সংস্কৃতি নামে যা পরিচিত, তা-ও ইসলামের অনেক সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে রস নিংড়ে গড়ে উঠেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিলীন হতে প্রস্তুত হয়নি। এটাও ইহুদী বর্ণবাদীদের মতোই এক ধরনের আত্মম্ভরিতা। প্রাচীন পৌত্তলিকতাকে আঁকড়ে ধরে আর্য-বহিরাগতরা আজও

একটি প্রাচীন সামাজিক বোধ নিয়ে টিকে আছে, যা প্রধানত ইসলামের ব্যাপারে বিদ্বিষ্ট ও তীব্র এক যুক্তিহীন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এ দিকটা খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও এ এলাকায় ইসলামের বিস্তৃতির প্রক্রিয়া ও পটভূমি জানার জন্য সম্ভবত উপরিউক্ত বিষয়গুলো স্মরণ রাখা দরকার। আমাদের আলোচনায় এ দিকটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারত তথা সমুদ্র যোগাযোগের প্রত্যক্ষ সূত্রে সম্পৃক্ত মালাবার উপকূলে ইসলামের প্রসারের গতি ছিল তীব্র এবং তার প্রক্রিয়াও ছিল ভিন্নধর্মী। অর্থাৎ আরবদের সাথে ঐতিহ্যগতভাবে সমুদ্র উপকূলের যেসব প্রাচীন জনপদের সাথে গভীরতর নৈকট্যের সম্পর্ক ছিল, ঐসব এলাকায় ইসলাম অনেকটা অবাধে স্বতঃস্ফূর্ত গতিছন্দে বিস্তার লাভ করেছে। ভারতের মালাবার উপকূলে ইসলামের অনুসারী, যারা 'মোপালা' নামে পরিচিত, তারা প্রথম যুগের ইসলামের অনুসারীদেরই উত্তর পুরুষ। আজও দক্ষিণ বাংলার বরিশাল অঞ্চলে ব্যাটা ছেলেকে 'পোলা' বলে সম্বোধন করা হয়। এটি যে 'মোপালা' শব্দেরই অপভ্রংশ, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ থেকে এ ধারণা করা খুব কঠিন নয় যে, বরিশাল সহ সন্নিহিত সমুদ্র উপকূলীয় গোটা এলাকার আদি অধিবাসীদের রক্তধারার সাথে মোপালা আরব রক্তধারার একটি যোগসূত্র ছিল। ভারতে আর্য আগমনের পূর্বে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে আরবদের যোগাযোগের সূত্র রচিত হলেও চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়াও ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালী, সন্দ্বীপের এলাকায় কোন প্রাচীনতম আন্তর্জাতিক বন্দরের অস্তিত্ব যে ছিল না, একথা বলা যাবে না। অব্যাহত নদী ভাঙ্গন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির কারণে ঐসব প্রাচীন বন্দর যদি বিলীন হয়ে যেয়ে থাকে তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবে চট্টগ্রাম বন্দর সূত্রে আরবদের যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সুদূর প্রসারী ফল হয়েছিল। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় আরবী শব্দের প্রভাব আজও সর্বাধিক। আরবী শব্দে 'না' সূচক ক্রিয়াপদ আগে ব্যবহৃত হয়। আরবী 'লা' চট্টগ্রামের আঞ্চলিক উচ্চারণে 'না' বা 'ন' হয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক আল-ইদ্রিসী তাঁর 'নুযহাতুল মুশতাক' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্য কেন্দ্র ও সমৃদ্ধিশালী স্থান। এখানে অনেক লাভবান (ব্যবসা-বাণিজ্য) হওয়া যায়। এ বন্দর কনৌজের অধীন এমন এক

নদীর তীরে অবস্থিত, যা কাশ্মীর দেশ থেকে উদ্ভূত। এখানে চাউল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী, বিশেষ করে গম পাওয়া যায়। পনেরো দিনের দূরত্বে অবস্থিত কামরূত (কামরূপ) থেকে এখানে চন্দন কাঠ নদীপথে আনা হয়, যার পানি সুমিষ্টি।....এ শহরের (সমন্দর) একদিনের দূরত্বে একটি দ্বীপ আছে, যেখানে অনেক লোকের বাস এবং দেশের সকল ব্যবসায়ী রীতিমত সেখানে যাতায়াত করে।" 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে ডঃ আবদুল করীম 'সমন্দর' বন্দরকে চট্টগ্রামেরই অভিন্নরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাংলাদেশের 'মুসলিম'-এর প্রশংসা করেছেন। মিসরের ফারাও'দের মমি নাকি মসলিন দিয়ে আবৃত করা হতো। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীনতম ইতিহাসে অনেক সমৃদ্ধ জাতির উল্লেখ করেছেন, যারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিলীন হয়ে গেছে। কে বলবে, এই জনপদেও প্রাচীনতম সভ্যতার বিলুপ্ত ফসিল লুকিয়ে আছে কি না। ইবনে বতুতা বাংলা এলাকা থেকে যেসব উপহার সামগ্রী নিয়ে গেছেন, তার মধ্যে মসলিন ও চন্দন কাঠ ছিল। এ দু'টি দ্রব্য আরবদের কাছে প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত ছিল। ডঃ এ. রহীম তাঁর 'সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রী অব বেঙ্গল' গ্রন্থে বাংলার উপকূল ভাগে আরব বণিকদের যোগসূত্র স্থাপনের তথ্য বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চট্টগ্রাম নামটিও আরবদের দেয়া। ইতিহাসের সূত্রসমূহ এ কথা সাক্ষ্য দেয় যে, এ অঞ্চলে আরব-সেমিটিকরাই সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। অষ্টম ও নবম শতকে আরবীয় মুসলমান বণিকরা সমুদ্রপথে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য করতেন। এ তথ্যও অজ্ঞাত নয়।

বাংলা নামকরণ সম্পর্কে আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বলেছেন ঃ এ দেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ এবং এ দেশের লোকেরা জমিতে উঁচু 'আল' বেঁধে বন্যার পানি থেকে জমি রক্ষা করতো। সময়ের ব্যবধানে 'আল' শব্দটি দেশের নামের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এভাবে (বঙ্গ+আল) বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হয়।

রিয়াযুস্ সালাতীন গ্রন্থ প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসায়েন সলীম তাঁর গ্রন্থে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ইতিহাসের এক চমকপ্রদ তথ্যের অবতারণা

করেছেন। হযরত নূহ (আ)–এর সময় যে মহাপ্লাবন হয়, তাতে খোদাদ্রোহী শক্তি সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যারা ঐ মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পায়, পরবর্তীকালে তারাই বিরান পৃথিবীতে নতুন করে বসতি গড়ে তোলে। হযরত নূহ (আ)–এর এক পুত্রের নাম ছিল হাম। তিনি পিতার অনুমতি নিয়ে পৃথিবীর দক্ষিণ অংশে বসতি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। হামের প্রথম পুত্রের নাম হিন্দ, দ্বিতীয় পুত্রের নাম সিন্দ, তৃতীয়ের হাবাস, চতুর্থের জানায, পঞ্চমের বার্বার এবং ষষ্ঠের নাম নিউবাহ। এদের নামানুসারেই অঞ্চলগুলোর নতুন নামকরণ হয়। হিন্দের পুত্র দখিনের তিন পুত্র ছিল এবং দখিন (দাক্ষিণাত্য) তাদের মধ্যে তিন ভাগে ভাগ হয়। হিন্দের পুত্র বং (বঙ্গ)–এর সন্তানেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। 'বং'–এর সাথে 'আল' শব্দ যোগ হবার কারণ হচ্ছে ঃ বাংলা ভাষায় 'আল' অর্থ বাঁধ। যাতে বন্যার পানি বাগানে অথবা আবাদী জমিতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য জমির চারিদিকে বাঁধ দেয়া হতো। প্রাচীনকালে বাংলার প্রধান পুরুষরা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে দশ হাত উঁচু ও কুড়ি হাত চওড়া স্তূপ তৈরি করে তার উপর বাড়ি নির্মাণ ও চাষাবাদ করতো। লোকেরা এগুলোকে বলতো 'বাঙ্গালা'।

অন্য একটি বিষয়ও এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। আরবী 'আহ্‌ল' শব্দটি বংশ বা উত্তরাধিকার অর্থে ব্যবহৃত। 'বং'–এর বংশ বা 'আহল' বোঝাতেই 'বংগাল' বা বাংলা শব্দের উৎপত্তি। সেমিটিক ভাষায় 'আল' অর্থ আওলাদ, সন্তান–সন্ততি ও বংশধর। এ অর্থে (বং+আল) বঙাল বা বঙ্গাল (অর্থাৎ 'বং')–এর উৎপত্তি হয়েছে, এটা বলা যায়। নানা তথ্য উপাত্ত থেকে এটা খুব সহজেই ধারণা করা যায় যে, বাংলার অধিবাসীদের শরীর ও রক্তে সেমেটিক ধারাই বেশি মাত্রায় সম্পৃক্ত। তবে বাংলার আদিম অধিবাসী কারা, এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। অতি প্রাচীনকালে আর্যদের আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলে উন্নততর দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা ছিল। এই দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী যে নূহ (আ)–এর উত্তরপুরুষ, তেমন ধারণা করা কঠিন নয়।

"নিগ্রোদের ন্যায় দেহ গঠনযুক্ত এক আদিম জাতির এ দেশে বসবাসের কথা অনুমান করা হয়। কালের বিবর্তনে বর্তমানে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত।

প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অষ্ট্রিক জাতি বাংলায় প্রবেশ করে নেগ্রিটোদের উৎখাত করে বলে ধারণা করা হয়। এরাই কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্বপুরুষ-রূপে চিহ্নিত। বাংলা ভাষার শব্দে ও বাংলার সংস্কৃতিতে এদের প্রভাব রয়েছে। অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির সমকালে বা এদের কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এ দেশে আসে। উন্নততর সভ্যতার ধারক হবার কারণে তারা অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতিকে গ্রাস করে ফেলে। অস্ট্রো-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণেই আর্য-পূর্ব জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রাক-আর্য জনগোষ্ঠীই বাঙালী জনসাধারণের তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক দখল করে আছে।....বস্তুত বাঙালী একটি শংকর জাতি হলেও দ্রাবিড়ীয় উপাদান এর সিংহভাগ দখল করে আছে।" (বাংলাদেশে ইসলাম ঃ আবদুল মান্নান তালিব)

অন্যদিকে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বাংলার অধিবাসীদেরকে আলেকজান্ডারের সমকালীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ভারতের সুসভ্য জাতি বলে উল্লেখ করেছেন-এরাই আদি দ্রাবিড়। "আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এ দ্রাবিড় জাতি পশ্চিম এশিয়া থেকে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। তাইগ্রীস ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় জীবন অতিবাহিতকারী দ্রাবিড়রা স্বভাবতই ভারতের বৃহত্তম নদীগুলোর অববাহিকা ও সমুদ্রোপকূলকে নিজেদের আবাসভূমি হিসেবে বেছে নেয়। তাদেরই একটি দল গঙ্গা মোহনায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে উন্নততর সভ্যতা গড়ে তোলে।"

"খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে বাংলার এ দ্রাবিড়দের শৌর্যবীর্য ও পরাক্রমের নিকট স্বয়ং বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার নতিস্বীকার করেছেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন ঃ "এদের চার হাজার সুসজ্জিত রণহস্তী ও অসংখ্য রণতরী আছে। এজন্য অপর কোন রাজা এ দেশ জয় করতে পারেননি।" (প্রাগুক্ত)

ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা একদা পবিত্র কা'বাঘর ধ্বংস করার জন্য হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কাভিমুখে যাত্রা করলে মহান আল্লাহ্ তাঁর অসীম কুদরতে

আবাবিল পাখীর ঠোঁটে বহন করা পাথর নিক্ষেপ করে ঐ হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার, সেটি হচ্ছে প্রাচীন দ্রাবিড়রা হাতিকে যুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রতিরোধে ব্যবহার করেছে। আবার আরবের ইয়েমেন অঞ্চলের লোকেরাও হাতির ব্যবহার জানতো। এ থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে, প্রাচীন দ্রাবিড়রা আরবীয় সেমেটিক ধারারই উত্তরপুরুষ। প্রাচীন দ্রাবিড়দের আচরিত ধর্মের সঠিক পরিচয় পাওয়া না গেলেও তারা যে কোন না কোনভাবে তৌহিদবাদে বিশ্বাসী ছিল, এটা বোঝা যায়। তা না হলে শিরকবাদী পৌত্তলিক আর্যদের সাথে তাদের সংঘাত অনিবার্য হতো না। সুতরাং এ অঞ্চলের জনগণের মানস প্রকৃতি শুরু থেকেই তৌহিদবাদী ধর্মের জন্য আগ্রহী ছিল।

জাহিলিয়াত যুগ ঃ বাংলাদেশ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত তথা বাংলার এ অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূল মালাবারে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মক্কা গমন করেন। শায়খ জয়নুদ্দীন তাঁর 'তুহ্ফাতুল মুজাহিদীন ফী বা'যে আহওয়ালিল বারতাকালীন' গ্রন্থে এ রাজার শেষ নবী (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের কথা বর্ণনা করেছেন। (বিশ্বকোষ ঃ ১৪-২৩৪, উদ্ধৃত-মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস)

"আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে চীন দেশে যাবার পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করতো। কাজেই বাংলার উপকূলে তাদের আনাগোনা হতো। এ সময় (সপ্তম ও অষ্টম শতক) বঙ্গোপসাগর জাহাজ চলাচল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বাংলার উপকূলে তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) ও শৎগঙ্গ (বর্তমানের চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর। (তারিখে হিন্দে কদীম ঃ কে.এম. পন্নিকর, ৬৭ পৃ.)। দক্ষিণের উপকূল-পথে এ সময় ইসলামের সত্য বাণী বাংলায় প্রবেশ করে। অতঃপর ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখ্তিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়ের (১২০৪) পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পথ দিয়ে ইসলাম প্রচারকের দল বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সত্যবাণী বাংগালীর ঘরে ঘরে পৌছাতে থাকেন।" (বাংলাদেশে ইসলাম ঃ আবদুল মান্নান তালিব)

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ পর্যন্ত বাংলার অনার্য-দ্রাবিড় সেমেটিক অধিবাসীরা আর্যদের আগ্রাসন প্রতিহত করে আসছিল।

গ্রীকবীর আলেকজান্ডারও এদের পরাভূত করতে পারেননি। মেগাস্থিনিস থেকে শুরু করে প্লিনি, প্লুতর্ক, টলেমী প্রমুখ সমকালীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের শৌর্যবীর্য ও উন্নত সভ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে প্রাচীন বাংলার ঐ গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ পুরাণেও ঐ জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের নানা কুৎসিত ভাষায় চিত্রিত করা হয়েছে। বাংলার আদি জনগোষ্ঠী দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে আর্যদের ক্রোধ ও প্রতিহিংসার পরিচয় তাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।

"আমাদের মতে সিন্ধু সভ্যতায় ধর্মীয় সংঘাত ছিল। দ্রাবিড়গণ ছিলেন সেমেটিক। কাজেই তৌহিদবাদী সভ্যতারও সেখানে অস্তিত্ব ছিল। উপরোক্ত উপাসনালয়গুলো ছিল এ তৌহিদবাদী নিরাকার আল্লাহ্‌র উপাসনালয় মসজিদ সদৃশ। হরপ্পার আবিষ্কৃত সুবিশাল ও সুরক্ষিত সৌধের পরিচয় থেকে হুইলার (Wheeler) অনুমান করেছেন, সুমের ও আককাদের মতোই সিন্ধু সাম্রাজ্যও খুব সম্ভব কোন রকম 'পুরোহিত রাজের' শাসনে ছিল, বা এ শাসন ব্যবস্থার প্রধানতম অঙ্গ ছিল ধর্ম।"

"সম্ভবত হুইলারের এ অনুমান মিথ্যা নয়। যুগে যুগে এবং দেশে দেশে আল্লাহ্ নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষের জীবন সংস্কারের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধান অনুযায়ী দেশের শাসন পরিচালনারও ব্যবস্থা করেন। সিন্ধু সাম্রাজ্যে প্রথম দিকে সম্ভবত এ ধরনের কোন নবীর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। নবীর তিরোধানের পর সেখানে শিরকে অনুপ্রবেশ ঘটলেও শাসন ব্যবস্থায় তখনও তৌহিদের প্রভাব ছিল। এ সময় বহিরাগত শিরকবাদী ধর্মের অনুসারী আর্যদের সাথে তাদের সংঘর্ষ ও বিরোধ বাধে। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতায় তৌহিদী ধর্মের প্রভাবের ফলে যরথুষ্ট্রীয় সত্য ধর্মের সাথে সংঘাতে পরাজিত ও পলায়নপর

আর্যরা স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের (দ্রাবিড়) বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠে।" (বাংলাদেশে ইসলাম ঃ আবদুল মান্নান তালিব)।

খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দিকে হিন্দুস্তানে আর্যদের উপনিবেশ দৃঢ়রূপ লাভ করে। পাঞ্জাব থেকে বারানস পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। এরও কয়েক শত বছর আগে থেকে তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়ে হিন্দুস্তানে প্রবেশ করতে থাকে। ভারতে আর্যদের আগমনের কারণ সম্পর্কে নানারকম অভিমত পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাদশাহ গশ্‌তাসপের আমলে তাদের মাতৃভূমি ইরানে ধর্ম নিয়ে যে মতবিরোধ, আত্মকলহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সূচিত হয়েছিল, তার ফলেই তাদের নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিন্দুস্তানের পথে তাদের পাড়ি জমাতে হয়েছিল বলে একটি তথ্য বিবৃত হয়েছে। যরদাশ্‌ত-এর ধর্মের মূল কথা ছিল ঃ "মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে। মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা হারাম। পরকাল ও কর্মফলকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।"

পৃথিবীর দেশে দেশে কালে কালে যেসব বড় বড় অভিযান সংঘটিত হয়েছে এবং যেসব যুগান্তকারী বিজয় ঘটেছে, তার একমাত্র কারণ সাম্রাজ্যিক বা অর্থনৈতিক নয়। এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, ভারতে আর্য আগমনের আগেই উন্নততর দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা ছিল। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঐ সভ্যতার কি সবটুকুই বিলুপ্ত হয়েছে? নাকি তার অবশেষ কোথাও না কোথাও অবশিষ্ট ছিল? এ কথা আজ নানাভাবে প্রমাণিত যে, দ্রাবিড়রা আর্য-সংস্কৃতি ও ধর্মের চেয়ে ভিন্ন এক সংস্কৃতি ও ধর্মের অনুসারী ছিল। নানা চড়াই-উৎরাইয়ে তাদের ধর্মীয় অবয়ব পরিবর্তিত হলেও নবী-রসূল, ধর্ম গ্রন্থের মাধ্যমে তৌহিদবাদী যে ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল, তারই অবশেষ আঁকড়ে ছিল প্রাক-আর্য জনগোষ্ঠী। আর্যরা ভারতে মহৎ শৌর্য বীর্যে নয় ; বরং শঠতায় ও দানবীয় শক্তিতে জায়গা করে নেয়। ইসলাম নিয়ে

মুসলমানরা যখনই যেখানে গেছেন, সেখানে তাঁরা মানবতার মুক্তিদাতা হিসেবেই ভূমিকা রেখেছেন। ফলে স্থানীয় নিপীড়িত জনতা সবসময়ই মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছে। মুসলমানরা স্থানীয় সংস্কৃতি, জীবনধারা এবং ধর্মকে বিজয়ীর দম্ভ ও শক্তিতে বিনাশ করেনি; বরং ধর্মীয় সহাবস্থান ও উদার মানবিক নীতি মুসলমানরা অনুসরণ করেছেন। ইউরোপীয়রা স্পেনে মুসলমানদের সাথে কিংবা আর্যরা ভারতে বৌদ্ধ বা মুসলমানদের প্রতি যে নির্দয় গণহত্যার নীতি গ্রহণ করেছে, মুসলমান বিজয়ীরা যদি তার শত ভাগের এক ভাগও নির্মমতা দেখাতো, তাহলে ভারতে কোন হিন্দুরই টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। ভারতে আর্য আগমন অজ্ঞতার যুগে ঘটেছে এবং সে কারণে আর্যদের লোমহর্ষক অত্যাচার ও মানবতা বিরোধী অপরাধ-চিত্র মুসলমানদের চোখের সামনেই ছিল। তা সত্ত্বেও মুসলিম বিজয়ীরা তার প্রতিশোধ নেননি।

আর্যরা তাদের ধর্মাশ্রিত কালচারের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে কিছু কিছু অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেছে। যদিও তাতে দৃশ্যত আপন মহত্ত্ব ও ঔদার্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও অপকীর্তি আড়াল করা সম্ভব হয়নি।

দুর্গাপূজার দৃশ্যকল্পে আর্য বিজয়-গাঁথার একটি অলীক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সেখানে আর্যদের প্রতিপক্ষ প্রতিবাদী স্বাধীনতাকামী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিভূকে 'অসুর' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। দুর্গাপূজার দৃশ্যকল্পে 'অসুর'-এর চিত্রকল্প আঁকা হয়েছে, সেখানে শক্তি মদমত্ত এক কুৎসিত দ্রাবিড় সন্তানের আবির্ভাব দেখা যায়। আসূরিক শক্তির প্রতিরোধের মুখে আর্য 'দেবপুত্ররা' স্বর্গচ্যুত হওয়ায় ধ্যানমগ্ন হয়ে তপস্যায় অলৌকিক অবিশ্বাস্য শক্তির মাধ্যমে অসুরকে পরাস্ত করেছে। তবে তারা দয়া করে অসুরকে বিনাশ করেনি। 'মা দুর্গার' কাছে আত্মসমর্পণের শর্তে তার পদতলে অসুরকে ঠাঁই দেয়া হয়। এভাবেই মানবিক শক্তির অবমাননা করে তারা একটি কল্পিত কাহিনীর আশ্রয়

নিয়ে প্রাক-আর্য জাতিগোষ্ঠীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষরূপে স্বীকার করতে সম্মত হয়েছে। তা-ও অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে। কিন্তু কালা পাহাড়রা তো যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন। আর্যদের দেবীর-বিলোল কটাক্ষের কাছে হার মানেননি। দুর্গা পূজায় আর্যরা তাদের আগ্রাসী চরিত্র প্রকাশ করেছে। 'অসূর'-শক্তি-তাদের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে, এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। আজও যখন ভারতে এবং অন্যত্র আর্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রয়েছে, তখন স্বীকার করতে হবে যে, আর্যরা আজও চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারেনি। ভারতে আর্যদের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধে জীবন দিয়েছে, তারা সেমেটিক দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীরই উত্তরপুরুষ। তাঁরা ধর্মে, সংস্কৃতিতে, ভাষায়, জীবনবোধে, রুচিতে, জীবনাচরণে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন।

আর্যরা ভারতে আসে স্থলপথে। অবশ্য ভারতে মুসলিম বিজয়ও ঘটেছে একই পথে। তবে ইংরেজদের আগমন ঘটেছে নৌ-পথে এবং তার পথ দেখিয়েছেন মুসলিমরাই। মুসলিমদের সিন্ধু বিজয় অভিযানও ঘটেছিল নৌপথে। এবং মুসলমানদের হাতে ভারত বিজয় হবার বহু আগে থেকেই আরব, মিসর, পারস্য হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আলো ঠিকরে পড়েছিল। মিসরীয় মমিকে বাংলাদেশের মসলিন দিয়ে যদি আবৃত করা হয়ে থাকে, তাহলে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আরব মুলুকের সাথে এ অঞ্চলের যোগসূত্র ইতিহাসের প্রাচীনকাল থেকেই ঘটেছে। ইতিহাস সম্ভবত এ সত্যের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না যে, সেমেটিক জনগোষ্ঠীই নৌ-পথে মানব-সংযোগের নির্মাতা। চীনের সাথে কিংবা ভারতের সাথে যদি আরবদের যোগাযোগ প্রাচীনকালের হয়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সাথেও আরব বণিক পর্যটকদের সাক্ষাত ঘটেছে, এমনটা বলা চলে। সমসাময়িক ইতিহাস অবশ্য বরিশাল এলাকার সুদূর প্রাচীনকালের ইতিহাস উদ্ধার করতে ব্যর্থ। দৃশ্যত বরিশাল এলাকার ভূমি সমতল এবং নদীবেষ্টিত প্রাকৃতিক ভাঙ্গাগড়ার খেলার শিকার। আর

সে কারণে মনে হতে পারে যে, ঐ এলাকার গঠন হাল আমলের। বিশেষ করে, প্রত্নতাত্ত্বিক কোন নিদর্শন না থাকা এবং প্রতিনিয়ত জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারে নব নব পলি-প্রলেপ এই এলাকার মাটিকে নব যৌবন দান করছে। আবার নদী স্রোতে ভাঙ্গছে গ্রাম জনপদ; নতুন চর জাগে, আবাদ হয়, বসতি গড়ে উঠে। এই হচ্ছে বরিশাল এলাকার সামাজিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, বরিশাল এলাকার জনবসতি খুব সাম্প্রতিককালের। প্রাচীন গঙ্গরিড়ি সভ্যতার স্থান হিসেবেও কেউ কেউ এই এলাকাকে নির্দেশ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

মুঘল শাসন ও বাকেরগঞ্জ নামের উৎপত্তি

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার মুঘল প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা আগা বাকেরের নামানুসারে জেলার বর্তমান নামের উৎপত্তি। আগা বাকের বুজুর্গ উমেদপুর পরগণার জমিদার ছিলেন। জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এ পরগণা ছিল সবচেয়ে বড়। এছাড়া আগা বাকের সেলিমাবাদ পরগণারও ওয়াহাদাদার ছিলেন। এ পরগণার সদর দফতর ছিল বাকেরগঞ্জ।

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানী মঞ্জুরী হিসাবে এ জেলার স্বত্ব লাভ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই জেলা পৃথক কমিশনারের অধীনে ঢাকার অংশ ছিল। ১৭৯৭ সালে কমিশনারের পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য একজন স্বতন্ত্র জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে জেলা গঠন করা হয়। এর সদর দফতর স্থাপিত হয় বাকেরগঞ্জে। ১৮০১ সালে জেলার সদর দফতর বরিশালে স্থানান্তরিত হয়। ১৮০৬ সালে বৃহত্তর যশোর জেলার সাথে এ জেলার সীমানা নির্ধারিত হয়। বাকেরগঞ্জের পশ্চিমে ধলেশ্বর নদী, ঝিনঝিনিয়া খাল ও সংলগ্ন গোপালগঞ্জ-মোকসেদপুর সড়ক এই দু' জেলার মধ্যবর্তী সীমানা হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৮০৬ সালে গৌরনদী থানাকে ঢাকা-জামালপুর থেকে এ জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮১১ সালে হাতীয়া দ্বীপের একাংশ চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়। এক সময় বর্তমান খুলনা জেলার অংশবিশেষ ও ফরিদপুর জেলার প্রায় সমগ্র মাদারীপুর মহকুমা বাকেরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ভোলা দ্বীপ ১৮২২ সালে বাকেরগঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নোয়াখালীর সাথে যুক্ত করা হয়। ১৮৬৯ সালে পুনরায় ভোলা, বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারিতে বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে সমগ্র পটুয়াখালী মহকুমা এবং পিরোজপুর মহকুমা থেকে বামনা ও পাথরঘাটা থানা দুটিকে আলাদা করে পটুয়াখালী নামে এক নতুন জেলা গঠন করা হয়।

জেলার পশ্চিমে ধলেশ্বর নদী ও খুলনা জেলা, উত্তরে, ফরিদপুর জেলা, পূর্বে মেঘনা নদী ও নোয়াখালী জেলা এবং দক্ষিণে পটুয়াখালী জেলা ও বঙ্গোপসাগর। সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, ভোলা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি নিয়ে বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ জেলা গঠিত।

ভূ–প্রকৃতি

জেলার মাটি প্রধানত নদী–সমুদ্র বাহিত পলি দ্বারা গঠিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও তাদের অসংখ্য শাখা–প্রশাখা বাহিত পলি ও সূক্ষ্ম পলিজ মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্ট বিস্তৃত ব–দ্বীপের এক বিশিষ্ট অংশ নিয়ে এই জেলা গঠিত। এর ভূমি অখন্ড ও সমতল। এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত গতি পরিবর্তনশীল অগণিত নদ–নদী ও তাদের শাখা–প্রশাখা। এখানকার মাটি অতি সূক্ষ্ম পলিজ কণা বা বেলে ও কর্দমাক্ত মাটির সমন্বয়ে গঠিত। এবং এ কারণেই বর্ষায় জোয়ারে জলোচ্ছ্বাসে নদীর খরস্রোতের মুখে খুব সহজেই এ এলাকার ভূমি ক্ষয়ে যাচ্ছে। এ এলাকার ভূমি জনবসতির উপযোগী হবার পর থেকেই সম্ভবত বৈরী নদী প্রকৃতির ক্ষয়িষ্ণু থাবায় প্রতিনিয়ত ভাংছে। ফলে একদিকে যেমন নদী–নালা তার গতি পরিবর্তন করছে, তেমনি প্রাচীন জনপদসমূহ, স্থাপত্য কীর্তি–সৌকর্য প্রভৃতি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নতুন ভূমি সৃষ্টি ও পুরনো জনপদের বিলুপ্তির প্রক্রিয়ায় এ এলাকার জনবসতির সময়কাল নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। আজও যেমন বরিশাল এলাকার এক একটি গ্রাম–জনপদ একেবারেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আবার নতুন করে চরাভূমিতে তারা বসতি গড়ে তুলছে। অতীতেও এমন করেই সমৃদ্ধ–প্রাচীন জনপদ অথৈ পানির গভীরে হারিয়ে গেছে। এই ভাঙ্গাগড়ার খেলায় এককালের সমৃদ্ধ বাকলা শহর হারিয়ে গেছে চিরতরে। চট্টগ্রাম এলাকা শৈলশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত বলে তার জনবসতির প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা কিছুটা সম্ভব। এককালে সমুদ্রের বুকে সন্দ্বীপে যে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা–ও নদী গর্ভে বিস্মৃতির অতলে চিরতরে হারিয়ে গেছে। সেই প্রাচীন সমৃদ্ধ চন্দ্রদ্বীপও আজ আর অক্ষত নেই। কিন্তু তাই বলে এটা বলা যাবে না যে, বরিশালের সভ্যতা নিকট অতীতের কোন এক সময় যাত্রা শুরু করেছে। নিকট অতীতেও বরিশাল এলাকায় প্রতিনিয়ত ব্যাপক ও

ভয়াল জলোচ্ছ্বাস বিপুল প্রাণহানি ঘটিয়েছে। এ থেকে বোধগম্য যে, বরিশাল এলাকায় প্রতিনিয়ত ধ্বংসের পর নতুন করে আবাস গড়ে তুলতে হয়েছে।

গঙ্গা নদী তার পথ চলার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে তার মূল ধারা ও গতিপথ অববাহিকার উপর দিয়ে ক্রমশ নতুন পথে টেনে নিয়ে এসেছে। হুগলী নদী ও গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যবর্তী ভূখন্ডে দশ বা ততোধিক বার গঙ্গার পূর্বেকার পরিত্যক্ত গতিপথ সহজেই চিহ্নিত করা যায়। মূল নদীর গতিপথের এই পরিবর্তন ধারা থেকে সহজেই একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে, বরিশালের মানচিত্রটি আমরা এখন যেভাবে দেখছি, প্রাচীনকালে এমনটা ছিল না। নদীপথ পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ভূ-খন্ডগত পরিবর্তনও ঘটেছে অতি দ্রুত এবং একাধিক বার।

বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে ভারত মহাসাগরের বিপুল জলরাশি বঙ্গোপসাগর হয়ে এই দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সব নদীই ভরাট ও প্লাবিত করে দেয়। সমুদ্র সমতল থেকে বরিশাল জেলার গড়পড়তা উচ্চতা খুব একটা বেশি নয় বলে এ সময়ে স্বভাবতই সমগ্র জেলা পানিতে তলিয়ে থাকে।

মেঘনা নদী ছাড়া বরিশাল জেলার অপেক্ষাকৃত বড় নদী আটটি। প্রায় সব নদীই উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। এ জন্যই বরিশাল এ এলাকায় একটি প্রবাদ আছে, 'উত্তরে নদী, সরকার বাদী।' উত্তর দিকে নদী থাকলে যেমন টিকে থাকা দুঃসাধ্য, তেমনি সরকার বিপক্ষে থাকলেও টিকে থাকা কঠিন। নদীর অপ্রতিরোধ্য অনিষ্টকারিতা নিরূপণের জন্য এই প্রবাদটির উৎপত্তি। বস্তুতপক্ষে এ জেলার উত্তর দিকের চারটি নদীই পদ্মার শাখা। বরিশালের সকল নদীই জোয়ার-ভাটার সাথে সম্পৃক্ত।

মেজর রেনেলের ম্যাপ এবং রাজস্ব জরিপের সাহায্যে মোহনা এলাকার ইতিবৃত্ত জানা সম্ভব। আঠারো শতকে গঙ্গা নদী মোটামুটিভাবে বর্তমান আড়িয়াল খাঁর পথে প্রবাহিত হতো এবং ব্রহ্মপুত্র নদী সিলেট জেলায় মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। মেজর রেনেলের ম্যাপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই

স্রোতের পশ্চিম তীরে বিক্রমপুর থেকে মেহেন্দীগঞ্জ এবং মেহেন্দীগঞ্জ থেকে ভোলা পর্যন্ত এক অখন্ড ভূমি ছিল। এ ভূমি খন্ডের অপর পাশ দিয়ে গঙ্গা নদী কিছুটা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হত। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের দিকে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে এই ভূখন্ডকে ছেদ করে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছিল। এই মোড় পরিবর্তনের সাথে নদীর ভাঙ্গাগড়া অত্যন্ত বেশি হয়েছিল। এর ফলে ভোলার একটি বিরাট অংশ ভেঙ্গে গিয়েছিল। অপর দিকে নোয়াখালীর সমুদ্র উপকূলে বহু মাইল বিস্তৃত নতুন এলাকা গড়ে উঠে। আরও দক্ষিণে বাকেরগঞ্জের উপকূল ভেঙ্গে নদীর পূর্ব দিকে দ্রুত গতিতে সারি সারি দ্বীপমালার সৃষ্টি হয়। ১৭৭০ সালে যখন মেজর রেনেলের জরিপের কাজ চলছিল, তখন নদীর ভাঙ্গনের কাজ শেষ হয়ে ভূমি গঠনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। সম্ভবত ১৭৮৭ সালে তিস্তা নদীর ঐতিহাসিক বন্যার ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ গতি পরিবর্তন করে গোয়ালন্দের কাছে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছিল।

জলবায়ু

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের পূর্বাংশ জুড়ে এই জেলার অবস্থান। জেলার জলবায়ু বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জলবায়ুর অন্তর্গত। জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সকল ঋতুতে বায়ুর আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা একই থাকে। এর কারণ দু'টিঃ ১.সমুদ্রের নৈকট্য এবং ২. শুষ্ক পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ থেকে এ অঞ্চলের দূরবর্তিতা। জেলায় শীতকাল কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত থাকে। শীতকালীন আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন থাকে। তবে মাঝে মাঝে স্বল্পকালীন বৃষ্টিপাত হয়। এ জেলায় শীতকালে কুয়াশা পড়ে এবং বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ বর্ষাকালের সমানই থাকে। ফাল্গুন মাসের শেষে অথবা চৈত্র মাসের প্রথমে স্নিগ্ধ-শীতল সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। এই শীতল বায়ু দেশের উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রবেশ করার পর উত্তপ্ত হয়ে ক্রমে প্রচন্ড রূপ ধারণ করে। এই ঝড়কেই কালবৈশাখী বলা হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কালবৈশাখীর প্রকোপ বেশি থাকে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি থেকে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময় বর্ষা ঋতুর আগমন ঘটে এবং

আষাঢ় থেকে ভাদ্র পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে বর্ষার ধারা স্তিমিত হয়ে আসে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন মাসে জেলায় ঝড়-ঝন্ঝা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টির ফলে বার বার এই ভয়ঙ্কর ঝড়-ঝঞ্ঝা ও জলোচ্ছ্বাস ঘটে থাকে। ফলে এ জেলায় জনবসতি গড়ে ওঠার শুরু থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লাখো লাখো মানুষের মৃত্যু, ঘরবাড়ি, ফসলাদি ও গবাদি পশুর ক্ষতি হচ্ছে। এই বাস্তবতা স্বীকার করে জেলার জনবসতি টিকে আছে যুগ যুগ ধরে।

তাপমাত্রা

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে বাকেরগঞ্জ জেলার তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ১০৬° ফারেনহাইট। ১৯০৫ সালে এই তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৪২.৪° ফারেনহাইটে নেমেছিল। বার্ষিক তাপমাত্রার গড় ৭৯.২° ফারেনহাইট। সাধারণত মে মাসে সর্বাধিক উষ্ণতা দৃষ্ট হয়। তখন তাপমাত্রা ৮৫.৩° ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌছায়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে এ জেলার তাপমাত্রার পরিমাণ ৬৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত নেমে যায়। শুষ্ক মৌসুমে দিনরাত্রির মধ্যে তাপমাত্রা সর্বাধিক ওঠানামা করে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত দৈনিক তাপমাত্রা প্রায় ১৮° ফারেনহাইট ও ২৩° ফারেনহাইটের মধ্যে ওঠানামা করে। অন্যদিকে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়া সাধারণত মেঘলা ও আর্দ্র থাকে। এ সময় তাপমাত্রার দৈনিক ওঠানামার তারতম্য ১১° ফারেনহাইটের মধ্যে থাকে।

বৃষ্টিপাত

জেলায় বার্ষিক গড়ে ৯৮ দিন বৃষ্টিপাত হয়। এর পরিমাণ গড়ে, ৮৫´´। তবে উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়ে থাকে। ১৯০২ সালে ছিল সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত। এর পরিমাণ ছিল ১২০.৭১´´। সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতের রেকর্ড রয়েছে ১৮৭৯ সালে। পরিমাণ ছিল ৫৫.৬৩´´।

আর্দ্রতা

জেলায় সর্বাপেক্ষা শুষ্ক মাসেও আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগের উপরে থাকে। অন্য দিকে বর্ষাকালে এই আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশি হয়।

উদ্ভিদ

সুন্দরবন জেলার উদ্ভিদ শ্রেণীর মধ্যে গাব (Diospyros Embryopteris), হরিতকী (Terminalia Chebala), কেওড়া (Sunneratia apetela), বরই বা কুল (Zizyphus Jujiba), কড়ই (Albizza Proeera), সোনালু (Cassia fistula), পশুর, জিন ও লোহা কড়াই পাওয়া যায়। এছাড়া আমড়া ও গেছে বাদাম প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এসব উদ্ভিদ বীজ প্রধানত পানিতে ভাসে। ফলে খুব সহজেই স্থানান্তরিত হতে পারে। উল্লেখ্য, নারিকেলের মতো সুস্বাদু খাদ্যও পানিতে ভাসে। অনুমান করা যায় যে, এগুলো কোন এক সুদূর অতীতে দূর–দূরান্ত থেকে ভেসে এসে এ অঞ্চলে মৃত্তিকার সন্ধান পেয়েছিল।

বাতাবী লেবু বা স্থানীয় পরিভাষায় 'জবুরা' প্রচুর পরিমাণে ফলে। এখানে গাবও দু ধরনের। একটির গাত্রাবরণ লালচে, তাতে বিছার গায়ের মতো ছোট ছোট আল থাকে। কাঁচা অবস্থায় এর শাঁস খাওয়া চলে। পাকা অবস্থায় ভেতরের গোশ্‌ত খাওয়া যায়। আর এক ধরনের গাব আছে যা পাকলে খাওয়া হয়। স্থানীয় জনগণ এই গাব থেতলে নিয়ে রস বের করে মাছ ধরার জালকে পাকা করে থাকে।

জীবজন্তু

নিকট অতীতে মেঘনার দ্বীপে ও ভান্ডারিয়া বিল অঞ্চলে বুনো মহিষ ও চিতাবাঘ পাওয়া যেত। এক জাতীয় হরিণও দেখা যেতো। তবে শূকর, সজারু, বুনো বিড়াল (ভোমরা), দাশ বাঘ, ইত্যাদিও দেখা যায়।

পাখী

কাদাখোঁচা, হাঁস, রাজ হাঁস, বক, সারস, ঘুঘু, ডাহক, ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে দৃশ্য হয়। এছাড়া কোকিল, শালিক, বউ কথা কও, মাছরাঙ্গা, কাঠ

ঠোকরা, দোয়েল, কবুতর, বুলবুল, চড়ুই, পেঁচা, লেজ ঝোলা (তাড়ুয়া) দেখা যায়।

বরিশাল জেলাকে এককালে বাংলার 'শস্য ভান্ডার' বলা হতো। সে কারণেই এ অঞ্চলটি ছিল প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। প্রাচীনকাল থেকেই বরিশালের নদী ঘেরা নারিকেল-সুপারীর বনরাজি মানুষকে হাতছানি, দিয়ে ডেকেছে। তবে একদিকে যেমন রয়েছে জীবন-জীবিকার উদ্দাম হাতছানি অন্য দিকে তেমনি এ জেলায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঝড়-প্লাবন জলোচ্ছ্বাস মানুষের স্বপ্নকে নস্যাৎ করে দেয়। তবু সংগ্রামী মানুষেরা এ জেলায় নগর-জনপদে বসতি গড়ে তুলেছে। দিগন্ত বিস্তারী ফসলের মাঠ, পাখ-পাখালীর কল-কাকলি মুখরিত বন-বনানী আর নদী-সাগরের দুরন্ত তরঙ্গে জীবনের অবগাহন এ জেলার জনগণকে করেছে দুঃসাহসী, কষ্টসহিষ্ণু।

প্রাকৃতিক বিবরণ এবং ভৌগোলিক উৎস

বাকেরগঞ্জ বা বরিশাল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধ ও প্রাচীন জনপদ। পাকিস্তান আমলের মধ্যভাগ পর্যন্ত বৃহত্তর বরিশাল জেলার সীমায় পটুয়াখালী জেলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য হালে সাবেক বৃহত্তর বরিশাল জেলা সর্বমোট ছয়টি জেলায় বিভক্ত। ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর এবং পটুয়াখালী জেলার বরগুনা এখন প্রশাসনিক জেলা শহর হিসেবে স্বীকৃত। বরিশাল জেলা ২০°'৫৩' ৩৭'' থেকে ২৩°৪' ১০'' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°৫১' ৫০'' থেকে ৯১°৪' ৮'' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল থেকে এ জেলার উচ্চতা গড়ে ১১ ফুট। বৃহত্তর বরিশালের আয়তন হচ্ছে (নদীসহ) ২,৭৯২ বর্গমাইল। তবে এই সীমা স্থির নয়। প্রতিনিয়ত এ জেলার বিভিন্ন গ্রাম-জনপদ খরস্রোতা নদীর তোড়ে প্রতিনিয়ত ভাংছে। ফলে ভৌগোলিক সীমার হ্রাস-বৃদ্ধি অহরহই ঘটছে। বরিশালের নদীঘেরা জনপদের সমতল ভূমিকে দৃশ্যত নবীন ভূখণ্ড বলে মনে হলেও এ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হবার কোন কারণ নেই।

সামগ্রিকভাবেই বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সূত্র উদ্ধার করা দুরূহ। ইতিহাসের কোন্ সময়টিতে এ জনপদটি মানব বসতির উপযুক্ত হয়েছিল এবং কখন থেকে এ অঞ্চলে মানব বসতি শুরু হয়, তার কাল নির্ণয় দুরূহ। হতে পারে, ইতিহাসের সেই প্রাচীনকালেই মানব জাতির একটি অংশ বরিশাল এলাকার সাগর-নদী বেষ্টিত জনপদকে আবাসরূপে বেছে নেয়। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখলে দক্ষিণ জনপদে মানব বসতির সূচনাকাল, তাদের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ধারা-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা সমধিক কষ্টকর।

'রিয়াযুস সালাতীন' এ বর্ণিত তথ্য অনুসারে আরবীয়রা সেমেটিক ধারার উত্তরসূরী। দ্রাবিড় এবং তাদের উত্তরপুরুষরাও সেমেটিক। আরও খোলাসা করে বললে বলতে হয়, বাংলাদেশের মানুষের রক্তধারায় সেমেটিক ধারাই প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। অবশ্য এ অঞ্চলের জন-মানুষের নৃতাত্ত্বিক উৎস নির্ণয়ে পণ্ডিতরা কোন একক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। ধরে নেয়া হয় যে, এ

অঞ্চলের জন-মানুষের একটি মিশ্র রক্ত ও ঐতিহ্যধারা রয়েছে। সম্ভবত দুনিয়ার সকল মানব গোষ্ঠীর রক্তেই মিশ্রধারার সমন্বয় ঘটেছে।

''পুরাণে প্রোক্ত নোয়াহ্‌র (নূহ্‌) পুত্র সেমের নামানুসারে আরব সন্তানদের বা আরববাসীদের সেমেটিক বলা হয় ; এরাই এককালে টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকাতে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয় প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাচীন সভ্যতাগুলোর পত্তন করেছিল। ...সেমেটিকরা বহু দেব-দেবীর ও মূর্তির উপাসক ছিল। মুখ্য উপাস্য ছিল চন্দ্র। তাকে ইল্‌ বা এল্‌ এবং পরে তা-ই আরব্য ভাষাতে ইলাহতে রূপান্তরিত হয়। ইলাহ্‌ থেকেই কালক্রমে ইসলামের এক ও অদ্বিতীয় উপাস্যের নাম হয়েছে আল্লাহ্‌।" (ভারতবর্ষ ও ইসলাম ঃ সুরজিৎ দাশ গুপ্ত)। আজও আরবীয়রা চান্দ্র বছরের নিয়মে সময় নির্ধারণ করে। অন্যদিকে আর্যরা সৌর বর্ষের হিসেবে অভ্যস্ত। আর্যদের প্রবর্তিত সৌর বর্ষই এ অঞ্চলে পরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। চন্দ্র বংশের নামের উদ্ভবেও সম্ভবত সেমেটিক প্রভাব দৃষ্টিগ্রাহ্য। বাকেরগঞ্জ বা বরিশালের প্রাচীন নাম চন্দ্রদ্বীপ। বাকেরগঞ্জ গেজেটিয়ার-এর সর্বশেষ সংস্করণে উল্লেখিত হয়েছে ঃ ''দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে চন্দ্র বংশের শাসকরা বাখরগঞ্জ সমেত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।" অন্যত্র ঃ ''চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত কান্তিদেবের তাম্র শাসন থেকে জানা যায় যে, নবম শতাব্দীতে দেব শাসকদের পতনের পর কান্তিদেব দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ক্ষমতা বিস্তার করেন। কান্তিদেব এবং তাঁর বংশের রাজারা হরিকেলের শাসক হিসেবে নিজেদের দাবি করতেন। হরিকেল নামের দ্বারা সংকীর্ণ অর্থে সিলেট অঞ্চল এবং ব্যাপক অর্থে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাতো। রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্র শাসন থেকে অবগত হওয়া যায় যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রথমে হরিকেলের রাজাদের একজন সামন্ত ছিলেন। এই ত্রৈলোক্যচন্দ্র এবং কান্তিদেবের রাজ্য বর্তমান বাখরগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, বাকেরগঞ্জ বা বরিশালের ইতিহাস কি বাংলার ইতিহাসের সমসাময়িক? নাকি মূল বঙ্গ সভ্যতার অনেক পরে নিকট অতীতের কোন এক সময়ে বাকেরগঞ্জের জনবসতি গড়ে উঠেছিল? আরও প্রশ্ন, এই

এলাকার আদি জনপদ কোন্‌টি? তার কি অস্তিত্ব এখন আছে? নাকি খরস্রোতা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে? প্রশ্ন আরও আছে। বরিশাল অঞ্চলের আদি বাসিন্দা কারা? এ জেলার ব্যাপক সংখ্যক মুসলমানের সিংহভাগই কি ধর্মান্তরিত? যদি এ ধারণা মেনে নিতে হয়, তা হলে এ সত্যও মেনে নিতে হয় যে, ঐ অঞ্চলে একাধিক মশহুর সূফী–সাধক ইসলাম প্রচার করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাসে একমাত্র সাইয়েদুল আরেফীন (র)–এর ইসলাম প্রচারের কথাই লেখা আছে। অবশ্য ইতিহাস ঐ মহৎ সূফী–সাধকের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বহুলাংশে নীরব। সাইয়েদুল আরেফীন–এর সহযোগী মুরীদ ক'জন ছিলেন, তাঁদের পরিচয়ই বা কি, সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। তিনি মূলত কোন্ এলাকার লোক ছিলেন, তারও পরিচয় জানা যায় না। বরিশাল পটুয়াখালীর বিভিন্ন গ্রাম এখনও পুরোদস্তুর মূর্তি–পূজক নিম্নবর্ণ হিন্দু আবাস। বরিশাল অঞ্চলের মুসলমানরা যদি বেশির ভাগই ধর্মান্তরিত হয়ে থাকেন, তা হলে প্রশ্ন আসে, হাজার বছরেও ঐসব নমশূদ্র নিম্নবর্ণের লোকেরা কেন ইসলামের প্রভাব এড়িয়ে চললো? অবশ্য আর্য বৈদিকরা যে পৌত্তলিক যাগযজ্ঞের ধর্ম সংস্কৃতি নিয়ে আসে, বরিশাল পটুয়াখালীর এসব নিম্নবর্ণের চাষা জনগণ তাকে এখনও হুবহু আত্মস্থ করতে পারেনি। বরিশাল পটুয়াখালীর এসব নমশূদ্ররা তাদের প্রচীন লোকজ সংস্কৃতির সাথে ব্রাহ্মণদের কিছু পূজা অর্চনাকে স্বীকার করে নিয়ে আপোস করেছেন। আর আর্য ব্রাহ্মণরা 'অসুরকে' তাদের দেবী দুর্গার পদতলে ঠাঁই দিয়ে নমশূদ্রদের নিজেদের পক্ষপুটে টেনে নিয়েছে। কিন্তু আজও দক্ষিণাঞ্চলের এসব নমশূদ্ররা আর্যদের যাগযজ্ঞ পূজা–অর্চনায় খুব উৎসাহী নয়। তারা বছরে দু এক বার বড় ধরনের পূজা–অর্চনা যাগযজ্ঞে অংশ নেয়। এতেও আত্মিক টানের চেয়ে সামাজিক আচার–প্রিয়তা লক্ষ্যযোগ্য। স্থানীয় হিন্দুরা মনসা ও কালীপূজা করে। কিন্তু উত্তর ভারতের বৈদিক আর্যরা তা করে না।

বরিশাল পটুয়াখালীতে কিছু কায়স্থ পরিবার দৃশ্যমান হলেও ব্রাহ্মণ বৈদিকদের খুব একটা দেখা মিলে না। পটুয়াখালী বাউফল থানার দু'তিনটি ইউনিয়নের নমশূদ্রদের মধ্যে মাত্র দু–এক ঘর ব্রাহ্মণ আছে। তা–ও বহিরাগত। এ দৃশ্য দক্ষিণ অঞ্চলের সবখানে চোখে পড়ে। বাউফল থানার

কালিশুরী গ্রামে হাইস্কুল সংলগ্ন সাইয়েদুল আরেফীন (র)-এর মাযায় রয়েছে। কিন্তু তাঁর মাযার সন্নিহিত দু'তিন মাইলের মধ্যে এখনও কয়েকটি গ্রামে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ। ব্রাহ্মণ-বৈদিকদের অত্যাচারে শোষিত-বঞ্চিত এসব নিম্নবর্ণের লোকদের মুসলমান হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু তারা তা হয়নি; বরং বাপ-দাদার প্রাচীন রসম-রেওয়াজ আঁকড়ে ধরে আছে। তবে তাঁরা সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে কখনও ইসলাম বা মুসলমানের বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ হয়নি; বরং মুসলমানের সূফী, সাধক, পীর, দরবেশ, আউলিয়াদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করার মাঝে আত্মিক শান্তি খুঁজে এসেছে। এ কথা সত্য যে, ইসলাম কোথাও জবরদস্তির মাধ্যমে কাউকে ধর্মান্তরিত করেনি। কেননা, সেটা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিরোধী। সামাজিকতা, পারিবারিক বন্ধন ও লোকজ ঐতিহ্য পরিহার করে দক্ষিণ বাংলার বেশ কিছু এলাকার লোকজন ইসলামকে পুরোপুরি গ্রহণ করে মুসলমান হতে চায়নি। অন্তঃসারশূন্য হিন্দুধর্মের ব্যাপারে তারা সতর্ক থেকেও ইসলামের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেনি; বরং এদের অনেকে শ্রী চৈতন্যের অনুসারী হয়ে টিকে আছে। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্ত টানতে চাই যে, দক্ষিণ এলাকার বৃহত্তর জনসংখ্যা মুসলমানরা নীচু বর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত নন। তাঁরা বরং বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে বরিশালের নদী ঘেরা এলাকায় বসতি স্থাপন করেছেন, এটাই ধারণা করা সঙ্গত।

আরও একটি প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। বৃহত্তর বরিশালে মাত্র চতুর্দশ শতকে হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র) সাহেব আগমন করেন। নিম্নবর্ণের নমশূদ্র থেকে ধর্মান্তরিত হলে এই এলাকায় মুসলিম জনবসতির বয়স মাত্র পাঁচ শতাধিক বছর দাঁড়ায়। আর ধর্মান্তরই যদি এ এলাকার মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হয়, তাহলে আরও অনেক মশহুর সূফী-দরবেশের নাম আমরা শুনতাম। বৃহত্তর বরিশালের বিস্তৃত অঞ্চলে কেন দু'চারজন দরবেশ আসবেন? আর ধর্মান্তর প্রক্রিয়া সত্য হলে বিগত দু'শত বছরেও কেন বরিশাল এলাকায় নিম্নবর্ণের নমশূদ্ররা ধর্মান্তরিত হচ্ছে না? পাকিস্তান আমলে তফসিলী ফেডারেশনের এসব অমুসলিম পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিলেও মুসলমান হবার

কথা ভাবেনি। দেবেন্দ্র মন্ডলের গোত্রীয় মনোরঞ্জন সিকদার যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বল্পকালীন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বাড়ি বাউফল থানার কর্পূরকাঠি। ঐ এলাকার কাছাকাছি প্রচুর নমশূদ্র এখনও বসবাস করছেন। কায়স্থরা চলে গেলেও নমশূদ্রদের কেউই ভারতে যায়নি। ইসলামের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব চির উজ্জ্বল, শাশ্বত সত্য চির ভাস্বর। এমনও তো নয় যে, ওলী–দরবেশরা অলৌকিক মু'জিযা দেখিয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছেন; বরং তাদের সারল্য, মানবপ্রীতি, অনাড়ম্বর জীবনধারা ও সৎ ধর্মপরায়ণতাই মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এখনও যে ইসলামের অনুসারী সূফী–সাধকরা নেই, এমন নয়। তাঁদের জীবনের চেয়েও মহৎ ও সত্য যে ইসলাম, সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানলাভের পরও পুরনো পৌত্তলিক ধর্ম যারা আঁকড়ে ধরে আছেন, তাদের হৃদয়ে সম্ভবত আল্লাহ্ তা'য়ালা মোহর মেরে দিয়েছেন। অজ্ঞতার যুগে আরবেও পৌত্তলিক মুশরিকদের প্রাধান্য ছিল। তবে সেখানে স্বয়ং মহানবী (সা)–এর সান্নিধ্য সবাই মুসলমান হন। আর মক্কা বিজয়ও ঘটেছে আল্লাহ্র নবীর জীবনের শেষদিকে। মক্কার কাফির সরদাররা মুসলমান হন বিজিত হয়ে মক্কা বিজয়েরও পরে। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, হযরত আবূ বকর (রা)–এর যামানায় এই মুসলমানদেরই একাংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাঁদের কঠোর হাতে দমন করা হয়। এর অন্য অর্থ হচ্ছে, মহানবী (সা)–এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, ইসলামের অপ্রতিরোধ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির কাছে মুশরিক ও তাদের অনুগত অধীনস্থরা সাময়িকভাবে পরাভব স্বীকার করেছিল। বলা বাহল্য, এদের মধ্যে বেশ কিছু ছিল বাহ্যিকভাবে ইসলামের প্রতি অনুরক্ত এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদের যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতি ও পরিপক্কতা তখনও অর্জিত হয়নি। পূর্ণাঙ্গ ইসলাম–পূর্বকালে আরববাসিগণ যে পৌত্তলিক ধর্ম অনুসরণ করতো, তা ছিল নিছক কতকগুলো বাহ্যিক আচার–অনুষ্ঠানের সমাহার মাত্র। ধর্মীয় না বলে ওগুলোকে সামাজিক–সাংস্কৃতিক আচরণ বলাই ভালো। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের জীবনাচরণ পরিপূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সঙ্গত কারণেই যাদের মনোজগতে তেমন কোন পরিবর্তন তখনও ঘটেনি, তাদের পক্ষে পুরনো বৃত্ত অতিক্রম করা ছিল কষ্টসাধ্য। ইসলামের সামাজিক সীমানায় প্রবেশ ও ধর্মীয় আনুগত্য গ্রহণ করার পরও যখন যাকাতের মাধ্যমে তাদের উপর অর্থনৈতিক দায়–দায়িত্ব বর্তায়, তখন তাদের একাংশ সুযোগ বুঝে যাকাত দিতে অস্বীকার

করে বসলো। হযরত আবূ বকর (রা) অবশ্য অত্যন্ত কঠোর হাতে তাদের দমন করেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই যে, বরিশাল সহ দক্ষিণ বাংলা তথা গোটা বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের অতি ক্ষুদ্রাংশই সম্ভবত ধর্মান্তরিত মুসলমান। এই বিপুল সংখ্যক মুসলমান অতি প্রাচীনকাল থেকেই মুশরিকদের আচার–আচরণ থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে এক স্রষ্টার অস্তিত্বে আস্থাশীল ছিল। অস্পষ্ট ও ক্ষীণধারায় হলেও সম্ভবত ইসলাম গ্রহণের আগে ঐসব সেমেটিক জনগোষ্ঠীর মনন–চেতনায় বিস্মৃত প্রায় তৌহিদী ধারণা বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। বেদ–পুরাণে হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর আগমন এবং সত্য ও চূড়ান্ত ধর্ম হিসেবে ইসলামের নবীর আগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা মনে রাখলে এ ধারণা অগ্রাহ্য করার কোন কারণ থাকতে পারে না। একত্ববাদ ও স্রষ্টার শাশ্বত শিক্ষা যুগে যুগে মানুষের কাছে এসেছে আল্লহর বাণী বাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)–এর মাধ্যমে। আর নবী–রসূলরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে তা নিজ নিজ কওমের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন। কালক্রমে ঐসব দ্বীনী শিক্ষা মানুষ বিস্মৃত হয়েছে এবং বেশ কিছু ঐশী গ্রন্থ অতি উৎসাহী–সীমালঙ্ঘনকারী মানুষ ইবলিসী কুমন্ত্রণায় বিকৃত করলেও মূল শিক্ষা সবসময়ই বর্তমান ছিল। এ কারণেই তৌহিদবাদী জীবন–বিধান ইসলামের আগমনের সাথে সাথে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

বর্তমানে যে অঞ্চলটি নিয়ে বরিশাল বা বাকেরগঞ্জ গঠিত, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন নামে তা পরিচিত ছিল। ইতিহাসের এক পর্যায়ে এ অঞ্চলের নাম ছিল বাকলা। ১৫৮৬ সালে পরিব্রাজক রাল্‌ফফিচ উল্লেখ করেছেন যে, বৈঙ্গলার পাটিগ্রাম থেকে তিনি যখন বাকলায় এসেছিলেন, তখন একজন হিন্দু সেখানকার রাজা ছিলেন। বাকলা সম্বন্ধে মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন–ই–আকবরী' গ্রন্থে লিখেছেন যে, বাকলা সরকার সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছিল। এখানে উল্লেখ্য ঐ সময়কার যে হিন্দু রাজার কথা পর্যটক মিঃ ফিচ উল্লেখ করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই উত্তর ভারতের আর্য হিন্দুদের উত্তরসুরি নন। তিনি অমুসলিম ছিলেন বলেই হিন্দু ছিলেন, এমন প্রমাণ নেই।

চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চল চন্দ্রদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের রাজধানী পরবর্তী পর্যায়ে বরিশাল শহর থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত মাধবপাশায় স্থানান্তরিত হয়। বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও খুলনা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাকলা জনপদটি কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকের মতে, প্রাচীন বাকলার রাজধানী ছিল বৃহত্তর বরিশাল জেলার তেঁতুলিয়া নদী তীরবর্তী কচুয়া নামক স্থানে। এলাকাটি অনেক আগেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। স্থানটি বর্তমান পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানায় অবস্থিত। এর কাছেই কালাইয়া গ্রামে কমলা রাণীর দীঘি আজও ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে আছে।

শাসকের ইচ্ছা অনুযায়ী কালে কালে যে এ জেলার নাম পরিবর্তিত হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপ, বাকলা, বরিশাল বা বাকেরগঞ্জ এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। বরিশালের প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টা তেমন একটা হয়নি। ফলে এ জেলার প্রাচীন ইতিহাস, জনবসতির ইতিবৃত্ত, সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তৃতি সম্পর্কে কোন দিক নির্দেশিকা পাওয়া যায় না।

বাকেরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার–এ বলা হয়েছে যে, বৈদিক যুগে বাকেরগঞ্জ জেলার কোন অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। কারণ বৈদিক সাহিত্যে এই অঞ্চলের কোন উল্লেখ নাই। জেলার দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রোপকূলে সুন্দরবন নামে বিস্তীর্ণ বনভূমি রয়েছে। জনশ্রুতি আছে যে, অতীতে সুন্দরবন এলাকা সমৃদ্ধ ও জনবসতিপূর্ণ ছিল। তবে এ এলাকা সম্পর্কে সেন বংশের শাসনামলের পূর্বেকার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না (পৃ. ২১–২২)।

দুর্গম যোগাযোগের কারণে প্রাচীনকালে এ এলাকার সাথে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌ–পথ। বর্তমানেও অবশ্য বরিশাল অঞ্চলের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌ–পথ। প্রথমত বহিরাগত আর্যদের কাছে সমুদ্র পারের দক্ষিণাঞ্চল ছিল অনাবিষ্কৃত। দ্বিতীয়ত সমুদ্র যাত্রায় ছিল আর্যদের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা। এ কারণে এ অঞ্চল আর্যদের কাছে ছিল দুর্জ্ঞেয় এবং অনেকটা

অস্পৃশ্য। বিশেষ করে, ভারতে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হলেও বাংলা অঞ্চলে তারা বহুকাল ছিল অনভিপ্রেত বহিরাগত এবং বাংলা মুলুক পর্যন্ত তাদের পৌছতে বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। সুতরাং বৈদিক আর্যদের ধর্মগ্রন্থে বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখ না থাকাই স্বাভাবিক। এতে করে প্রমাণ হয় না যে, বৈদিক যুগে কিংবা তার আগে বরিশাল এলাকায় কোন জনবসতি ছিল না। তবে এ-ও সত্য যে, এটা প্রমাণ করাও দুরূহ।

সুন্দরবনের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক আবদুল জলিল বলছেন ঃ "বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ সীমা লইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপের বন বিভাগকে চন্দ্রদ্বীপ বন বা চন্দ্রবন বলা হইত এবং কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই চন্দ্রবন হইতে সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অনুমান কাগজে-কলমেই রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত ইহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই। আবার কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে চন্দ্রভন্ড নামে এক বন্য জাতি বসবাস করিত এবং এই চন্দ্রভন্ড শব্দ হইতেই সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। চন্দ্রভণ্ড জাতির কথা বাকেরগঞ্জ জেলার আদিলপুর বা ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে।" (পৃ. ৫)

নবীন চন্দ্র দাস তাঁর এশিয়ার প্রাচীন ভূগোল (Ancient Geography of Asia) গ্রন্থে বলেছেন ঃ "অতি প্রাচীনকালে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল গঠিত হয় নাই এবং উহা তখন অতল সমুদ্রের একাংশ ছিল। ঋগ্বেদের আমলে বঙ্গের অধিকাংশ স্থান ছিল সমুদ্রে লীন। ভারত ভ্রমণকালে (১৮-২৪ খৃ.) সমুদ্রের লোনাজল প্রতিরোধের জন্য বহু নগরের চারিদিকে বাঁধ ছিল। হিউয়েন সাং সমতট ও কামরূপের মধ্যাঞ্চলে হাজার ক্রোশব্যাপী হ্রদ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।"

"মুর্শিদাবাদ ও নবদ্বীপ হইতেই ব-দ্বীপের গঠন শুরু হইয়াছিল। অতএব সুন্দরবন ও তন্নিকটবর্তী জেলাসমূহ সমুদ্র গর্ভে অবস্থিত ছিল। যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জের যে সমস্ত স্থানে প্রাচীনকাল হইতে শত সহস্র গ্রাম, নগর ও শহর গঠিত হইয়া শিল্প ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা এক অতি অজানা প্রাচীনকালে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে বিলীন ছিল। গঙ্গানদী পূর্ব

দিকে পদ্মা নাম ধারণ করিয়া মেঘনায় মিশেছে। মেঘনা পদ্মা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। পদ্মা নদী শত শত বৎসর ধরিয়া উহার দুই তীরে যেমন বহুভূমি গঠন করিয়াছে, তেমনই বহু নগর ও শহর ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য উহার আর এক নাম কীর্তিনাশা।. . . ভাগীরথী ও পদ্মা-মেঘনার মধ্যবর্তী ভূভাগের দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে অবস্থিত জঙ্গলাবৃত ভূভাগকে সুন্দরবন নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এই সুন্দরবন ২৪ পরগনা, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ জেলার মধ্যে অবস্থিত।"

"গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের এক নাম ছিল বক্দ্বীপ। বক্দ্বীপই বৌদ্ধ আমলে বগ্দী নামে পরিচিত হয়। হিন্দু রাজত্বের শেষদিকে সেন ও পাল রাজাগণের সময় উহার নাম হইয়াছিল বাগ্ড়ি। এতদঞ্চলে যেসব অসভ্য জাতি বাস করিত তাহারা বাগ্দী নামে পরিচিত ছিল।" আবদুল জলিল আরও লিখেছেন ঃ "গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বঙ্গদেশের একাংশ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উহা উপবঙ্গ বলিয়া খ্যাত। এই উপবঙ্গ একটি বিশালাকায় দ্বীপ। এক সময় উহা অনেকগুলি দ্বীপের সমষ্টি ছিল। সমস্ত দ্বীপই গঙ্গার পলিমাটি হইতে উৎপন্ন। মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল নবদ্বীপ।" এই সময় নবদ্বীপের অধীনে ১২টি দ্বীপ ছিল। এর মধ্যে চতুর্থ ছিল চন্দ্রদ্বীপ বা চাক্দাহ।

সুন্দরবন দুর্গম গহীন অরণ্য অঞ্চল হলে অতি প্রাচীনকালে যে সেখানে মানব বসতি ছিল, তারও বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের বলেছেন, নৌ-পথে ও স্থল পথে লুটতরাজ করাই পর্তুগীজ জলদস্যু-প্রধানদের ব্যবসা ছিল। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রবেশ করে তারা লুটতরাজ করে যেত। শিশু ও নারীদের বন্দী করে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাত।

এ ছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আরাকান রাজা দক্ষিণবঙ্গ ধ্বংস করে অধিবাসীদের বন্দী করে নিয়ে যায়। মগদের অত্যাচারে সুন্দরবন প্রদেশের অধিবাসীরা ঐ সময় স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য দিকে হিজরত করে। এসব বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সুন্দরবন এককালে জনবহুল ছিল। সুন্দরবনের সন্নিহিত অঞ্চল বরিশালও যে সমসাময়িককালে জনবসতিপূর্ণ ছিল, এটা সহজেই বলা যায়।

জনাব আবদুল জলিল আরও লিখেছেন ঃ "এককালে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের আকৃতি ক্ষুদ্র ছিল এবং যশোর-খুলনা ও বাকেরগঞ্জের অধিকাংশ স্থান অতল সমুদ্রের মধ্যে বিলীন ছিল। সেই সুপ্রাচীনকালের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। মৃত্তিকা খনন করিলে এখনও ব-দ্বীপের বহু স্থানে বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া যাইবে।" ...মঠবাড়িয়া হাইস্কুলের পুকুর খননকালে সুন্দরী বৃক্ষের গুড়ি পাওয়া গিয়াছিল। ...ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি বিশাল পটুয়াখালীর বহু স্থানে এখনও মাটি খননের সময় সুন্দরী গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায়।

"তোডর মল্লের জরিপে সুন্দরবনের উল্লেখ নাই। তবে বঙ্গদেশে ১৯টি সরকার তাঁহার সময় সৃষ্টি হয়। তন্মোধ্যে খলিফাতাবাদ একটি। ...বাকেরগঞ্জের সুন্দরবন বোজর্গ-উমেদপুর পরগণার অধীন ছিল। তখনও অধুনা সুন্দরবন পরগনার সৃষ্টি হয় নাই। বাকেরগঞ্জ জেলায় মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মিষ্ট পানির আধিক্যে খুলনার ন্যায় লবণাক্ত পানি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারায় উহার সুন্দরবনও প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।" (পৃ. ৩৯)

''পর্তুগীজদের পরে, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ জাতি বাণিজ্যার্থে বঙ্গদেশে আগমন করে। ডি-ব্যারোর মানচিত্রে সুন্দরবনের মধ্যস্থ পাঁচটি নগরীর নির্দেশ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তিনটি বাকেরগঞ্জে এবং দুইটি খুলনা জেলায় বলিয়া নিখিল বাবু অনুমান করিয়াছেন।" (পৃ. ৪০)

ইতিহাস পর্যালোচনায়ও এটা দৃষ্ট হয় যে, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণভাগে সর্বত্রই সুন্দরবন ছিল। মুসলমানেরা এদেশে আগমন করে বসতি গড়ার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে জঙ্গল পরিষ্কার করে নিয়েছে। ''বহিরাগত মুসলমানেরাই বসবাস আরম্ভ করিয়া, এতদপ্রদেশে চাষাবাদ করিয়া, জমিতে ফসল উৎপন্ন করিয়া জীবন-ধারণ করিত। খান জাহান আলী এ দেশে অসংখ্য জলাশয় মসজিদ ও ইমারত গড়িয়া বহু জনপদের সৃষ্টি করেন।.... বঙ্গোপসাগরের তীরে এই সুন্দরবন অঞ্চলে তিনি ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়িয়া দেশব্যাপী এক নবযুগের সূচনা করেন।" এল. আর. ফকাস বলেন ঃ 'পীর খান জাহান আলী পঞ্চদশ শতকে বহুদিন যাবত দক্ষিণবঙ্গ শাসন করেন।' (পৃ. -৪১)

খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা এল. এস. এম. ওমালী আই. সি. এস. বলেন ঃ ''প্রাচীনকালীন প্রবাদ হইতে ইহাই জানা যায় যে, এই জেলার ইতিহাসে কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু রাজত্বের সম্পর্ক ছিল না। খান জাহান আলী বা খাঞ্জালী নামক জনৈক মুসলমানের নামই সর্বাগ্রে শ্রুত হয়। স্থানীয় কাহিনীতে জানা যায়, তিনি চার শতাব্দী পূর্বে যখন এদেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন সুন্দরবন আবাদযোগ্য করার জন্য শুভাগমন করেন।" (পৃ. ৪১)

মিঃ ওয়েস্টল্যাণ্ড তাঁর প্রণীত 'রিপোর্ট অন যশোর' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান পীর ও ধর্মযাজকগণ ইসলামের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে যশোর অঞ্চলে আগমন করিয়া জঙ্গল আবাদ, পুষ্করিণী খনন এবং দালান কোঠা নির্মাণ করিয়া মানুষের আবাদযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, সুন্দরবন এলাকায় এক সময় মানুষের বসতি ছিল। আর এখন যেখানে মানুষের বসতি, সেখানেও এক সময় সুন্দরবন ছিল। তবে পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে একমত যে, সুন্দরবন অঞ্চল, চন্দ্রদ্বীপ, নোয়াখালী, সন্দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে সভ্য জাতির আবাসভূমি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। ইতিহাসবিদরা এ ব্যাপারে একমত যে, খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ঘন বসতি ছিল। দক্ষতার সাথে তারা কৃষিকাজ করত। এতে প্রমাণ হয় যে, মুসলমানদের আগেও এই জাতীয় লোকেরা বহু স্থান আবাদ করে। মিঃ ফকাস এই জাতিকে আদিম জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং 'পৌদ' বলে উল্লেখ করেছেন।

''সুন্দরবনের ইতিহাস লেখক আরও বলেছেন ঃ ''পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় নমশূদ্র সমাজও ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, যশোর ও খুলনা জুড়িয়া বসবাস করিতেছে। তাহারা এ দেশের এক প্রাচীন জাতি এবং এ দেশে তাহাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে। ...ফকাস সাহেবের মতে ইহারাও আদিম অধিবাসী শ্রেণীর মানব এবং চণ্ডাল জাতীয় হিন্দু সমাজ হইতে উদ্ভূত। এই দুইটি জাতির

লোকেরা জঙ্গল কাটিয়া মাটি তুলিয়া নিম্ন স্থানকে সুউচ্চ করিয়া বহু স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে।" (পৃ: ৪৫)

নমশূদ্র আর্য বর্ণ-বিভক্তির ফল। এসব এলাকার আদি অধিবাসীরা যেহেতু আর্য আগমনের বহু আগে থেকেই বসবাস করত সে কারণে তার আগেও তাদের একটা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ছিল। তবে তা অনাবিষ্কৃত। সম্ভবত এসব আদি অধিবাসীরা সেমেটিক রক্তের উত্তরসুরি এবং তৌহিদ বিশ্বাসীদেরই সমগোত্রীয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, আর্যরা তাদের ধর্ম- সংস্কৃতিকে যারা গ্রহণ করেনি অথচ ইসলামেও পুরোপুরি লীন হয়ে যায়নি, তাদেরকেও হিন্দু সংস্কৃতি দিয়ে অবগাহন করানো হয়।

সকল মানবগোষ্ঠীই একই উৎস থেকে উৎসারিত। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বা নমশূদ্র জাতীয় এ দেশের জনগোষ্ঠী যেমন এ দেশের আদিবাসীদের অন্যতম, তেমনি সম্ভবত এরা আদি মানবগোষ্ঠীগুলিরও স্বগোত্রীয়। এরা নিশ্চিতভাবেই দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী ভুক্ত এবং সেমেটিক রক্তধারার উত্তরসূরী। ইতিহাসের সুদূর অতীতে এরা জীবিকার অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এ উপমহাদেশে আর্য আগমনের প্রাক্কালে এই জনগোষ্ঠীই সম্ভবত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ব্যর্থ হলে কালক্রমে, আর্যরা পৌত্তলিক সংস্কৃতির আগ্রাসনে তাদের গ্রাস করেছে। এটা আর্য-ব্রাহ্মণদের একটি বিজয়ই বলতে হবে। সাংস্কৃতিক, সামাজিক, কূটনীতি ও ধর্মাশ্রিত কল্পকাহিনীর ইন্দ্রজালে আর্যরা উপমহাদেশের বহু সংখ্যক আদিবাসী নমশূদ্রকে আপন বৃত্তে বন্দী করে ফেলেছে। অবশ্য ইসলামের আগমনের পর আর্যদের এই আত্মীকরণ প্রয়াস তীব্রতর হয়। এ কথা সত্য যে, ইসলামের সর্বগ্রাসী সামাজিক বিপ্লব যখন প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কাঠামো ও মেকী ধর্মীয় খোলস প্রায় ছিন্নভিন্ন করে ফেলছিল, তখন আর্য-সংস্কৃতি রক্ষায় উদগ্র-অস্থির একদল সংস্কারক তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণের পরিবর্তন সাধন করেন। এদের মধ্যে সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায় এবং শ্রী চৈতন্য দেব প্রমুখ প্রধান। এরা ইসলামের প্রভাবকে ঠেকাতে না পেরে বহু ক্ষেত্রে সংস্কার প্রক্রিয়া

গ্রহণ করে ধস ঠেকান এবং স্থানীয় আদিবাসীদের অনেকটা আগলে রাখতে সমর্থ হন। এ দেশের নমশূদ্ররা ধর্ম, সংস্কৃতি, পেশা, শারীরিক গঠন, রুচি, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে বহিরাগত আর্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। বরং মুসলমানদের সাথেই তাদের মিল বেশি। অতি সম্প্রতি অবশ্য রাজনৈতিক লক্ষ্যে এই বিপুল সংখ্যক নমশূদ্র জনগোষ্ঠীকে কৃত্রিম পন্থায় উত্তর ভারতীয় 'দেব সংস্কৃতির' ভক্ত বানানো হয়েছে। বলা দরকার, এমন বঞ্চিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে ইসলামের মহৎ ও উদার আঙ্গিনায় আত্মীকরণ করে নেবার বিপুল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের তেমন কোন সাফল্য নেই। সকলেই জানেন, এ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচারে শাসক মহলের সরাসরি ভূমিকা অনুল্লেখ্য। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মূল দায়িত্ব পালন করেছেন সূফী-সাধক, দরবেশগণ। ক্ষেত্র বিশেষে মুসলিম শাসকরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। বস্তুত ইউরোপীয় খৃস্টানরা কিংবা উপমহাদেশীয় আর্যরা যেমন সংঘবদ্ধভাবে মিশনারী চেতনা নিয়ে তাদের ধর্মীয় প্রচারণা চালিয়েছে, ইসলামের ব্যাপারে তেমনটা ঘটেনি। সম্ভবত বৃটিশ শাসনের পূর্ববর্তী পাঁচ থেকে সাত শ বছর একটানা মুসলিম শাসনে কোন শাসকই পরিকল্পিতভাবে ইসলাম প্রচারের কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেননি। দিল্লী পাঁচ শতাধিক বছর মুসলমানদের শাসনে ছিল। অথচ সেখানে সবসময়ই মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিলেন। বাংলা অঞ্চলে মুসলিম আধিক্য সূফী-সাধক, দরবেশদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের আগমন কেন্দ্র মক্কায়ও সামগ্রিকভাবে বিজয়ের জন্য মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক সময়টি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। গোটা পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে ইসলামের একটি সর্বাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব প্রয়োজন ছিল। তা হয়নি।

মুসলিম শাসনের সূর্য যখন অস্তাচলগামী, তখন বৃটিশ শাসনের আগমন। এবং এই সুযোগে আর্য-ব্রাহ্মণ্য শক্তির নব উত্থানের উল্লাস শুরু হয়। বর্ণবাদী সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও কূট-কৌশলে আর্য-হিন্দুরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ক্ষমতাচ্যুত হয়েও মুসলমানরা দু শ' বছর কোন না কোনভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে এসেছে। ঐ সময়টিকে আর্য-হিন্দুরা

আত্মজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে বেছে নেয়। সম্ভবত এই সামাজিক জাগরণের জোয়ারেই চির অবহেলিত আর্য-তাড়িত নমশূদ্রদেরকে তারা একই শামিয়ানার নিচে নতুন সংস্কৃতির অবগাহন করাতে সক্ষম হয়। বৃটিশ শাসনের পুরো দু' শ বছর হিন্দু জাতীয়তার যে উত্থান-উৎসব চলে, তার ভিত্তি ছিল মুসলিম বিদ্বেষ ও নেতিবাচক প্রচারণায় কলুষিত। ফলে শত শত বছর যে কৃষ্ণ বর্ণের নমশূদ্ররা মুসলমানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে, তারাও আর্য মানস দ্বারা প্রতারিত ও প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের সাথে শত্রুতার পাঞ্জা লড়েছে। পাকিস্তান উত্তরকালে এই বিভ্রান্তির ঘোর নিরসন করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার জন্য তা-ও হয়নি। বাংলাদেশ পর্যায়ে , এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি। ফলে বিপুল সংখ্যক নমশূদ্র আদিবাসী, যাদের রক্তে রয়েছে সেমেটিক ধারা, তারা ভিন্ন উৎসে ঘুরছে। এদের মাঝে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন ঃ "সূফী ও দরবেশ নামে পরিচিত একজন মুসলমান পীর বা ফকির সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল।...খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার সর্বত্র শহর ও গ্রামে, সূফীরা দর্গা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সূফীরই বহু শিষ্য ছিল। এই শিষ্যরাও আবার বড় হইয়া দর্গা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নতুন নতুন শিষ্যকে শিক্ষাদীক্ষা দিতেন।...অমুসলমানকে দীক্ষা দেওয়া মুসলমান শাস্ত্র মতে পুণ্য কার্য।.....সূফীরা এই বিষয়ে সবিশেষ তৎপর ছিলেন। তাদের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।"

ইংরেজ লেখক স্যার আরনল্ডের ভাষায় ঃ "ইসলামে জাতিভেদের বালাই নাই। আর সে জন্যই অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতীয় বহু লক্ষ মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণে বল প্রয়োগের কারণ ছিল না। শান্তিপ্রিয় প্রচারকদের শিক্ষায় তারা সহজে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি ইসলাম প্রচারের সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ বিজয় হয়েছে সেই সময়ে এবং সেসব ক্ষেত্রে যখন মুসলিম রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্বল ছিল এবং

যেখানে রাজশক্তির প্রভাব অনুভূত হয়নি, যেমন দক্ষিণ ভারতে ও পূর্ব বাংলায়। বাংলাদেশেই মুসলিম প্রচারকেরা সর্বাপেক্ষা বেশি সফলকাম হয়েছিলেন ধর্মান্তরিতের বিপুল সংখ্যার দিক দিয়ে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ক্ষেত্রে কোন সুসংবদ্ধ শক্তিশালী অন্য ধর্মের মুকাবিলায় পড়েনি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সদ্য বৌদ্ধ ধর্মের উৎখাতকারী শক্তিশালী ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রচন্ড বাধার সন্মুখীন হতে হয়েছিল ইসলামকে। কিন্তু বাংলাদেশে মুসলমান ধর্ম প্রচারককে দু'বাহু বাড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল জাতিত্বের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হিন্দুরা। এভাবে ইসলাম বিনা বাধায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ও জনবহুল প্রদেশে। এখানের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারক ও বাহক উচ্চবর্ণ হিন্দুর উৎপীড়ন, অবজ্ঞা ও অমানুবিক ব্যবহারে উত্যক্ত সাধারণ হিন্দুরা সাম্য ও মৈত্রীর একটা মহৎ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করলো ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে। একটা মহৎ ঐশীবাদেরও সন্ধান পেয়েছিল। একটা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত সমাজ ব্যবস্থারও সাক্ষাত লাভ করেছিল।"

বৃটিশ ও হিন্দু ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন যে, বাংলা-ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত, নীচু শ্রেণীর হিন্দুরাই হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু এই মত ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত নয়। খন্দকার ফজলে রাব্বি তাঁর গ্রন্থ 'বাংলার মুসলমানের উৎপত্তি'-তে লিখেছেন ঃ ''বাংলার মুসলমান মুখ্যত সাড়ে পাঁচ শ' বছরের মুসলিম শাসন আমলে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত শিক্ষক, প্রচারক, সরকারী কর্মচারী ও সৈনিকদেরই বংশধর।"

এম.এ. রহিম বলেছেন ঃ "বহুসংখ্যক পার্সী ও মোগল পরিবার বাংলাদেশেই বসবাস স্থাপন করেন। আরবীয়রা আসেন বণিক ও ধর্মপ্রচারক হিসাবে। বহু আরবীয় সূফী, প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার কার্য চালান। বাংলাদেশের বিশেষ করে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লায় জনগণের নাম, স্থানের নাম, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ থেকে প্রমাণিত হয় তৎকালে আরবদের কি প্রবল প্রভাব ছিল জনসাধারণের উপর।" অবশ্য ব্রাউন বলছেন ভিন্ন কথা। তার মতে, 'এ নিঃসন্দেহে সত্য, মুসলমানের অধিকাংশই ছিল হিন্দু।'

এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত। বৃটিশ ঐতিহাসিকরা কোনরূপ গবেষণার শ্রম স্বীকার না করেই ঢালাওভাবে এ মন্তব্য করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু ঐতিহাসিকদের মনোভাবকে তারা সমর্থন করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এসব বিভ্রান্তিকর, অর্ধসত্য তথ্য প্রকাশ করেছেন। এ দেশের মুসলমানরা ধর্মান্তরিত, এ ধরনের একটি ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হলে মুসলমানদের জাতীয়তাকে কলুষিত করা সম্ভব হবে, এটাই সম্ভবত এসব ঐতিহাসিকদের লক্ষ্য। তবে ইসলাম যেহেতু সামাজিক সুবিচার ও মানবিক সাম্যে বিশ্বাসী, সে কারণে যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্ব পরিচয় মুছে যায়। মানুষকে বিচার করার ক্ষেত্রে ইসলাম যে নিরিখ নির্ধারণ করেছে, তা হচ্ছে আল্লাহ্–ভীতি ও তাক্ওয়া। এ কারণেই ইসলামে হাবশী ক্রীতদাস কিংবা পিতৃহীন এতিম পালিত ব্যক্তির সেনাপতি শাসক হতে কোন বাধা নেই।

ইসলামের দ্রুত বিকাশের জন্য অনেক বিদ্বিষ্ট পাশ্চাত্য ও হিন্দু ঐতিহাসিক তরবারির শক্তি এবং শাসকের প্রভাবকে দায়ী করেছেন। কিন্তু এসব অভিযোগ প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। বাংলা মুলুকে ইসলাম যখন দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে, তখন এখানে মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা নেই। আর শাসকের রক্তচক্ষু এবং তরবারিই যদি ইসলাম প্রসারের কারণ হয়ে থাকত, তাহলে দু'শ বছরের গোলামি যুগেই তারা স্বধর্ম ত্যাগ করত। একদিকে বৃটিশ বেনিয়া রাজশক্তির নিপীড়ন এবং অন্য দিকে সংস্কারবাদী আগ্রাসী হিন্দু শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলমানদের গ্রাস করার জন্য উদ্যত হলেও মুসলমানরা সকল বিপর্যয়ের মুখেও ইসলামের ছায়া ত্যাগ করতে সামান্যতমও আপোস করেননি। উগ্র হিন্দুবাদী আগ্রাসন কিংবা রাষ্ট্র শক্তি সমর্থিত খৃষ্টান মিশনারীদের অন্তহীন প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলমান কেউ ধর্মচ্যুত হয়েছেন, এমন প্রমাণ নেই। তবে পশ্চিমের আধুনিকতার হাওয়ার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু মানসে যে চিত্ত–চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, তারই ফলে মাইকেল মধুসূদনের মতো মধ্যবিত্ত উদারনৈতিক হিন্দুরা স্বধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টবাদ গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। খৃষ্টান মিশনারীদের লোভনীয় প্রচারণায় এবং বিশেষত আর্থিক ও বৈষয়িক লোভে অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু খৃষ্টানত্ব গ্রহণ করেছে। এরা 'নেটিভ খৃষ্টান' নামে পরিচিত। এরা

৯–

বহিরাবরণে খৃস্টান হলেও মন-মানসিকতায় এখনও হিন্দুত্বের উৎসকে একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি।

চৌধুরী শামসুর রহমান অবশ্য ভিন্ন কথা বলছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "রাজ অনুগ্রহ লাভ ও রাজার জাতির উন্নত মর্যাদা হাসিল করার তাকিদে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুও তৎকালে দলে দলে এগিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এভাবেই গোড়ার দিকে এ দেশে ইসলামের প্রসার সাধিত হয় এবং তারই উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে এখানে মুসলিম জাতির সংখ্যাধিক্য গড়ে উঠেছে।"

এই বক্তব্য ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক সত্য হলেও ঠিক কতভাগ মুসলমান এ ধরনের ধর্মান্তরিত, তার কোন হিসাব নেই। দ্বিতীয়ত রাজানুগ্রহ প্রাপ্তিই যদি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, তাহলে মুসলমানদের দুর্দিন-দুর্যোগেও কেন তারা মূল উৎসে প্রত্যাবর্তন করেনি? আসলে ইসলামকে যারা গ্রহণ করেছেন, তারা সত্য ধর্মকেই গ্রহণ করেছেন ইহ ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে। সুতরাং রাজানুগ্রহ পাবার জন্য দলে দলে হিন্দুরা মুসলমান হয়েছেন, এটা সত্য নয়।

ডঃ আবদুল করিম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, তরবারি দ্বারা ইসলাম প্রচার হয়নি। উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে রাজা-বাদশাহ্‌রা কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি; বরং ইসলাম প্রচারিত হয় মুসলমান আলিম এবং সূফী-দরবেশদের চেষ্টায়। তাঁদের সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে এবং ইসলামের শান্তির বাণীতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামের আগমনের প্রাক্কালে উপমহাদেশের সমাজ ব্যবস্থা ছিল পঙ্গু, হিন্দুদের বর্ণ বৈষম্যের ফলে লোকজন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঠিক এমনি সময়ে ইসলামের আবির্ভাব হয় এবং ইসলামের পতাকা বহন করে নিয়ে আসেন শান্তিকামী সরল অনাড়ম্বর সূফী-দরবেশ এবং আলিম সমাজ। তাঁদের প্রভাবে উপমহাদেশের তাহযীব-তমুদ্দুনের ছাপ উপমহাদেশীয় জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে সুন্দরভাবে

প্রতিফলিত হয়। দেশের শহরে-বন্দরে, গ্রামে, মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকাহ স্থাপিত হয়ে দেশের রূপ পালটে যায়।"

ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হকও বলেছেন ঃ "পীর-ফকির, দরবেশ-আউলিয়া প্রমুখের প্রচার ও কারামতির ফলে মুখ্যত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙালী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।"

আর্যদের উৎপীড়নে ভারত থেকে বিতাড়িত বৌদ্ধরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেয়। এদের বিপুল জনসমষ্টি সম্ভবত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে তাদের সংখ্যা মোট মুসলমানের সিংহভাগ নয় নিশ্চয়ই। নানা দিক বিবেচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি ঃ এক. বহিরাগত আর্য ব্রাহ্মণদের খুব স্বল্প সংখ্যকই ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছেন। দুই. আর্য আগমনের পূর্বে যারা এ দেশের অধিবাসী ছিল, তারা আর্যদের মতো বৈদিক পৌত্তলিক ছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই। তারা সম্ভবত লোকজ কিছু আচার-আচরণ ও প্রাচীন ধর্মের বিস্মৃত শিথিল বিধানে অনুগত ছিলেন। প্রাচীন দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী প্রাক-আর্য যুগে এ দেশে যে উন্নত সভ্যতা গড়েছিলেন, তাদের মাঝে তৌহিদের ক্ষীণধারা যে বহমান ছিল না, এটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। আর্য ধর্ম সংস্কৃতির সাথে তাদের যুগ যুগ ব্যাপী সংঘাত-সংঘর্ষ থেকে এ কথা বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ, সংস্কৃতি-ধর্মবোধ, ভাষা, নৃতাত্ত্বিক উৎস ছিল বিপরীত ধারার। বরিশাল সহ গোটা দক্ষিণ বাংলার জনপদ সৃষ্টি ও জনবসতির ইতিহাস যত প্রাচীন কিংবা নবীনই হোক না কেন, ঐসব এলাকার আদি অধিবাসীরা সেমেটিক এবং তারা আর্য-আগমনের পরেও তাদের হিন্দুত্ব গ্রহণ করেননি। সুতরাং তাদের ধর্মান্তরিত হবারও কোন প্রশ্ন ওঠে না। পৌত্তলিকতা বিমুক্ত কোন এক সেমেটিক ধারার বিস্মৃত ঐশী ধর্মের অনুসারীরাই যে এ দেশের বিপুল মুসলমান নন, এটাই বলি কিভাবে ? তিন. এ উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের আগে থেকেই আরবদের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে এ দেশের মানুষের সাথে সংযোগ সম্পর্ক ছিল। তখন বাংলাদেশের পরিধি ছোট হলেও এবং বরিশাল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সমুদ্র গর্ভে বিলীন থাকলেও যখন থেকে এ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠে, তখন থেকেই আরব বণিকদের আনাগোনা এ অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত ছিল। বৈবাহিক সূত্রে কিংবা পুনঃবসতি গড়ার নিয়মে

দক্ষিণের এ অঞ্চলেও যে আরব সেমেটিকদের পূর্বপুরুষরা বংশ বিস্তার করেনি, তা–ও জোর দিয়ে বলা যায় না। চার. বরিশাল অঞ্চলে চট্টগ্রামের মতো প্রচুর আরবী শব্দ প্রচলিত না থাকলেও পারিবারিক পর্যায়ে এখনও বেশ কিছু আরবী শব্দ রয়েছে। 'গাঙ্গ'–নদী, 'ভাউজ'–ভাবী, 'বাছা'–চাচি, প্রভৃতি শব্দ এখনও বরিশালে ব্যবহৃত। এ থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আরবদের পূর্বপুরুষদের এ এলাকায় বসবাস অথবা আরবীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। পাঁচ. অনেকের মতে, 'বরিশাল' নামের উৎপত্তি হচ্ছে, 'বড়ে' 'সল্ট' বা 'বড় সল্ট' থেকে। বরিশাল এলাকায় এক সময় প্রচুর সামুদ্রিক লবণ পাওয়া যেত বলে এ ধরনের নামকরণ। কিন্তু এ মত সর্বৈব গ্রহণযোগ্য ও ঐতিহাসিক সত্যের নিরিখে উত্তীর্ণ নয়।

নানা কারণে আমাদের মনে হচ্ছে, 'বরিশাল' শব্দটিও কোন আরবী শব্দের অপভ্রংশ হতে পারে। 'বহর–ই–সওয়াল' শব্দ থেকেও বরিশাল শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। ইতিহাসের সুদূর অতীতকাল থেকেই যেহেতু বাংলা এলাকার সাথে সেমেটিক আরব জাতির একটি বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। আরব নাবিকদের সমুদ্রাভিমুখী বাণিজ্য জাহাজকে সম্ভবত এ অঞ্চলের লোকজন 'বহর' বলে চিহ্নিত করত। আর ভয়াল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বাংলার দক্ষিণের সমুদ্র পারের নৌ–পথটি ছিল বিপজ্জনক। এ এলাকায় এসেই আরব বাণিজ্য বহরের নানারূপ সওয়াল বা প্রশ্ন উত্থিত হতো। এ থেকেও বরিশাল শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। তবে এ বিষয়ে এ মতই চূড়ান্ত নয়। এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে। তবে, অনেকের ধারণা, চট্টগ্রামের নৌ–বন্দরের সাথে যখন থেকে আরবদের যোগাযোগ ঘটে, তার সমসাময়িককালেই বরিশাল অঞ্চলের জনপদের সাথে আরবদের সংযোগ ঘটে থাকবে। অবশ্য, উপর্যুপরি সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, ঝড়–ঝাঞ্ঝা, ইত্যাদির কারণে কিংবা অজ্ঞাত পরিচয় কোন প্রাচীন সামুদ্রিক লুণ্ঠনপ্রিয় জাতির নির্দয় অত্যাচারে দক্ষিণের এসব জনপদ বিরান হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় জনবসতি গড়ে উঠতে হয়তো সময় লেগেছে। বরিশাল এলাকায় প্রতিনিয়ত নদীর খরস্রোত জনপদ ভেঙ্গে একাকার করেছে। ফলে প্রাচীন জনপদ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া কঠিন। সে কারণেও প্রতিনিয়ত মানব সভ্যতার স্মৃতি চিহ্ন বিলুপ্ত হবার ফলে বরিশাল এলাকার জনবসতির সময়কাল নির্ণয় করা দুরূহ।

জেলার অধিবাসী

'বরিশালের ইতিহাস' প্রণেতা সিরাজ উদ্দীন আহমেদ লিখেছেন, 'বরিশাল' বাঙ জাতির আদি ভূমি। বাঙ্গালের দেশ বরিশাল। ''সুদূর অতীতে অষ্ট্রিক, আলপাইন ও মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জনগোষ্ঠী মিশ্রিত হয়ে বাঙ বা বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি।......বাঙ মঙ্গোলীয় শব্দ এবং অর্থ জলাভূমি । বাকলা ছিল জলাভূমি। ....বাঙ্গালা পরিবর্তিত হয়ে বাকলা হয়েছে। পরবর্তীকালে বাকলা আর্য ও মুসলমানদের অধীনে চলে যায়।....ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শেখ, সৈয়দ, ও পাঠানগণ এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। বহিরাগত হিন্দু-মুসলমানগণ বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ-এর বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হয়। বাকলা বিজিত হলেও সে তার বৈশিষ্ট্য হারায়নি।"

সিরাজ উদ্দীন সাহেব বরিশালে ঠিক কখন থেকে জনবসতি গড়ে উঠে, তার সময়কাল নির্দেশ করেননি। প্রতিনিয়ত খরস্রোতা নদী-সমুদ্রের ভাঙ্গনের ফলে বরিশালের জনপদ প্রতি দু' এক শ' বছরেই বার কয়েক ভাঙ্গনের শিকার হচ্ছে। ফলে বরিশালের প্রাচীন জনপদের এলাকা নির্ণয় করাও কঠিন। ''পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে বাকেরগঞ্জে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা ছিল বেশি। তখন এ অঞ্চলের লোকসংখ্যা কত ছিল, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবু মনে হয় ১৭৫৭ সালে বাকলার লোকসংখ্যা ৮ লাখের বেশি ছিল না। মিঃ আডম বাংলার শিক্ষা বিবরণে উল্লেখ করেছেন যে, ১৮০১ সালে বাকেরগঞ্জ জেলার লোকসংখ্যা ছিল ১,২৬,৭২৩ জন এবং হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৫ ঃ ৩। অর্থাৎ ৫ ভাগ হিন্দু ও ৩ ভাগ মুসলমান। জেসি জ্যাক বলেছেন ঃ "সম্ভবত ১৮০০ সালে এ জেলায় হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা সমান ছিল।" অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের মতে ১৮০০ সালে বাকেরগঞ্জের লোকসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ।

এক শ' বছরের মধ্যে দক্ষিণ শাহবাজপুর বা ভোলা, বরগুনা ও পটুয়াখালীতে জনবসতি গড়ে উঠে। বন কেটে যারা বসতি গড়ে তুললো,

তাদের শতকরা ৭০ ভাগই ছিল মুসলমান। মুসলমানদের পরেই নমশূদ্র ও মগ সম্প্রদায় দক্ষিণ অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্ত নিয়ে আবাদ সৃষ্টি করে।"

পলাশী যুদ্ধ-উত্তর পরিস্থিতিতে বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের অস্তিত্ব যখন হুমকির মুখে, তখন দলে দলে মুসলমানরা এসে দক্ষিণের বিরান অরণ্যে বসবাস করতে থাকেন। এভাবেই এসব এলাকায় আবাদ হয়। তবে নতুন করে যেসব মুসলমান বিগত দু'এক শ' বছরের মধ্যে বরিশাল এলাকায় এসে বসতি শুরু করেছে, তারা কোথা থেকে কিভাবে এসেছেন, তা জানা যায়নি।

কোম্পানী আমলে বাকেরগঞ্জের লোকসংখ্যা

মহকুমা	১৭৫৭	১৮০০	১৮৫৭
বরিশাল সদর	৪,০০,০০০	৪,৭৫,০০০	৬,৫০,০০০
দক্ষিণ শাহবাজপুর	১,০০,০০০	১,২৫,০০০	২,০০,০০০
পটুয়াখালী	১,৫০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০
পিরোজপুর	১,৫০,০০০	২,০০,০০০	৩,৫০,০০০
মোট	৮,০০,০০০	১০,০০,০০০	১৫,০০,০০০

অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়

ইংরেজ কোম্পানীর শাসনের সময় বরিশালে প্রধানত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে খৃষ্টান মিশনারীদের আগমন ঘটে। পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই মিশনারীরা তাদের ধর্ম প্রচারে উৎসাহিত হয়ে উঠেন, এ সময়ই একদল পর্তুগীজ পাদ্রী শিবপুরে বসতি স্থাপন করেন। ১৭৬৪ সালে প্রথম ধর্ম প্রচারক যাযক র‍্যাফেল জ্যা এনজস শিবপুরে আসেন। ফাদার গণজালবেস প্রথম শিবপুরে গীর্জা নির্মাণ করেন। ডমিন গো ডি. সালভার পুত্র ম্যানুয়াল ১৮২৩ সনে পিতার উইল অনুসারে পুরনো গীর্জা ভেঙ্গে বর্তমান গীর্জা নির্মাণ করেন। ১৮৭২ সালে পাদ্রী শিবপুরে বসবাসকারী খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৮০০।

ইংরেজ শাসনামলে বেশ ক'জন ইংরেজ বণিক বরিশালে আসেন। এদের মধ্যে রবিনসন আসেন ১৭৬৬ সনে। এর দশ বছর পর তার মৃত্যু হয় এবং

বরিশালেই তাকে সমাহিত করা হয়। মিঃ গিল নামক একজন ইংরেজ বরিশালে নৌকা নির্মাণ করতেন। মিঃ জর্ডন একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী ছিলেন। মিঃ আই লুকাস দক্ষিণ শাহবাজপুরে জমিদার ছিলেন।

পাদ্রী উইলিয়ম ক্যারির সময় (১৭৯৩–১৮৩৪) বরিশালে খৃষ্টান মিশনারীদের আগমন ঘটে। মিঃ ক্যারির পৌত্র ১৯ শতকের মধ্যভাগে বরিশাল প্রোটেস্ট্যান্ট গীর্জার যাজক ছিলেন। ১৮২৯ সালে উইলিয়াম ক্যারি জন স্মিথকে বরিশালে ফাদার নিযুক্ত করেন। তবে মিঃ বেভারিজ বলেছেন, ১৮৩০ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্যারেটের সময় বরিশালে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারিত হয়। বরিশালে ১৮২৯ সালে ব্যাপটিষ্ট চার্চ ও ১৮৪৫ সালে ইংলিশ গীর্জা নির্মিত হয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চ ১৮৪৫ সালে নির্মিত হয়। ১৯০৪ সালে অক্সফোর্ড মিশন চার্চ নির্মিত হয়। বরিশালের উত্তর অঞ্চল গৌরনদী ও তৎসংলগ্ন কোটালী পাড়ার নমশূদ্রদের মাঝে কয়েক শ' লোক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। তবে হিন্দু জমিদারগণ খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে বাধা দেন। ১৮৫৫ সালে বার পাইকার কয়েকটি খৃষ্টান পরিবারকে জমিদাররা আটকে রাখে। এ নিয়ে মামলা হয় ও ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তবে জেলার মুসলমানদেরকে খৃষ্টান মিশনারীরা তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, মুসলমানেরা দলে দলে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে ইসলাম ত্যাগ করে কেউ কেউ খৃষ্টান হয়েছেন। তবে মুসলমানরা মিশনারীদের তৎপরতাকে ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখেছেন। এ জন্য তারা সবসময় মিশনারীদের কুপ্রভাব এড়িয়ে চলেছেন। ধর্মীয় উত্তরাধিকার হিসেবেই মুসলমানরা খৃষ্টানদের ধর্মীয় বিকৃতি সম্পর্কে অবহিত। ইসলাম হচ্ছে সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সত্য ধর্ম। সে কারণে কেউ মিশনারীদের প্রভাবে পড়েনি। তবে মিশনারীদের অপপ্রভাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুসলমান আলিমরা সতর্ক প্রচার চালিয়েছেন।

জনগণের জীবনধারা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বরিশালের জনগণ জীবন ধারণে সহজ-সরল ও জীবনাচরণে পরিশ্রমী। পেশায় বেশির ভাগই কৃষক ও জেলে। তবে, তাঁতী সহ অন্যান্য পেশার লোকও কম নয়। হিন্দুরা প্রধানত ব্যবসায়ী। তবে নমশূদ্ররা কৃষিকাজে পারদর্শী। খৃষ্টানরা প্রধানত চাকুরীজীবি।

ইংরেজদের আগমনের আগে জেলার সাধারণ মানুষ চুরি, খুন, ডাকাতি, দাঙ্গা ও জালিয়াতি প্রায় জানতই না। তারা ছিল পরোপকারী, অসাম্প্রদায়িক, মানব হিতৈষী, সাহসী, ধার্মিক ও আল্লাহ্ ভক্ত। কঠিন শ্রমে প্রকৃতির দানে তাদের জীবিকার সংস্থান হতো বলে তারা ছিল কিছুটা বন্ধনহীন।

দুটি কারণে এ জেলার জনগণের চারিত্রিক অবক্ষয় সূচিত হয়। এক. ১৮৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের ব্যর্থতায় ইংরেজরা সর্বাস্থায় মুসলমানদের শত্রু ভাবতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যারা আজাদী পুনরুদ্ধারের সময় অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল ইংরেজ শাসকরা তাদেরকে পাইকারি হারে খুনী, ডাকাত ইত্যাদি বিশেষণে চিত্রিত করে। সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের পাইকারী হারে ফাঁসীতে ঝুলাতে থাকলে সম্ভবত প্রাণ ভয়ে দলে দলে মুসলমান বরিশালের কৃষিভিত্তিক অরণ্য জনপদে এসে বসবাস করতে থাকে। এ কারণে ইংরেজ শাসকরা এ জেলার অধিবাসীদেরকে সাধারণত ভীতি ও সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। তাদেরকে ডাকাত ও দাঙ্গাবাজ হিসেবে চিত্রিত করে।

ইংরেজ শাসকরা তাদের বণিকতন্ত্রের সহায়ক শক্তি হিসেবে হিন্দু সুদখোর মহাজন, আমলা মুৎসুদ্দীদের গড়ে তোলে। অন্যদিকে শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলমানদের জায়গা-জমি কেড়ে নিয়ে হিন্দু জমিদার সৃষ্টি করে। তবে এসব জমির কৃষক ছিল মুসলমান। এ কারণে, 'বিদ্রোহী' কৃষক প্রজাদের

প্রতি শাসক মহলের কোন দরদ থাকার কথা ছিল না। ফরিদপুর, ঢাকা, নোয়াখালী থেকে অসংখ্য মুসলমান বরিশালে বসতি স্থাপন করেছেন। ঢাকার মুন্সিগঞ্জ থেকে বরিশালে এসে যারা বসতি স্থাপন করেছেন, তারা প্রধানত ব্যবসায়ী। এঁরা হিন্দু বণিকদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন। আর নোয়াখালী এলাকার লোকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বীনী তালিমের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরা প্রধানত অভিজাত মুসলমান। সুতরাং দাঙ্গাবাজ, খুনী কিংবা ডাকাত হিসেবে বরিশালের অধিবাসীদের চিহ্নিত করা ইংরেজ শাসকদের রাজনৈতিক অশুভ মানসিকতারই পরিচায়ক। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বরিশালে এসে ১৮৫৫ সালে লিখেছেন ঃ 'এ বরিশাল অতি বিশাল। এমন দস্যুভয় আর কুত্রাপি নাই। লাঠালাঠি কাটাকাটি নিয়তই হইতেছে।' (বরিশালের ইতিহাস)।

কিন্তু গুপ্ত মহাশয় নিজে একজন মুসলিম বিদ্বেষী এবং ইংরেজ সরকারের অনুগত। ইংরেজ শাসক ও তাদের দালালদের জন্য জেলার জনগণ যদি ভীতির সঞ্চার করে থাকে, আর সে কারণে যদি তাদের শাসক মহলের পক্ষ থেকে নানা অপবাদ সইতে হয়, তাহলে সেটা যে উদ্দেশ্যমূলক তা তো স্পষ্ট। ইংরেজদের ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা এবং তাদের পাইক-পেয়াদা নায়েব-জমিদারদের জটিল ও প্রতারণামূলক ভূমি প্রশাসনের কারণে কৃষিজীবি সাধারণ মুসলমান প্রজারা নানা প্রকার ভোগান্তিতে ভুগেছেন। মামলায় ঝুলেছেন। হিন্দু উকিল-মোক্তার সেরেস্তাদারদের টাকা দিয়ে ফতুর হয়েছেন। অপ্রতিরোধ্য জনশক্তিকে দমন করার জন্য ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের চরিত্র হনন করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অনুষঙ্গ এবং জমিদারী প্রথার রক্ষক থানা-পুলিশ ব্যবহার করে বেয়াড়া মুসলমানদের 'দাগী আসামীতে' পরিণত করেছেন। বৃটিশের পুলিশ ও প্রশাসন উভয় পক্ষ থেকে অর্থ খেয়ে দু' পক্ষকেই ধান কাটায় উৎসাহিত করেছে। ফলে জমির দখল কিংবা ধান নিয়ে লাঠালাঠি, খুনোখুনী হয়েছে।

বরিশালের অধিবাসীরা সাধারণভাবে শান্তিপ্রিয়। তবে পারিপার্শ্বিকতা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনচেতা করে তুলেছে। মানুষের জীবনকে তার পারিপার্শ্বিকতা বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া জনপদের জীবন-যাপন

ও জীবিকা অন্বেষণের ধারা মানুষকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এ জেলায় জনবসতির শুরুতে কৃষিই ছিল বৃহত্তর জনগণের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। এর সাথে সাথে তারা মাছ ধরা সহ ছোটখাট কুটির শিল্পেও যুক্ত ছিলেন। মুসলিম শাসনের দীর্ঘ সময় জনজীবনে জটিলতা ছিল কম। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতও ছিল অনুল্লেখ্য। কিন্তু ইংরেজদের হাতে জাতীয় আজাদী হৃত হবার পর থেকে জনজীবন নানা রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপরিচিত সমস্যার মুখোমুখী হয়। যে জমি ও নদীর উপর সাধারণ মানুষের অধিকার ও বিচরণ ছিল প্রায় অবাধ, সেই জনগণই দেখল, প্রাকৃতিক সম্পদ, জমি স্থানীয় দালাল জমিদারদেরকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। রাতারাতি কৃষিজীবি জনগণ দেখল যে, তারা তাদের জমিতে জমিদারদের খাতকে পরিণত হয়েছে। অনাদায়ী খাজনার দায়ে তার চাষের জমি নিলামে উঠছে। মাল ক্রোক করে জমিদারের পাইক-পেয়াদারা তাকে সর্বস্বান্ত করছে। এ ক্ষেত্রে তার কোন প্রতিকার চাইবার অধিকার নেই। কৃষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ফসলী জমিতে ইংরেজদের প্রয়োজনে নীল চাষ করানো হয়। অনিচ্ছুক বা বিদ্রোহী কৃষককে নির্যাতনের শিকার হতে হতো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়কাল থেকেই এ দেশের ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ কারণে ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা হয়। জমির রেকর্ড-পত্রে অনিয়ম ও অরাজকতার সূচনা হয়। ফলে জমির টাইটেল নির্ণয়ের জন্য জনগণকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। জমিদারদের অনুগত প্রভাবশালী লাঠিয়াল বা ভূ-স্বামীরা কৃষি জমির ফসল প্রায়শঃই জবরদস্তি কেটে নিত। এটা বাধা দিতে গিয়েই বরিশালের কৃষকদের হতে হয়েছে লাঠিয়াল, হিংস্র এবং দুর্ধর্ষ। জমা-জমির মালিকানা নির্ণয়ের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাই স্থানীয় অধিবাসীদের দাঙ্গাবাজরূপে চিহ্নিত করেছে।

মূলত বরিশালের জনগণ সরল, সাহসী, অতিথিপরায়ণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামী এবং প্রধানত স্পষ্টবাদী।

ধর্মীয় দিক থেকে বরিশালের জনগণ সহনশীল উদার ও অসাম্প্রদায়িক। তবে নিজের ধর্ম সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ও ইসলামের নবী-রসূল-ফেরেশতার সম্মান

রক্ষায় আপোসহীন সংগ্রামী। বৃটিশ শাসনের আগে এদেশে ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িকতার তেমন কোন দৃশ্য চোখে পড়েনি। বৃটিশ শাসকরা নিজেদের স্বার্থে 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতিতে ধর্মীয় বিভেদকে উস্কে দিয়ে হিন্দু মুসলমানের মাঝে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বাঁধিয়ে দিয়েছে। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনীতিকীকরণের মাধ্যমে এই সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখে। এ উপমহাদেশে বহিরাগত আর্যদের অভিবাসন প্রক্রিয়ার শুরুতে তারা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করে। তারপর তাদের সংঘাত বাধে বৌদ্ধদের সাথে। আর্যদের আগ্রাসনের মুখে বৌদ্ধদেরও নির্মূল হতে হয় এ উপমহাদেশ থেকে। এরপর আসে মুসলমানদের পালা।

ইসলাম গতিশীল জীবন ব্যবস্থা। পূর্ণাঙ্গ ইসলাম আগমনের সমসাময়িক কাল থেকেই এ উপমহাদেশে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে। ইসলামের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা এবং উদার মানবিকতা এ দেশের জনমানসকে প্রভাবিত করে। প্রচলিত ধর্মগুলোকে অভিঘাতে অভিঘাতে জর্জরিত করে দেয়। এর ফলে তাদের ধর্মের বহু সংস্কার সাধন হয়। বৈদিক ব্রাহ্মণরা এ কারণেই ইসলামকে কোন অবস্থায়ই সহ্য করতে চায়নি। এই মানসিক অসহিষ্ণুতার কারণেই এ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ঘটে।

জনসংখ্যা

এ জেলার প্রথম লোক গণনা শুরু হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। তখনকার জেলার সীমানা ছিল আরও বিস্তৃত। এর আগে অবশ্য রাজস্ব জরিপকারীদের ছাড়াও জনসংখ্যার বেশ কিছু পরিসংখ্যান নেয়া হয়েছিল। তবে রাজস্ব জরিপকারীরাই এ জেলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জরিপ করেন। তাঁরা এ জেলার প্রতিটি ঘরের পরিসংখ্যান পর্যন্ত দিয়েছিলেন। তবু এর প্রায় দশ বছর পরে অনুষ্ঠিত প্রথম সরকারী জনসংখ্যা পরিসংখ্যানের সাথে এর পার্থক্য ছিল শতকরা ১৪০ ভাগ। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়কার জন-অধ্যুষিত এলাকাসমূহে অনুষ্ঠিত লোক গণনা ও অন্যান্য সময়ের লোক গণনার মধ্যবর্তী কালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করলে ধারণা হয় যে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এ জেলার মোট জনসংখ্যা ১০

লক্ষের বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম লোক গণনা অনুসারে এ জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ১৮,৮৪,৬৯৭ জন (পটুয়াখালী সহ)। এ সংখ্যাকেও অনেকে বেশি ধরা হয়েছিল বলে মনে করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ত্রিশ বছরে এ জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ২৮ ভাগ।

১৯২১ সালের ১৮ই মার্চে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে ষষ্ঠ লোক গণনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১১-১৯২১-এর দশকের মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগে অনেক লোক মারা যায়। এছাড়া অসহযোগ আন্দোলনের ফলে লোক গণনার কাজ নানাভাবে ব্যাহত হয়। ১৯২১ সালে এ জেলার লোকসংখ্যা ছিল ২৬,২৩,৭৫২ জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮.২ ভাগ।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড়-সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে এ জেলার মারাত্মক ক্ষতি হয়। ৭৫ হাজার লোক পানিতে ডুবেই মারা যায়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়ের পরের দশকে (১৮৮১-১৮৯১) জনসংখ্যার পরিসংখ্যাণে দেখা যায়, দক্ষিণ শাহবাজপুর (ভোলা) মহকুমার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ২১.৭ ভাগ। ১৮৯১-১৯০১-এর দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৭.৪ ভাগ। ১৯১১-১৯২১-এর দশকে জনসংখ্যা পরিসংখ্যাণে দেখা যায়, জনসংখ্যা পূর্বের দুটি দশক অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যার পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী এ জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ২৯,৩৯,০৫০ জন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে তখন ৬৭,১০৯ জন শহরে বাস করত এবং গ্রাম এলাকায় বাস করত ২৮,৭১, ৯৪১ জন।

১৯৪১ সালের জনসংখ্যা পরিসংখ্যানে এ জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৫,৪৯,০১০ জন। ১৯৫১ সালের লোক গণনা হচ্ছে এ উপমহাদেশের নবম এবং বিভাগোত্তরকালের প্রথম। ১৯৫১ সালে এ জেলার জনসংখ্যা ছিল ৩৬,৪৬,০৫৮ জন। ১৯৬১ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২,৬১,৭৬৭ জন (পটুয়াখালী সহ)।

১৯৪৭ সালের লোক গণনা অনুসারে এ জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৯,২৮,৪১৪ জন (পটুয়াখালী বাদে)। সর্বশেষ পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী এ জেলার লোকসংখ্যা হচ্ছে ৪৬,৬৬,৭২৪।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলের শেষদিকে বরিশাল জেলা থেকে পটুয়াখালী মহকুমা বিভক্ত করে আলাদা জেলা গঠনের পর স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে এবং বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও ভোলাকে আলাদা জেলারূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এ সংখ্যা পটুয়াখালী বাদে বৃহত্তর বরিশালের।

এ জেলার জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আরাকানী, মগ এবং কিছু নেটিভ খৃষ্টান রয়েছেন। ১৮০০ শতকের শেষের দিকে আরাকানী মগরা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। তবে এরা শান্তিপ্রিয় কৃষক এবং স্থানীয় জনগণের সাথে সদ্ভাব সম্প্রীতি রক্ষা করে চলে। জেলার হিন্দুরা প্রধানত নমঃ সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা আর্য-ব্রাহ্মণদের মতো বৈদিক পূজা-অর্চনায় তেমন একটা আগ্রহী নয়। এরা বরং লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান। মনসা পূজা, শীতলা পূজা, কালী পূজা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত। এ জেলার সাধারণ হিন্দুদের একটি বিরাট অংশ শ্রী চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব ধর্মের ভক্ত। এ জেলার নীচু শ্রেণীর চণ্ডালদের মাঝে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বরিশাল শহরে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের গীর্জা রয়েছে। উল্লেখ্য, এ জেলায় খৃষ্ট ধর্মের যতটুকু বিস্তৃতি ঘটেছে, তা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় এবং বৃটিশ শাসকদের সক্রিয় আনুকূল্যে। 'বাকেরগঞ্জের ইতিহাস' লেখক মিঃ বিভারীজ মনে করেন যে, সমুদ্রের প্রতি হিন্দুদের ধর্মীয় অনীহার কারণে তারা এ জেলায় বসতি স্থাপনে অনাগ্রহী ছিল। মিঃ বিভারীজের মতে, হিন্দু শাসন ও সংস্কৃতি ধ্বংসের পর বাকেরগঞ্জের অনেক এলাকা ছিল জনবসতিহীন। জেলার অনেক এলাকা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সৃষ্টি। পুরনো অনেক জায়গা প্রায় হাল আমল পর্যন্ত জংগলে ঢাকা ছিল। তা ছাড়া পুরনো হিন্দু সভ্যতা বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে তেমন বিস্তৃত হতে পারেনি। মুসলমানরাই এই জন বিরল এলাকায় নতুন বসতি গড়ে

তোলে। মিঃ বিভারীজের এই বক্তব্য মেনে নিলে এ কথা বলা যাবে না যে, এ জেলার অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত। এ জেলার অধিকাংশ মানুষই সম্ভবত মুসলমান হয়েই এসে নতুন বসতি স্থাপন করেছেন। শেখ, সৈয়দ, পাঠানরা তো বাইরে থেকেই এসে বসতি স্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতোই এ জেলার সাধারণ মুসলমানরা কোন না কোন পীরের মুরীদ। এককালে নোয়াখালী এলাকার ইসলামী শিক্ষিত ব্যক্তিরা দলে দলে বরিশাল এলাকায় আসতেন। তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য যদিও ছিল জীবিকার অন্বেষণ, তবু দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেয়ার মহৎ উদ্দেশ্যও তাঁদের ছিল। তাঁরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও সমৃদ্ধ অঞ্চল বলে বরিশালে আসতেন। বছরের অধিকাংশ সময়ই তারা দ্বীনি ইলমের তালিম দেয়ার জন্য প্রবাসী জীবন কাটাতেন। অনেকে বরিশাল এলাকায় বিয়ে-শাদী করে সংসারী হতেন। এসব মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা প্রচারকে একটি মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বচ্ছল গৃহস্তের বাড়িতে এঁরা লজিং থাকতেন। আর এলাকার ছেলেমেয়েদের দ্বীনী ইলম দান করতেন। ইসলামী মসলা-মাসায়েল, শরীয়তের নানা খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু, দাফন-কাফন ইত্যাদি নানা দৈনন্দিন কাজে মাওলানা-মৌলবীদের ভূমিকা ছিল একক ও অপরিহার্য। অনেকে স্কুলের আরবী-ইসলামী শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। নামমাত্র হাদীয়া পেয়েই এঁরা খুশি থাকতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম। ফলে এঁরা ছিলেন সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ছারছীনা মাদ্রাসার সুবাদে সারা জেলায় অসংখ্য মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এসব মাদ্রাসা থেকে শত শত আলিম প্রতি বছর বের হচ্ছেন। এঁরাই এখন জেলার প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষার দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া প্রায় সব গ্রামেই ইবতিদায়ী ও দাখিল মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এর সুবাদে এখন দ্বীনী শিক্ষা ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে বরিশালে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস লিখতে হলে নোয়াখালী জেলা থেকে আগত প্রবাসী মিশনারীদের ভূমিকা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। পাকিস্তান পূর্বকালে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে সারা জেলায় ইসলামী শিক্ষা প্রচারে তাঁরা যে পথিকৃৎ ভূমিকা

পালন করেছেন, তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সামান্য হাদীয়ার বিনিময়ে তাঁরা অকাতরে ইসলামী শিক্ষা দিয়েছেন। এবং তাঁদের তেমন কোন দাবী ছিল না। স্বেচ্ছায় যে যতটুকু দিয়েছে, তাতেই তাঁরা তুষ্ট থেকেছেন। এদের অনেকেই বরিশালের জনজীবনের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন, স্থানীয় জনগণের সুখ-দুঃখের সাথী হয়েছেন। অনেকে বরিশালেই ইন্তেকাল করেছেন। বরিশালের মাটিতেই ঐ মহান মুসাফিরদের দেহ মিশে আছে। স্থানীয় জনগণ গভীর মমতায় এখনও ঐ ইসলাম প্রচারক-বুযুর্গদের মাযার আগলে আছেন। এখনও বরিশালের বহু মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক রয়েছেন নোয়াখালী এলাকার।

নোয়াখালী এলাকায় ইসলামের আলো সম্ভবত আগেই বিকশিত হয়েছিল। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অন্যান্য লাভজনক পেশা গ্রহণ না করে যাঁরা দীনী শিক্ষা ছড়িয়ে দেবার মিশন গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মহান ও গৌরবের। বরিশাল এলাকায় মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় এসব আলিমের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। এমন কোন গ্রাম ছিল না যেখানে এসব আলেমের পদচারণা পড়েনি। বস্তুত বরিশালের জনগণকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে নোয়াখালীর প্রবাসী আলিমদের ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। বরিশালের প্রতি গ্রামে গ্রামে যে মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ দেখা যায়, তার পেছনেও এসব আলিমের ভূমিকা ছিল প্রচুর। এঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলেমেয়েদের দ্বীনী শিক্ষাদানের গুরুত্ব প্রচার করে অভিভাবকদের সম্মত করিয়েছেন।

গোটা বাংলাদেশের মতোই বরিশালে পীর-বুযর্গ, মওলানা-ধর্মীয় শিক্ষাবিদ, মসজিদের ইমামদের সামাজিক ভূমিকা অগ্রগণ্য। পীর ও হাক্কানী আলিমদের প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা শুধু মুসলমানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, হিন্দু সম্প্রদায়ও পীর-আলিমদের যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এলাকায় যখন কোন পীর সাহেব তশরীফ আনেন, তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণলাভের প্রত্যাশায় পীরদের কাছে ছুটে আসে। ইসলামী জলসা, মাহফিল প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এরা নীরব শ্রোতা। অনেক হিন্দুকে পীরদের

কাছে নযর-নেওয়ায নিয়ে আসতে দেখা যায়। অনেকে বিমারী থেকে মুক্তিলাভের জন্য পানি পড়া ও তাবিযাদিও গ্রহণ করে থাকেন। মোদ্দাকথা, হিন্দুরা ধর্মীয়ভাবে ভিন্নবৃত্তে অবস্থান করলেও মুসলমানদের পীর-আউলিয়াদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে। এটা ইসলামের উদারতা ও সার্বজনীন আবেদনের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

জেলার মুসলমানদের শতকরা প্রায় এক শ' ভাগই সুন্নী মুসলমান এবং ইমাম আবু হানিফা (র)-এর পন্থী। তবে শিয়া মুসলমানদের অনুসরণে 'মুহররম'-এর অনুষ্ঠান পালন করতেও দেখা যায়। শহর এলাকায় মুহররম পালনের আগ্রহ বেশি। বিশেষত বিহারী ও উর্দুভাষী জনগণই মুহররম অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। পাকিস্তান-পরবর্তীকালে মুহররমের আয়োজনে কিছুটা ভাটা পড়েছে। মুহররম-অনুষ্ঠানে সুন্নী মুসলমান তরুণ-যুবকরাও অংশ নিয়ে থাকে। হযরত ইমাম হোসেনের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়েই তাদের এই অংশ গ্রহণ। জেলার মুসলমানরা অতিশয় ধর্মপ্রাণ। ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস আন্তরিক। ইসলামের যাবতীয় অনুশাসনের প্রতি তাদের রয়েছে সীমাহীন অনুরাগ। ইসলামের অবমাননায় যেমন তাঁরা ঈমানী তেজে গর্জে উঠেন, তেমনি ইসলামের বিজয়ে তাঁরা উৎফুল্ল হন। ইসলামের নৈতিক মানদণ্ডের যা বর্জনীয় তারা তা পরিহার করে চলতে অভ্যস্ত। সামাজিক, অশ্লীলতা, ঘোড় দৌড়, জুয়া, সমাজ বিরোধী যাত্রা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আলিমদের নেতৃত্বে জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে মোটেও পিছপা হন না। এ ধরনের নৈতিকতাবিরোধী স্থূল আনন্দ-উল্লাসের অনুষ্ঠান আলিমদের প্রতিরোধের মুখে বহুবার ভেংগে গেছে।

বৃটিশ শাসনে হিন্দুরা যখন সামাজিক সুবিধাদির ক্ষেত্রে ষোলআনা একক - ভাবে ভোগ করত, তখন তারা নানাভাবে মুসলমানদের উৎপীড়িত করত। স্কুলে মুসলমানদের ভর্তির ব্যাপারে হিন্দু শিক্ষক ও সমাজপতিরা নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখত। যদিও কোন মুসলমান ছাত্র হিন্দু নিয়ন্ত্রিত স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেত, তাকে প্রথম সারিতে বসার কোন সুযোগ দেয়া হতো না। এ ছাড়া নানারূপ বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক আচরণে মুসলমান ছাত্রদের উৎপীড়িত

করা হতো। মুসলমানদের মসজিদের সম্মুখ দিয়ে ঢোল বাদ্য বাজানো এবং হিন্দুদের ধর্মীয় উল্লাস করার বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। কুলকাঠীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড এ সূত্রেই ঘটেছিল। তবে হিন্দুদের সামাজিক নিপীড়ন থেকে সাধারণ মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য আলিমদের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য।

মাদ্রাসা–মক্তব প্রতিষ্ঠা, আলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা দানকে জেলার জনগণ ধর্মীয় অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। তাঁরা সরকারী সাহায্য ছাড়াই নিজস্ব প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থে মক্তব মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী শিক্ষার ধারা বহাল রেখেছেন। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই জুমুআ মসজিদ আছে। প্রতি জুমুআ বারে জামায়াতে নামায পড়া জেলাবাসীর ঐতিহ্য। জুমুআ মসজিদে শুধু নামাযই পড়া হয় না। সামাজিক বিষয়–আশয় নিয়েও এখানে কথাবার্তা হয়। বিশেষ করে প্রতিবেশীদের মধ্যেকার ঝগড়া–ফাসাদ, শরীয়ত বিরোধী কাজকর্ম ইত্যাদির বিচারাদালতও হচ্ছে এই জুমা মসজিদ। এমন কি বিয়ে–শাদী সংক্রান্ত বিরোধ, তালাক ইত্যাদির ব্যাপারেও এই মসজিদেই ফায়সালা হয়ে থাকে। সুতরাং এখনও এ এলাকায় মসজিদ হচ্ছে সামাজিক ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্রস্থল। যে কোন শুভ কাজ শুক্রবারে শুরু করার রেওয়াজ রয়েছে। সামর্থ্য অনুযায়ী মিলাদ পাঠ করে কাজ শুরু করা হয়। যে কোন ভালো কাজে আলিম–পীর ইমামদের দোয়ার গুরুত্ব সর্বত্র স্বীকৃত। নবজাতকের কানে আযানের শব্দ পৌঁছে দেবার ইসলামী বিধান পুরোপুরি পালন করা হয়। এ জেলার নারীরা ইসলামের প্রতি আরও নিষ্ঠাবান। তাঁরা পর্দার সীমারেখা মেনে চলেন। সাধারণত বেপর্দা চলাফেরা করেন না। তবে কেউ বেপর্দা চলাফেরা করলে তার বিরুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক চাপ আসে। যেসব অভিভাবক অর্থাভাবে তাদের কন্যাদের আধুনিক শিক্ষা দিতে অপারগ, তাদেরকে অন্তত ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা এবং পবিত্র কুরআন তিলওয়াতের শিক্ষাটুকু দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। আজও কনে দেখার সময়, কনের কুরআন পাঠের অভ্যাস আছে কি না তা যাচাই করা হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, ধনী–নির্ধন নির্বিশেষে সকলেই তাদের কন্যাদের ইসলামী শিক্ষাদানে আগ্রহী। অনেক নিরক্ষর মায়েরাও নবী–রসূল–কারবালার কাহিনী এবং নবী–নন্দিনীদের কাহিনী জানেন। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরকে

রাক্ষস-খোক্কসের গল্পের বদলে ইসলামের উজ্জীবনী কাহিনী শোনান। বরিশালে ইসলামের ভিত্তি যে কতটা মজবুত, এ থেকে তা অনুধাবন করা যায়।

পবিত্র রমযানে এ জেলার শিশু-নারী-আবাল-বৃদ্ধ সকলেই রোযা রাখেন। গ্রামে গ্রামে জামায়াতে তারাবীর নামায আদায় করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুরআনে হাফিযের ইমামতিতে খতম তারাবীহ পড়া হয়। এ মাসে দান-খয়রাতে সবাই আগ্রহী হয়ে উঠেন। ঈদ-কুরবানীতে উৎসব মুখর হয়ে উঠে জেলার প্রতিটি পর্ণ কুটিরও।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মিঃ গ্যারেট জেলার কালেক্টর থাকার সময় খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের কাজকর্ম শুরু করে। মিঃ গ্যারেট ছিলেন একজন ব্যাপ্টিস্ট খৃষ্টান মিশনারী। স্থানীয় খৃষ্টানদের অনেকে ছিলেন ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। চার্চ অব ইংল্যাণ্ড ও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টানও ছিলেন কিছু সংখ্যক। শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টার ফলে গৌরনদী এলাকার নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু মুসলমান কিংবা বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টান মিশনারীরা তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এ থেকে খুব সহজেই বলা যায় যে, এ জেলার মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস গভীর দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৃটিশ শাসনের দীর্ঘ সময়ে প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কোন মুসলমানই স্বীয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। মুসলমানরা যদি ব্যাপক অর্থে ধর্মান্তরিত হতেন, তাহলে তাঁদের শিথিল ধর্ম বিশ্বাসের কারণে অন্তত দু'চারজন হলেও শাসক জাতি-খৃষ্টানদের ধর্ম গ্রহণ করতো। তা যখন হয়নি, তখন বুঝতে হবে যে, ঐতিহাসিকরা যেভাবে বলেছেন জেলার অধিকাংশ মুসলমান কখনও ধর্মান্তরিত ছিলেন না। তারা হয় বহিরাগত মুসলমান নতুবা প্রাচীন কোন তৌহিদবাদী ধর্মের বিস্মৃত শাখা তারা অনুসরণ করত।

এ জেলার প্রাচীন মসজিদের মধ্যে কসবা মসজিদ, শিয়ালঘুনি ও কমলাপুর মসজিদ উল্লেখযোগ্য। শিয়ালঘুনি মসজিদটির দূরত্ব হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র)-এর আস্তানা ও মাযার কালিশুরী থেকে পাঁচ-ছ' মাইল হবে। মাঝখানে একটি নদী দ্বারা বিভক্ত গ্রাম দু'টি। তবে কালিশুরী বা তার কাছাকাছি কোন প্রাচীন পাকা মসজিদ চোখে পড়ে না। থাকলেও নদী গর্ভে সম্ভবত তা বহু গ্রাম

জনপদের মতোই বিলুপ্ত হয়ে থাকবে। বৃহত্তর বরিশালের অংশ বর্তমান পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার গোয়ালিয়া বাঘা বা শানেশ্বর গ্রামের চৌধুরীবাড়ীতে একটি প্রাচীন আমলের পাকা মসজিদ আছে। এ ছাড়া একই থানার ধুলিয়া গ্রামের কাজিবাড়ীর মসজিদটিও একটি প্রাচীন কীর্তি। তবে এটি কিছুদিন আগে তেঁতুলিয়া নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। বরিশাল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মসজিদসহ তেমন কোন মুসলিম স্থাপত্য চোখে পড়ে না। এর একটি কারণ এই হতে পারে যে, অতি প্রাচীন কীর্তিগুলো অব্যাহত নদীভাংগনের তোড়ে বিলুপ্ত হয়ে থাকবে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা বাহ্যিক চাকচিক্য ও মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধনকে তেমন একটা গুরুত্ব দিতেন না। উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি শুরু হয়। সুতরাং এ এলাকায় প্রথম যুগের মুসলমানরা সম্ভবত মসজিদে এমন কোন স্থাপত্য সংযোজন করার উদ্যোগ নেননি, যা ইসলামের প্রাচীনত্বকে নির্দেশ করতে পারে। কেননা প্রথম যুগের মুসলমানরা জীবন-যাপনে ছিলেন সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর।

গৌরনদী থানার কস্‌বা গ্রামের মসজিদটি ষোল শতকের শুরুতে সাবি খান কস্‌বা গ্রামে নির্মাণ করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এ মসজিদের নির্মাণ শৈলীতে খানজাহান আলীর ষাট গম্বুজ মসজিদের নির্মাণ শৈলী অনুসরণ করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের কালকে যদি ইসলাম প্রচারের সময় নির্ধারণের অন্যতম ভিত্তিরূপে ধরে নেয়া হয়, তাহলে এ দেশে ইসলাম অগমনের বয়স পাঁচ-ছ' শ বছরের বেশি হবে না। কিন্তু এটা স্বীকার করে নেয়া যায় না। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের আদি ইতিহাসের সূচনা যেহেতু ভারতে মুসলিম অভিযানেরও অনেক আগে, সে কারণে এটা কোন মতেই মেনে নেয়া চলে না।

জনবসতি ঃ প্রতিরোধ সংগ্রাম

উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জে মোট জনসংখ্যার ৭০ ভাগ ছিলেন মুসলমান। এই জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগই আবার কৃষক। এ ছাড়া মুসলমানের মধ্যে তাঁতী, জেলে ও বেদে ছিলেন। মুসলমানরা প্রধানত শিয়া ও সুন্নী ছিলেন। যেসব মুসলমান ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, আরব থেকে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে শিয়া মুসলমানের সংখ্যা বেশি ছিল। এঁদের সংস্পর্শে আসার পর স্থানীয় মুসলমানরা অনেকে শিয়া মুসলমানের অনেক রীতিনীতি পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। আঠার-উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাকেরগঞ্জ জেলায় শিয়া মতবাদ শক্তিশালী ছিল। শহরে মুহররমের সময় বর্ণাঢ্য তাযিয়া মিছিল বের হতো। সাধারণ সুন্নী মুসলমানরাও এতে অংশ নিত।

'বাকেরগঞ্জের ইতিহাস' প্রণেতা খোসাল চন্দ্র রায় মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেন, "জাতিভেদ প্রথা তাহাদিগের মধ্যে ছিল না। কিন্তু অধুনা তাহাদিগের মধ্যে এই ভাব একটু-একটু পরিলক্ষিত হইতেছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। দত্তক গ্রহণের বিধি নাই। এ দেশীয় মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প।"

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী একই ধর্মানুসারী মানুষের মধ্যে কোন জাতিভেদ প্রথা থাকার কথা নয়। তবে স্থানীয় হিন্দু জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করলে এই অবক্ষয় সূচিত হয়। এ ছাড়া মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাবার কারণে তাদের মাঝে জাতিভেদ প্রথা শিকড় বিস্তৃত করে। মুসলমান জমিদার, তালুকদারগণ বিবাহ-শাদী তাদের সমপর্যায়ের লোকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখত। বংশের অহমিকায় তারা ছিল অন্ধ। বাকিরা ছিল কৃষক, তাদের আলাদা শ্রেণীতে ফেলে রাখা হতো। তাদের

সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা সামন্ত প্রথার শিকার ছিল। অর্থনৈতিক কারণেই সামন্ত ও ভূস্বামীরা এসব কৃষক শ্রেণীর মুসলমানদের সমাজচ্যুত করে রাখত।

হিন্দু সমাজ

১৮৭২ সালে বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ জেলায় (মাদারীপুর সহ) প্রায় ৯ লক্ষ হিন্দু অধিবাসী ছিল এবং মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ। কোটালীপাড়া ও স্বরূপকাঠিতে হিন্দুর সংখ্যা বেশি ছিল এবং ঝালকাঠিতে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা ছিল সমান সমান। গৌরনদী, উজিরপুর, বানরিপাড়া ও পিরোজপুরের জনসংখ্যার ৪০ ভাগ ছিল হিন্দু। ভোলা ও পটুয়াখালী মহকুমায় হিন্দুদের সংখ্যা ছির মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। সরকারী কর্মচারী, আইনজীবী ও ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু।

খোসাল চন্দ্র রায় লিখেছেন-"হিন্দুগণ জাতিভেদকে পরম ধর্ম বলে মনে করে। তাহারা বালিকাগণের বাল্য বিবাহ পরম ধর্ম ও বিধবা বিবাহ অধর্ম বলিয়া মনে করে। হিন্দুগণের সামাজিক রীতিনীতি অধিকাংশ সন্তোষজনক। মানুষের চিরভূষণ নম্রতা হিন্দু জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে। নারীগণ অত্যন্ত লজ্জাশীলা, গৃহকার্যে অত্যন্ত পটু। ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান দেখান হইয়া থাকে। কিন্তু বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বংশ কুসংস্কারে জড়িত হইয়া পদ গৌরব নষ্ট করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণ এক ভয়ংকর সম্প্রদায়। বহু বিবাহ করা ইহাদিগের মজ্জাগত অভ্যাস। কলমকাঠি নিবাসী ঈশ্বর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ ১০৬টি বিবাহ করেন। ইহাতেও তাহার সাধ পূর্ণ হইয়াছিল না। কলসকাঠি, গারুরিয়া, মাজপাশা, নাগপাড়া, কাশীপুর, নলচিড়া, খলিসাকোটা, উজিরপুর, বার পাইকা, শিকারপুর, গৈলা, বাইযারী, বুড়িহারী, আগলপাশা, তারপাশা, রহমতপুর প্রভৃতি গ্রাম ব্রাহ্মণগণের প্রধান বসতি স্থান।"

খৃস্টান

এ জেলায় খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৪,৬৫৯ জন। গৌরনদী থানার আবকর, ধানসর গ্রামে দেশীয় খৃষ্টানদের প্রধান বাস। স্থানীয় নমশূদ্ররাই ধর্মান্তরিত হয়ে

খৃষ্টান হয়েছে। ১৮৭২ সালে পাদ্রী শিবপুরে ৮০০ খৃষ্টানের বাস ছিল। তাঁরা ক্যাথলিক মতাবলম্বী ছিলেন। ১৮৭২ সালে বরিশালে ২৭ জন ইউরোপীয়ান ছিল। এদের মধ্যে গ্রীক ও আর্মেনীয় পরিবার ছিল।

হেনরী বেভারিজ বাকেরগঞ্জের স্বাধীনচেতা জনগণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, "আমরা যেমন আমেরিকানদের মধ্যে ইংরেজ জাতির কতকগুলো গুণাবলী বেশিমাত্রায় দেখি, তেমনিভাবে আমরা বাংগালীদের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বাকেরগঞ্জের লোকদের মধ্যে মুক্তভাবে দেখতে পাই। আবার আমরা দেখতে পাই, বাকেরগঞ্জের জনগণ বাইরের শক্তির দ্বারা শাসিত হয়নি। সেজন্য তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছে। এ জেলা সবসময় অবহেলিত ও ঘৃণিত ছিল এবং সকল ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। জনগণকে তাদের জংগল ও বিলের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা অনেক স্বাধীনতা ভোগ করছে।"

সুন্দরবন আবাদ

জেসি জ্যাক বলেছেন, ইংরেজ দখলের সময় বাকেরগঞ্জে ৬১০ বর্গমাইল সুন্দরবন ছিল। তবে এ তথ্য সঠিক নয়। তখন বাকেরগঞ্জের এক-তৃতীয়াংশ সুন্দরবনে পূর্ণ ছিল। এসব এলাকার আবাদী বয়স সর্বাধিক দু'তিন শত বছর হবে। ১৮৩০ সালে সুন্দরবন কমিশনার উইলিয়ম ডামপেয়র ও সার্ভেয়ার লেফটেন্যান্ট আলেকজাণ্ডার হজ সুন্দরবন জরিপ করেন।

বরিশালে কৃষক বিদ্রোহ

এ জেলার জনসংখ্যার ৭০ ভাগেরও বেশি ছিল মুসলমান এবং এদের মধ্যে আবার শতকরা ৯০ ভাগ ছিল কৃষক। এরা ছিল পরিশ্রমী ও সাহসী।

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয় ইংরেজ বেনিয়ারা। কোম্পানী শাসনের যুগ শুরু হলে মুসলমানদের উপর নির্মম শোষণ ও নিপীড়ন শুরু হয়। পলাশী যুদ্ধোত্তর পরবর্তী এক শ' বছর ভারতের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানরা বারবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ

ব্যাপারে বরিশালের কৃষকদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ইসলামের চিরন্তন বিদ্রোহের প্রেরণাই সাধারণ কৃষকদের অন্যায়, জুলুম ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সহায়তা করেছে। কৃষকদের বীরত্ব ও জাতীয় চেতনাবোধকে ইংরেজ সরকার, ভূস্বামী ও জমিদারগণ অপব্যাখ্যা করে জনগণের চরিত্র হননের অপচেষ্টা চালায়।

তৃণমূল ভিত্তি থেকে এ দেশের কৃষক সমাজ জীবন বাজি রেখে এসব বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। তবে সিপাহী বিদ্রোহ উত্তরকালে ইংরেজ সরকারের সীমাহীন নির্যাতনের ফলে কৃষক বিদ্রোহ যখন স্তিমিত হয়ে যায়, তখন কৃষকরা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর সূচনা-কাল থেকে যে আজাদী আন্দোলনের সূচনা হয়, সেখানে ইংরেজী শিক্ষিত-জনদেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ঐসব পোড়-খাওয়া কৃষকদের পূর্ব আন্দোলনকে এ সময় মূল্যায়ণ করা হয়নি। অথচ বৃটিশ শাসনের একটি দীর্ঘ সময় স্থানীয় পর্যায়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়েছে, তার সংগঠক ও নেতৃত্বদানকারী ছিল এ দেশের কৃষক সমাজ।

পলাশী যুদ্ধের পর পরই বাকেরগঞ্জের কৃষকগণ বুযর্গ উমেদপুর পরগণার জমিদার রাজ রাজবল্লভকে খাজনা দিতে অস্বীকার করেন। রাজবল্লভ বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করার জন্য বাণ্ডেল হতে একদল পর্তুগীজ নিয়ে আসে। তারা আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করে বিদ্রোহ দমন করে ফেলে।

উত্তর বঙ্গের ফকির আন্দোলনের মতো ১৮ শতকে বরিশালে কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ বণিকরা নদীপথে ঢাকা ও কলকাতায় যাতায়াত করত। বিদ্রোহীরা বণিকদের বাণিজ্য পথে বাধার সৃষ্টি করে। কয়েকজন ইংরেজ বণিক ও গোমস্তাকে তারা হত্যা করে। এ সময় ১৭৬৪ সালে ক্যাপ্টেন রোজকে তারা নৌ-পথে হত্যা করে। বাংলাদেশে প্রথম বরিশালেই ইংরেজ বণিক নিহত হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, বরিশালের জনগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে মানসিকভাবে কত বিরোধী ও প্রতিশোধপরায়ণ ছিল। ইংরেজ বিরোধী যতগুলো বিদ্রোহ

সংঘটিত হয়েছে, তার সূচনা হয়েছে মুসলমানদের হাতে। বিশেষ করে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল, এই এক শ' বছর ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে মুসলমানরাই নেতৃত্ব দিয়েছেন, জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আগে হিন্দুরা কখনও সরাসরি বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে অংশ নেয়নি। বঙ্গভঙ্গ উত্তর হিন্দুদের স্বদেশী আন্দোলন সশস্ত্র ধারায় বিকশিত হলেও তার মূল চেতনা ছিল হিন্দু পুনরুজ্জীবন এবং মুসলিম বিদ্বেষ।

মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজরা রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে বলেই নয়; বরং ইসলামের চিরন্তন শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত না করা। সেই চেতনাই মুসলিম জনগণকে বারবার বিজাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ফকীর মজনু শাহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহে যখন ফকির বিদ্রোহ চলছে, তখন বরিশালে একদল মুসলিম মুজাহিদ ইংরেজ রেসিডেন্টকে আক্রমণ করে। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসও তাঁর এক পত্রে এ তথ্য স্বীকার করেছেন। যারা এ বিদ্রোহে অংশ নেয়, তারা ছিল ফকীর সম্প্রদায়েরই লোক। তবে ঐ আক্রমণ ব্যর্থ হয়। অবশ্য ফকির বিদ্রোহীরা দীর্ঘদিন তাদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। ১৭৮৮-সালে গৌরনদীর নিকট বিদ্রোহীরা ইংরেজ বণিক মিঃ বার্গকে হত্যা করে। সিলেটের কালেক্টর মিঃ উইলিস বরিশালের নদীপথে যাচ্ছিল। বিদ্রোহীরা তার নৌকা আক্রমণ করে। উইলিস কোনমতে পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পায়। ঢাকার কালেক্টর মিঃ ডে বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য একদল সিপাহী প্রেরণ করে। তাদের সাথে সংঘর্ষে এ জেলার বিদ্রোহীদের অনেকে ধরা পড়ে। এদের ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও বরিশালের জেলখানায় বছরের পর বছর বন্দী করে রাখা হয়।

সোলঙ্গীদের বিদ্রোহ ১৭৫৭—১৮৩১

প্রাচীনকাল থেকে বরিশালের উপকূলীয় জনগণ লবণ চাষ করে এসেছে। লবণ ব্যবসা লাভজনক ছিল বলে ইংরেজদের নজর পড়ে। ইংরেজ বণিকরা বিনা

শুল্কে বরিশালে লবণ ব্যবসা শুরু করে। ইংরেজ এজেন্ট দেশীয় লবণ উৎপাদনকারীদের বিনা অনুমতিতে লবণ উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। একটি কৃষক পরিবার এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে লবণ উৎপাদন করে। ফলে ইংরেজ কর্মচারীরা ঐ কৃষক পরিবারের উপর অত্যাচার শুরু করে। এতে কৃষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তারা ইংরেজ সাহেবকে ধরে লবণের তাফালে ফেলে হত্যা করে। দক্ষিণ বরিশালের আইনউদ্দীন সিকদারের নেতৃত্বে ইংরেজ বণিক ও তাদের স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এ সময় একজন ইংরেজ কর্মচারী বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারায়। এই ঘটনায় কয়েক'শ কৃষককে বন্দী করা হয়।

শরিকলের যুদ্ধ

পলাশী যুদ্ধের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলার একদল সৈন্য বরিশালের নাজিরপুর পরগণায় আশ্রয় নেয় বলে জানা যায়। নাজিরপুর পরগণার জমিদার সৈয়দ ইমাম উদ্দীন চৌধুরীর প্রেরণায় পলাশীর সৈন্যরা গৌরনদীর শরিকলে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সৈয়দ ইমামউদ্দীন ইংরেজ কোম্পানীকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নির্দেশে ঢাকার এটর্নী পিট ১৭৭৭ সালে ইমামউদ্দীনকে বন্দী করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। ঢাকার প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য মিঃ রোজ সৈয়দ ইমামউদ্দীনের মুক্তির জন্য হেস্টিংস-এর নিকট আবেদন জানালে তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে ইমামউদ্দীন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। তিনি বাড়ির চারদিকে পরিখা খনন করেন এবং সশস্ত্র কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেন। এ সংবাদ পেয়ে ইংরেজ সরকার একদল সৈন্য প্রেরণ করে। তারা শরিকল দুর্গ আক্রমণ করে। তীব্র সংঘর্ষের পর শরিকল দুর্গের পতন হয়। ইংরেজ সৈন্যরা নলচিড়া খান বাড়ি আক্রমণ করে। ইমামউদ্দীনের বাড়িটি ধ্বংস হয়। কামানের গোলার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি দেয়াল খান বাড়িতে এখনও আছে। শরিকল বন্দরের পশ্চিম পাশে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে।

১৭৮৭ সালের কৃষক বিদ্রোহ

১৭৮৭ সালে, পলাশী বিপর্যয়ের ৩০ বছরের মধ্যে বাকেরগঞ্জে চরম এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হিন্দু জমিদারদের খাজনার ভয়ে শত শত কৃষক ঘরবাড়ি

ছেড়ে সুন্দরবনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শেষ পর্যন্ত কৃষকরা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়। বুজর্গ উমেদপুরের তালুকদার আইনউদ্দীন সিকদার ও কড়াপুরের হায়াত মাহমুদ বিদ্রোহী কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেন। আয়েনউদ্দীন সিকদার বাকেরগঞ্জের নিয়ামতি গ্রামে বাস করতেন।

১৭৮৭ সালের প্লাবনে লবণ উৎপাদন ব্যাহত হয়। অপরদিকে কৃষকের ফসল ধ্বংস হয়। এ সত্ত্বেও কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তারা কৃষকদের উপর খাজনাদি আদায়ে অত্যাচার চালাতে থাকে। আইনউদ্দীন সিকদার তাঁর বাহিনী নিয়ে ইংরেজ বণিক ও গোমস্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ইংরেজ সরকার তাকে ডাকাত আখ্যা দিয়ে রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী করে। এরপর তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্থানীয় লোকদের মতে ইংরেজরা তাঁকে হত্যা করে বিষখালী নদীতে ফেলে দেয়।

করাপুরের জমিদার হায়াত মাহমুদ তাঁর বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এর ফলে বরিশালের নদীপথে ইংরেজ বণিকদের চলাফেরা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ সরকার তাঁকেও ডাকাত আখ্যা দেয়। ১৭৮৯ সালে কোম্পানীর সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফতার করে। গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস অমিততেজা স্বাধীনতা সংগ্রামী হায়াত মাহমুদকে প্রিন্স অব ওয়েলস দ্বীপে নির্বাসন দেন এবং তার জমিদারী কেড়ে নেন।

বালকী শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা

পিরোজপুরের এক কৃষক পরিবারে বালকী শাহের জন্ম। ১৭৮৭ সালে দুর্ভিক্ষ–পীড়িত কৃষকদের সংগঠিত করে তিনি এক দুর্ধর্ষ বাহিনী গঠন করেন। ঝালকাঠি থানার সুগন্ধা গ্রামে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি ইংরেজ বণিক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বালকী শাহ শুজাবাদের কেল্লা হতে কয়েকটি কামান সংগ্রহ করেন। তিনি দুর্গ মধ্যে একটি কামানশালা ও একটি গোলা–বারুদ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। এতে বল্লম ও তরবারি তৈরি হত। ইংরেজ কালেক্টরের বর্ণনায় জানা যায় যে, বন্দুকধারী প্রহরীরা সব সময় ঐ দুর্গ পাহারা দিত। ১৭৯২ সালে বালকী শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

'ফিরিঙ্গিদের রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে,' বলে তিনি প্রচার করেন। কৃষকদের খাজনা দিতে তিনি নিষেধ করেন এবং জমিদারের নায়েব ও গোমস্তাদের বন্দী করেন। এ খবর পেয়ে জমিদার ও ইংরেজ সরকারের সিপাহীরা সুগন্ধা দুর্গ আক্রমণ করে। দুর্গের পতন ঘটলে বালকী শাহ আত্মগোপন করেন।

বরিশালে ওহাবী আন্দোলন

উনিশ শতকের শুরুতে ইংরেজ বিরোধী ওহাবী আন্দোলনের যে তীব্র ঝড় উঠে, তার প্রতিক্রিয়া নোয়াখালী, বরিশালের মতো উপকূলীয় জেলাগুলোকেও আলোড়িত করে। ওহাবী আন্দোলন ছিল পরিপূর্ণভাবে একটি ইসলামী আন্দোলন এবং তার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো। আর এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব ছিল আলিমদের হাতে। এঁরাই যুগে যুগে আত্মত্যাগের মাধ্যমে ইসলামকে উজ্জীবিত করে রেখেছেন। এই আন্দোলন ছিল ইংরেজদের জন্য এক ভয়াবহ সশস্ত্র হুমকি। সারা উপমহাদেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই ওহাবী আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। ইসলাম প্রচারক-ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানরাই ছিলেন এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি। বরিশালের সাধারণ মুসলমান কৃষকরা গোপনে এই জিহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে সুদূর এলাকায় প্রেরণ করেছেন। নিজেরা জিহাদে শরীক হয়েছেন, অনেকে শহীদ হয়েছেন। তবে ওহাবী আন্দোলন বা আজাদী পুনরুদ্ধারের জিহাদে বরিশালের জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতার বিস্তারিত ও প্রামাণ্য কোন তথ্য দুষ্প্রাপ্য। এর কারণ সম্ভবত ও দৃশ্যত দুটি বলে মনে হয়। এক. মুসলমানদের প্রচার বিমুখ মানসিকতা ও ইতিহাস সচেতনতার অভাব। মুসলমানরা যে জিহাদ করেছেন, তা কোন বৈষয়িক স্বার্থে কিংবা রাজ্য লিপ্সার জন্য করেননি। তাঁরা করেছেন, মহান আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্য এবং ইসলামের গৌরব রবি পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য। এ কারণেই তাঁরা নীরবে আত্মত্যাগ করেছেন, তা প্রচার করার কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি। দ্বিতীয়ত. মুসলমানরা বার বার পরাজিত হবার কারণে তখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেরিয়েছেন, তাঁরা ইতিহাস রচনার মতো মানসিক স্থিতি ও পরিবেশ পাননি।

তবে এতটুকু জানা গেছে যে, সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্বে সংগঠিত জিহাদে বরিশালের ৫০ জন মুজাহিদ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। তাঁরা নোয়খালীর মাওলানা নূর মোহাম্মদের নেতৃত্বে সিন্দুর শীতালয় গমন করেন। উল্লেখ্য, ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার চিরাচরিত আবর্তে পড়ে তিনি শহীদ হন। বরিশালের মুজাহিদের অনেকেই শহীদ হন। বরিশালের বাউফল থানার মাওলানা ইসমাঈল বালাকোটের যুদ্ধের সময় পেটে তরবারির আঘাত পান। তবে এরপরও তিনি দেশে ফিরে দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। এ ছাড়া জেলার সাধারণ মুসলমানরা অর্থ দিয়ে গোপনে এই জিহাদকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

ফরাজী আন্দোলন

ফরাজী আন্দোলন উপমহাদেশের সুদীর্ঘ আজাদী আন্দোলনেরই অংশ। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তুল্লাহ। ফরাজী আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের কুসংস্কার দূর করা। অন্যদিকে জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। হাজী শরীয়তুল্লাহর জন্মস্থান মাদারীপুর মহকুমার মুলফতগঞ্জ থানার বাহাদুরপুরে । ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত এই এলাকাটি বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ছিল। বরিশাল ও ফরিদপুরের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ কৃষক ফরাজী আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর মৃত্যুর পর দুদুমিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অধীনে ৮০ হাজার কৃষক ছিল। হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ, মুলাদি, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ, ভান্ডারিয়ার হাজার হাজার কৃষক তাঁর আন্দেলনের পতাকাতলে সমবেত হন। ১৮৪৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর পীর দুদু মিয়ার ৫০০ সশস্ত্র কৃষক মাদারীপুরের সঞ্চচরে মিঃ ডানলপের নীলকুঠি আক্রমণ করেন এবং তার গোমস্তা কাজি লালকে ধরে নিয়ে যায়। গলাচিপার মৌডুবী চরের নিকট তাকে হত্যা করে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও জমিদারদের শোষণ–নিপীড়নের বিরুদ্ধে ফরাজী আন্দোলনের সৈনিকরা ছিলেন মূর্তিমান বিভীষিকা।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় দুদু মিয়াকে বৃটিশ সরকার বন্দী করে রাখে। এখনও বরিশালের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য 'ফরাজী বংশের' লোক

রয়েছেন। ফরাজী আন্দোলনের সাথে এঁদের সক্রিয় সম্পর্ক থাকার জন্য এঁদেরকে ফরাজী বলা হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহী ছিল ইংরেজ দখলদারদের বিরুদ্ধে একটি আনুষ্ঠানিক আজাদী আন্দোলন। এই আন্দোলন গোটা উপমহাদেশবাসীকে আলোড়িত করে। বাকেরগঞ্জের জনগণের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ তুমুল উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। অনেক জমিদার গোপনে সিপাহী বিদ্রোহের সংগঠকদের অর্থ সাহায্য করেন। ঢাকার সিপাহীরা বরিশাল শহর আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বলে জানা যায়। ইংরেজ অধিবাসী ও কর্মচারীরা এ সংবাদ শুনে বিচলিত হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয় এবং তারা বহুদিন ভীতিকর অবস্থার মাঝে বাস করতে থাকে। সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকার অনেক জমিদার ও তালুকদারকে সিপাহীদের সাথে যোগসাজস থাকার অভিযোগে হয়রানি করে।

নীলচাষীদের সংগ্রাম

অন্যায়ের সাথে আপোস করে অসত্যকে মেনে নিয়ে মুসলমানরা কোথাও নীরবে বসে থাকতে পারেননি। হাদীসে আছে, 'জালিম শাসকের কাছে হক কথা বলা উত্তম জিহাদ।' ইসলামের পবিত্র কলেমা একটি বিপ্লবী ঘোষণা এবং চিরন্তন বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত না করার যে ঘোষণা পবিত্র কলেমায় বিধৃত, তাকে অনুসরণ করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। আর সে কারণেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বিজাতীয় গোলামী ও স্বজাতীয় স্বৈরশাসনের শৃঙ্খল মোচনে বারবার এগিয়ে এসেছেন।

ইংরেজ শাসনের দু শ' বছর ধরে যে লাগাতার জিহাদ চলেছে, তার মূল প্রেরণা শক্তি ছিল ইসলাম। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে তিতুমীর-মজনু শাহের সংগ্রাম, ওহাবী আন্দোলন, ফরাজী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ-এ সবের মূল প্রেরণা এসেছে ইসলামের শাশ্বত প্রতিরোধ চেতনা থেকেই। আর এসব আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব ছিল আলিমদের হাতে এবং এসব আন্দোলনের কর্মী ছিলেন সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ।

কৃষকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলকুঠির ইংরেজ সাহেবরা নীলচাষে বাধ্য করতে থাকলে বিভিন্ন স্থানে নীল কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৮২৬ সালে বাকেরগঞ্জে নীলচাষ শুরু হয়। শায়েস্তাবাদ, কাগাশুরা, কাশীপুর, পঞ্চকরণ, চরামদ্দি, বারৈকরণ প্রভৃতি অঞ্চলে নীলচাষ হতো। নীল চাষ বরিশালের কৃষকদের কার্যত ভূমিদাসে পরিণত করে। প্রথম থেকেই বরিশালের কৃষকরা নীল চাষের বিরোধিতা করতে থাকে। ইংরেজ নীল কুঠিয়ালরা কৃষকদের ভয়ে নীল চাষ বন্ধ করে পালিয়ে যায়। ১৮৬০-৬১ সালে যশোর ও কুষ্টিয়ায় নীলচাষীদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। তবে বরিশালে সিপাহী বিদ্রোহের আগেই নীল চাষীরা বিদ্রোহ করে। ঝালকাঠিতে একটি নীলকুঠি ছিল। বিদ্রোহী নীলচাষীরা নীলকুঠি সাহেবকে আক্রমণ করে তার মাথা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে। ঝালকাঠি সরকারী স্কুলের কাছে এই নীলকুঠিয়ালের সমাধি ছিল।

বরিশালের সাধারণ জনগণ কখনও ইংরেজ ও তাদের অনুগত জমিদারদের অত্যাচার নিপীড়ন নীরবে সহ্য করেনি। তারা বৃটিশ শাসনের পুরো সময়টি বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের ঝাণ্ডা উঁচু করে তুলে ধরেছেন। উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনের ইতিহাসে বরিশাল এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে এবং আজাদী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

বরিশাল একটি প্রাচীন ভূখণ্ড হলেও তার অধিকাংশ অঞ্চলে জনপদ সৃষ্টির ইতিহাস তেমন প্রাচীন নয়। সাগর-নদী থেকে উত্থিত নতুন ভূখণ্ড এবং জনবিরল অরণ্য আবাদ করে বরিশালের বেশির ভাগ জনপদ গড়ে উঠেছে। বরিশালের জনগণের রক্তধারায় ইরান, তুরান, আরবের রক্ত মিশেছে। পলাশী যুদ্ধ-উত্তর টালমাটাল পরিস্থিতিতে শত শত সিপাহী ও বিদ্রোহ সংগঠকরা দেশের প্রত্যন্ত দক্ষিণ এলাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন, স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ইসলামের মহান বুযর্গ ও সাধক। সত্য গ্রহণ করা ও সে অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। আর সেই সত্য গ্রহণে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করাই মু'মিনদের ঈমানী দায়িত্ব। মুসলমানরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তাঁরা তাবলীগে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করেছেন। কখনও সংগঠিতভাবে, আবার কখনও ব্যক্তিগত পর্যায়ে। বরিশালের জনগণ চিরবিদ্রোহী, স্বাধীনচেতা হবার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁরা ইসলাম প্রচারক সাধক বুযর্গদের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

জেলার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

এখন বরিশাল নবগঠিত বিভাগ। খুলনা বিভাগের সাবেক একটি নদীবহুল জেলা। নদীসহ জেলার মোট এলাকা হচ্ছে ২৭৯২ বর্গমাইল। বাংলাদেশের মোট ভূ-সীমানার ৫.০২ ভাগ এলাকা বরিশাল জেলার অন্তর্ভুক্ত। সীমানার ক্রম অনুযায়ী বরিশালের ভূ-সীমা হচ্ছে ২১৫০ বর্গমাইল। বৃহত্তর বরিশাল জেলা মোট পাঁচটি মহকুমা নিয়ে গঠিত। তবে এ মহকুমাগুলো এখন এক-একটি স্বতন্ত্র জেলা। বৃহত্তর বরিশালে থানার সংখ্যা ২৮ এবং ইউনিয়নের সংখ্যা ২২৫। সাবেক মহকুমাগুলো যথাক্রমে বরিশাল সদর উত্তর, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা এবং সদর দক্ষিণ। এখন বরিশালকে নিয়ে মোট চারটি পূর্ণাঙ্গ জেলা রয়েছে।

জেলার পশ্চিমে খুলনা জেলার বলেশ্বর নদী। উত্তরে ফরিদপুর, পূর্বে মেঘনা নদী ও নোয়াখালী এবং দক্ষিণে পটুয়াখালী জেলা। বরিশাল জেলা বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূল নিয়ে বিস্তৃত। বরিশাল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড়পড়তা ১১ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

১৯৮১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী বৃহত্তর বরিশালের জনসংখ্যা ৪৬,৬৬,৭২৪ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ। এই সংখ্যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার হারের তুলনায় শতকরা ৫.৩৬%। পুরুষ জনস্যাংখ্যা ৫১.২৩% ; মহিলা জনসংখ্যা ৪৮.৭৭%।

আবহাওয়া

জেলার আবহাওয়া প্রধানত আর্দ্র এবং সর্বত্র তাপমাত্রা প্রায় একই রকম। ঠান্ডা মৌসুমের শুরু নভেম্বর মাসে এবং ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বৃষ্টিপাত মাঝে মাঝে হয়। গড়পড়তা তাপমাত্রার পরিমাণ ৩৬° সেঃ থেকে ৩৫° সেঃ পর্যন্ত। শীতে তাপমাত্রার পরিমাণ সর্বনিম্ন। এ সময় ২৫° সেঃ থেকে ২৮° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা থাকে। ১৯৬০ সালের এপ্রিলে জেলার সর্বোচ্চ

তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল.৪১.১° সেঃ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পরিমাণ ছিল ৫.৬° সেঃ। জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ২১৬ মিঃ মিঃ থেকে ৫১৯ মিঃ মিঃ পর্যন্ত। নভেম্বর–ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প। মে, জুন ও সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে জেলায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। খরস্রোতা নদীর প্রবাহ প্রতিনিয়ত জেলার বিভিন্ন জনপদ নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে যাচ্ছে।

নদী প্রবাহ

এ জেলা দিয়ে বাংলাদেশের প্রধান নদীপ্রবাহ বয়ে গেছে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার প্রবাহ ভাটিতে গিয়ে এ জেলার নদীসমূহ দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়েছে। এ জেলার সর্ববৃহৎ নদী হচ্ছে মেঘনা, যা নোয়াখালীকে পূর্বদিকে রেখে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। মেঘনার শাখা নদী ইলিশার তীরে ভোলা অবস্থিত। দ্বিতীয় প্রধান নদী হচ্ছে বলেশ্বর (মধুমতি)। এ নদী খুলনাকে পশ্চিমে রেখে বরিশালকে বিভক্ত করেছে। মেঘনা ও বলেশ্বর নদীর মধ্যবর্তী সাতটি বড় নদী প্রবাহিত হয়েছে এ জেলার মধ্য দিয়ে। চারটি নদী হচ্ছে তারকি, আড়িয়াল খাঁ, সফিপুর ও নয়া ভাংগনী। অপর দুটি হচ্ছে বিশখালী ও লোহালিয়া। প্রথম চারটি নদী মূলত পদ্মার শাখা নদী। অসংখ্য শাখা নদী–খাল বরিশালের মধ্য দিয়ে জালের মতো প্রবাহিত। এ কারণেই বরিশালের সড়ক পথে যোগাযোগের অবস্থা এখনও মান্ধাতার আমলে রয়ে গেছে। নৌপথে যোগাযোগই বরিশালে ব্যাপক এবং সহজসাধ্য। বরিশালে এ কারণেই রেল যোগাযোগ গড়ে উঠেনি। প্রস্তাবিত রেল পথের কাজ অনেকদূর এগোবার পর তা বাতিল হয়ে যায়। জেলার মোট ১৩% ভাগ জুড়েই রয়েছে নদী।

কৃষি

১. জেলার প্রধান ফসল হচ্ছে আমন ধান। এক সময় বরিশালকে বলা হতো বাংলার 'শস্য ভান্ডার'। বোরো ও আউশ ধানও এ জেলায় উৎপাদন হয়। তবে তা মোট ধান উৎপাদনের তুলনায় স্বল্প। বরিশালের সরু 'বালাম চাল' বিখ্যাত। ৭১% ভাগ ভূমিই চাষযোগ্য। সারাদেশের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৬২%। অধিবাসীদের শতকরা ৪৪.৮৪ ভাগ কৃষক। সারাদেশে কৃষকের পড়পড়তা পরিমাণ হচ্ছে ৪৫%।

কৃষি জমির শতকরা ৮৮% ভাগেই ধান উৎপন্ন হয়। সারা বাংলাদেশে কৃষি জমির মোট ৬৯% ভাগ জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। বরিশালে পাটের উৎপাদন স্বল্প। মাত্র ১% জমিতে পাট উৎপাদন হয়। অথচ সারাদেশে পাট উৎপাদনের জমির পরিমাণ হচ্ছে ৬%। জেলার বিপুল সংখ্যক জমি নিচু। বর্ষাকালে এসব জমিতে পানি থাকে।

পশু সম্পদ

প্রধান প্রধান গৃহপালিত পশু সম্পদের প্রায় সবই বরিশাল জেলায় দৃষ্ট হয়। শতকরা ৮২ ভাগ অধিবাসীই গৃহপালিত পশু সম্পদের মালিক। বরিশালে সাধারণত গরু, মহিষ ও ছাগল দেখা যায়। তবে ভেড়া তেমন দেখা যায় না। হাঁস, মুরগী কমবেশী সকল বাড়িতেই রয়েছে।

বন সম্পদ

বরিশালে বনাঞ্চল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মোট এলাকার মাত্র শতকরা ২ ভাগ জমিতে বন রয়েছে। অথচ বাংলাদেশে গড়পড়তা বন রয়েছে মোট এলাকার শতকরা ১৫ ভাগ। কেওড়া, গাব, আম, গেওয়া, কাকরা, বাবুল, গোলপাতা জেলার উল্লেখযোগ্য বন সম্পদ।

মৎস্য সম্পদ

বলা যায়, ধানের পরেই এ জেলা মাছ উৎপাদনের একটি প্রধান এলাকা। জেলার নদী-নালা, খাল-বিল, দীঘি-পুকুর এবং নিচু জমি মাছ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। সমুদ্রের সাথে সরাসরি সংযুক্ত নদীসমূহ জেলার মৎস্য সম্পদের উৎস। বরিশাল বাংলাদেশের সমগ্র মৎস্য চাষের মোট ৯ ভাগ এলাকার অধিকারী। জেলায় বড় ধরনের ৬টি বিল রয়েছে। বরিশালে ইদানীং শিল্প হিসেবে মৎস্য চাষ ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়েছে। সারা দেশের মৎস্য চাহিদার এক বিপুল অংশ বরিশাল সরবরাহ করে।

শিল্প

শিল্পে এ জেলা খুবই অনগ্রসর। ১৯৬১ সালে বিসিক বরিশালে শিল্প প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু এখনও ঐ প্রচেষ্টাটি প্রাথমিক স্তরে পড়ে

আছে। একটিমাত্র সরকারী টেক্সটাইল মিল আছে। প্রাইভেট সেক্টরে আরও দুটি জুট মিলের কাজ চলছে। ছোটখাট নানা ধরনের শিল্প রয়েছে। সারা বাংলাদেশের শতকরা চারভাগ হস্ত চালিত তাঁত শিল্প রয়েছে বরিশালে।

শিক্ষার হার

বরিশালের শিক্ষিতের হার সর্বোচ্চ। ১৯৮১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী জেলার শিক্ষিতের হার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। সারা বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার শতকরা ২৫ এর নিচে। বরিশাল জেলায় শিক্ষিতের হার গড়ে প্রায় ৫০%। এর মধ্যে পুরুষের হার ৫০.২% এবং নারীর হার ৩১.১%।

১৯৮২ সালে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী বৃহত্তর বরিশালে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৩০০৯। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার-এ পৌছেছে। মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৬০, জুনিয়ার হাইস্কুলের সংখ্যা দেড় শতাধিক। কলেজের সংখ্যা প্রায় অর্ধ শত, মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ৬০০, সাধারণ নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গণশিক্ষা কেন্দ্র ৫০২ টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ। এই সংখ্যা জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। বরিশালের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। ছাত্র-শিক্ষকের গড়পড়তা পরিমাণ প্রায় ৩৫:১।

যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

বরিশালের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ আসলে শুরুতেই বলতে হয় যে, এ জেলায় কোন রেলপথ নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রধানত নৌ-পথ নির্ভর। আন্তঃজেলা যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বরিশাল নৌ-পথের উপরই প্রধানত নির্ভরশীল। তবে আন্তঃজেলা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠার ফলে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে বরিশালকে দেশের অন্যান্য জেলার মতোই জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। জেলার মোট পাকা সড়ক রয়েছে প্রায় ১৫০ মাইল। ১৭৮ মাইল রয়েছে আধাপাকা রাস্তা। কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ৬৪৩৩ মাইল। বৃহত্তর বরিশাল জেলার অন্তর্ভুক্ত সাবেক ভোলা মহকুমা বর্তমানে একটি পূর্ণ জেলা। বরিশালের

সাথে ভোলার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে নৌ-পথ। লঞ্চ, যন্ত্রচালিত নৌকা ও দেশী নৌকাই বরিশাল-ভোলা যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। ভোলা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। বরিশালের মূল ভূখন্ড থেকে এই দ্বীপটি বিচ্ছিন্ন। বর্তমান বরিশাল জেলার অন্তর্ভুক্ত হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ থানাও নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন নৌ-পথেই এ দুই থানার সাথে যোগাযোগ হয়। রাজধানী ঢাকার সাথে যোগাযোগের দুটি মাধ্যম। একটি লঞ্চ এবং অপরটি বাস ও কোচ সার্ভিস। আন্তঃজেলা পর্যায়েও বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ

বরিশালে শের-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজ নামে একটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। জেলায় মোট ২৩টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। ৩টি মহকুমা হাসপাতাল, ৩৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪টি মিশনারী হাসপাতাল এবং ১৯টি অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। অধিকাংশ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩০টি শয্যা সম্বলিত। জেলা সদরে একটি যক্ষা হাসপাতালও রয়েছে। প্রায় ৬০০ পাস করা ডাক্তার আছেন এ জেলায়। জেলার প্রতি ৮১৮৯ জনের জন্য একজন পাস করা ডাক্তার আছেন। সারাদেশে প্রতি ৮৮১০ জনের জন্য রয়েছেন একজন করে পাস করা ডাক্তার।

সমগ্র জেলায় ৪২৩টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রে ৩০ জন ডাক্তার এবং ১৪৫১ জন পরিবার পরিকল্পনা কর্মী কাজ করছেন। এ ছাড়া রয়েছে বেশ কিছু মাতৃসদন। জেলায় ২০৮টি সমাজ কল্যাণ সংস্থা, ২০টি পাবলিক লাইব্রেরী এবং ১১টি এতিমখানা রয়েছে।

এলাকার পরিচয়

বৃহত্তর বরিশালে মোট ২৮টি থানা। তবে পিরোজপুর, ঝালকাঠি ও ভোলা এখন পূর্ণাঙ্গ জেলায় উন্নীত হয়েছে। বরিশালের থানাগুলো হচ্ছে কোতোয়ালী, নলছিটি, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, গৌরনদী, উজিরপুর, আগৈল ঝরা, মুলাদী, হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জ। ভোলা জেলার থানাগুলো হচ্ছে ভোলা, দৌলতখান, বুরহানউদ্দীন, তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা ও চরফ্যাশন। ঝালকাঠি জেলার

থানাগুলো হচ্ছেঃ ঝালকাঠি, রাজাপুর, কাউখালী, স্বরূপকাঠি, বানরীপাড়া, ওয়াজিরপুর। পিরোজপুর জেলার থানাগুলো হচ্ছে ঃ পিরোজপুর, ভাণ্ডারিয়া, ইন্দুরকানি, কাঠালিয়া ও মঠবাড়িয়া।

বরিশাল জেলার দক্ষিণে পটুয়াখালী, পূর্বে নোয়াখালী, উত্তর-পূর্বে কুমিল্লা (চাঁদপুর), উত্তরে ফরিদপুর এবং পশ্চিমে বৃহত্তর খুলনা জেলা অবস্থিত।

বরিশালের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

উজিরপুর

সদর দক্ষিণ মহকুমার উজিরপুর থানার শিকারপুর উজিরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি গ্রাম। কথিত আছে যে, ফকির মোহাম্মদ নামক জনৈক উজির এ গ্রামে বাস করতেন। তাঁরই নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ হয় উজিরপুর। কালিকাপুর পরগণার জমিদারগণ এ গ্রামে বাস করতেন। এ গ্রামসংলগ্ন এলাকায় দা, ছুরি ইত্যাদি তৈরি হয়।

গাভা

ঝালকাঠি মহকুমা (বর্তমানে জেলা) ও থানার গাভা রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত গাভা একটি গ্রাম। এখানে উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ডাক ও তার অফিস এবং পুলিশ ফাঁড়ি আছে।

চরামদ্দি

সদর দক্ষিণ মহকুমার বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত চরামদ্দি একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এখানে উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ডাক্তারখানা, ডাকঘর ও ইউনিয়ন পরিষদ আছে।

এই গ্রামেই বিখ্যাত জমিদার আছমত আলী খানের বাসস্থান। তাঁর পুত্র ইসমাইল খান চৌধুরী মুসলিম লীগের প্রখ্যাত নেতা এবং জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর পুত্র শাহজাহান চৌধুরীও জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

চাখার

পিরোজপুর মহকুমার (বর্তমান জেলার) বানরীপাড়া থানার অন্তর্গত চাখার এ জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ও ইউনিয়ন। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছেন উপমহাদেশের কৃতি পুরুষ শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। চাখার কয়েকটি অভিজাত মুসলিম পরিবার এবং কতিপয় বিখ্যাত জমিদারের বাসস্থান হিসেবেও পরিচিত। চাখারের এক মুসলিম অভিজাত পরিবারের মরহুম সৈয়দ

ফজর আলী তাঁর কন্যাকে শেরে বাংলার প্রপিতামহ কাজী মোহাম্মদ আমিনের (পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানাধীন বিলবিলাস গ্রামের) সাথে বিয়ে দেন। তাঁর পুত্র আকরাম আলী উনবিংশ শতাব্দির তৃতীয় দশকে বিলবিলাস ছেড়ে চাখার কাজি বাড়িতে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী শেরে বাংলার পিতা। চাখার ফজলুল হক কলেজ একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে অবৈতনিক মাদ্রাসা ও জামে মসজিদ আছে।

ঝালকাঠি

ঝালকাঠি সাবেক মহকুমা ও থানা সদর। বর্তমানে এটি জেলা সদর। ঝালকাঠি এ জেলার একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক বন্দর। বৃটিশ আমল থেকেই ঝালকাঠি ছিল এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্যের কেন্দ্রবিন্দু।

তুষখালী

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার অন্তর্গত তুষখালী একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এখানে একটি উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ডাক্তারখানা ও পুলিশ ফাঁড়ি আছে। স্থানটি প্রধানত চাল, নারিকেল ও সুপারির ব্যবসা কেন্দ্র। পূর্বে এলাকাটি সুন্দরবনের অংশ ছিল। জংগল কেটে একে আবাদযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

নলচিড়া

বরিশাল সদর উত্তর মহকুমার গৌরনদী থানার অন্তর্গত নলচিড়া একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এখানে ডাক্তারখানা, প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখানকার খানা বাড়িতেই পূণ্যাত্মা মহাপুরুষ সাধক মীর কুতুব শাহের মাযার রয়েছে।

নলছিটি

নলছিটি ধান, চাল ও সুপারি ব্যবসায়ের বিখ্যাত কেন্দ্র। আগা বাকেরের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে রাজা রাজবল্লভ তাঁর রাজধানী এখানে সরিয়ে আনেন। ফলে এ স্থানটিতে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। শহরে মগপাড়া নামে একটি মহল্লা আছে। সুপারি ব্যবসার জন্য মগেরা এখানে আসত। এখানে নারিকেল তেলও প্রস্তুত হয়।

পাতার হাট

সদর উত্তর মহকুমার মেহেন্দীগঞ্জ থানা ও ইউনিয়নের অন্তর্গত পাতার হাট একটি গ্রাম। এখানে তিনটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। পাতার হাট মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় ১৯২৪ সালে স্থাপিত, পাতার হাট জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে এবং পাতার হাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১৯৬৩ সালে স্থাপিত হয়।

পাদ্রী শিবপুর

বরিশাল সদর দক্ষিণ মহকুমার বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত পাদ্রী শিবপুর একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এখানে একটি রোমান ক্যাথলিক গীর্জা, পাদ্রী শিবপুর সেন্ট আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা, ডাকঘর, পুলিশ ফাঁড়ি ও ইউনিয়ন পরিষদ আছে।

উল্লেখ্য ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজেরাই সর্বপ্রথম অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিবপুরে বসতি স্থাপন করে। কথিত আছে, বুজর্গ উমেদপুরের জমিদার, রাজা রাজবল্লভ বন্দেলের পর্তুগীজ মিশনের কিছুসংখ্যক বিদেশী লোককে এখানে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করে। এ স্থানটি বরিশালের সাথে সড়ক পথে যুক্ত। এ পথে অনেকগুলো পাকা পুল আছে। চাল ও সুপারির ব্যবসা গ্রামের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে। এখানকার পর্তুগীজদের উত্তরপুরুষরা বাংলায় কথা বলে। খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্থানীয় শিক্ষা ও জীবন-যাপনের মান অনেক উন্নত হয়েছে।

পিরোজপুর

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গঠিত পিরোজপুর মহকুমা (বর্তমানে জেলা) ও থানা সদর পিরোজপুর দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একটি মহাবিদ্যালয় ও চারটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া ১১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় , দুটি মাদ্রাসা, একটি হাসপাতাল, দুটি ডাকঘর ও অন্যান্য অফিস আছে।

পোনাবালিয়া

ঝালকাঠি থানাধীন পোনাবালিয়া একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। পূর্বে এখানে টপ্পে হাবিলি সেলিমাবাদ পরগনার জমিদারগণের সদর দফতর ছিল। কথিত আছে, প্রাচীনকালে এখান দিয়ে সুগন্ধা অথবা সুন্দা নদী প্রবাহিত হতো।

বরিশাল

বরিশাল জেলার প্রাণকেন্দ্র। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বরিশালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এর নাম দিয়েছিলেন 'বাংলার ভেনিস'। বরিশালে প্রচুর ধান উৎপাদিত হতো বলে এ জেলাকে একদা 'বাংলার শষ্য ভান্ডার' বলা হতো। বরিশাল একটি নদী বন্দর। বাখরগঞ্জ জেলা সদর দপ্তর বরিশাল ২২°৪১´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০°২৪´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে আড়িয়াল খাঁ নদীর প্রশাখা কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। নদী পথে ঢাকা থেকে বরিশাল শহরের দূরত্ব ৭৫ মাইল এবং বঙ্গোপসাগর থেকে ১০০ মাইলেরও বেশি।

জেলার প্রথম সদর দফতর ছিল নলছিটি থানার পশ্চিমে 'বরইকরণ'–এ। প্রাচীন নথিপত্রে এ জেলাকে ঢাকা জালালপুরের অন্তর্গত 'জেলা বরইকরণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে জেলার সদর দফতর পর্তুগীজ বসতি শিবপুরের সন্নিকটে বাখরগঞ্জে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮০১ সালে জেলা সদর বরিশালে স্থানান্তর করা হয়। ঐ সময় বরিশাল একটি মুসলিম পরিবারের মালিকানাধীন কয়েক শ' একর জমি বিশিষ্ট একটি ছোট গ্রাম ছিল। গ্রামটি গীর্দবন্দর নামে পরিচিত একটি পরগণা ছিল। গীর্দ বন্দর চন্দ্রদ্বীপ পরগণা থেকেই গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

বরিশাল শহর সাংস্কৃতিক–রাজনৈতিক সচেতনতায় একটি অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনে এখানকার ভূমিকা অনন্য–সাধাররণ। স্থানীয় সরকারী ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বাংলার অন্যতম প্রাচীনতম উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। বি.এম. কলেজকে এক সময় অবিভক্ত বাংলায় 'অক্সফোর্ড অব বেঙ্গল' বলা হতো। এখানে আরও দুটি সরকারী ডিগ্রী কলেজ, দু'টি বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ, ল' কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ২০টি হাইস্কুল, শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, অসংখ্য মক্তব

ও দুটি সিনিয়র মাদ্রাসা আছে, শিক্ষার গড়পড়তা হারের দিক দিয়ে বরিশাল শীর্ষে।

শহরের প্রধান প্রধান মসজিদগুলোর মধ্যে জামে কশাই মসজিদ, এবাদুল্লাহ জামে মসজিদ, পুলিশ লাইন জামে মসজিদ, বটতলা বাজার জামে মসজিদ এবং ফকিরবাড়ী জামে মসজিদ প্রধান। শের–এ–বাংলা এ.কে ফজলুল হকের একটি পৈত্রিক বাড়ি এ শহরের আগরপুর রোডে অবস্থিত।

বাখরগঞ্জ

এ স্থানটি বর্তমানে একটি থানা সদর। সাবেক জেলা সদরের স্মৃতি নিয়ে স্থানটি টিকে আছে। কৃষ্ণকাঠি ও খায়রাবাদ নদীর সংযোগস্থলের কাছে বরিশাল থেকে ১৩ মাইল দক্ষিণ–পূর্বে এ গ্রামটি অবস্থিত। এখানে একটি অব্যবহৃত স্টীমার ঘাট আছে। বাখরগঞ্জ জে.এম.উচ্চ বিদ্যালয় ১৯১৯ সালে স্থাপিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও ডাক্তার খানা, ডাকঘর, পরিদর্শন বাংলো রয়েছে।

মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্মচারী 'আগা বাকের'–এর নামে এ গ্রামের নামকরণ করা হয়।

বাটাজোড়

বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত বাটাজোড় একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এ গ্রামটি বরিশাল থেকে ১৭ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। একদা এ গ্রামটি একটি সমৃদ্ধ ও প্রাগ্রসর এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। এখানকার এ.কে হাই স্কুলটি ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বনামধন্য কংগ্রেস নেতা ও শিক্ষাব্রতী অশ্বিনী কুমার দত্ত এ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নামেই ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভাণ্ডারিয়া

পিরোজপুর মহকুমার কচুয়া নদী থেকে উত্থিত একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে ভাণ্ডারিয়া অবস্থিত। এটি একটি গ্রাম, ইউনিয়ন ও থানা সদর। এখানে বালক

ও বালিকাদের জন্য দুটি উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি রয়েছে।

মাধব পাশা

বরিশালের বাবুগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। মাধবপাশা বরিশাল শহর থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এ গ্রামে চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের শেষ বাসস্থান ছিল। এখানকার বিখ্যাত দুর্গা সাগর দীঘিটি রাজা জয়নারায়ণের মাতা রাণী দুর্গাবতী খনন করান।

রহমতপুর

বরিশাল জেলাধীন বাবুগঞ্জ থানার অন্তর্গত রহমতপুর একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এ গ্রামটি বরিশাল শহরের সাথে সড়ক পথে যুক্ত। এখানকার উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এখানে একটি বিমানবন্দর নির্মাণের পথে। রহমতপুরে একটি ক্যাডেট কলেজ আছে। রহমতপুরের চক্রবর্তী পরিবার একদা চন্দ্রদ্বীপ পরগণার বড় তালুকদার ছিলেন। এঁরা চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের দেওয়ান নারায়ণ চক্রবর্তীর বংশধর ছিলেন। এই গ্রামে রাজার বেড় নামক একটি খাল আছে। শোনা যায় যে, চন্দ্রদ্বীপের রাজাগণ তাঁদের প্রাসাদের পরিখা স্বরূপ এটি খনন করেছিলেন।

রামসিদ্ধি

গৌরনদী থানার অন্তর্গত বার্থা ইউনিয়নে অবস্থিত রামসিদ্ধি একটি গ্রাম। এ গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বিখ্যাত সাবি খান এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। এ মসজিদটি বেশ আকর্ষণীয়। এ মসজিদের চারটি স্তম্ভ আছে।

লাখুটিয়া

বরিশাল জেলার কাশিপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত লাখুটিয়া একটি গ্রাম। এখানেই চন্দ্রদ্বীপ পরগণার অন্যতম প্রধান জমিদার পরিবারের নিবাস ছিল। এঁরা হচ্ছেন লাখুটিয়া রায় পরিবার।

শরিকল

গৌরনদী থানার অন্তর্গত শরিকল একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এখানকার শরিকল উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস যে, নবাব সিরাজউদ্দোলার কতিপয় বিশ্বাসী অনুগামী পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এখানে আশ্রয় নেন এবং ইংরেজদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গটি ১৭৭৯ সালে দখল করা হয়। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এবং বিধ্বস্ত কামান এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

শিয়ালঘুনি

বাকেরগঞ্জ থানার কবাই ইউনিয়নের একটি গ্রাম শিয়ালঘুনি। এখানে জনৈক মসরত গনি কর্তৃক নির্মিত মুঘল আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। এককালে এ মসজিদটি কারুকাজে সমৃদ্ধ ছিল। এখনও কিছু খোদিত ফুলের নকশা ও আরবী লিপিমালা দেখা যায়।

সুজাবাদ

নলছিটি থানার মসর ইউনিয়নের অন্তর্গত সুজাবাদ একটি গ্রাম। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা শাহ সুজার নামানুসারে এ গ্রামটির নামকরণ করা হয়। এ গ্রামে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার এককালীন সুবাদার শাহ সুজা মগ ও বর্মীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ দুর্গটি নির্মাণ করেন। আয়তাকার এ দুর্গটির চারদিকে মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল এবং প্রতি কোণায় প্রতিরক্ষার জন্য উঁচু স্তম্ভ ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে চারটি ক্ষুদ্র পুকুর ও কেন্দ্রস্থলে যুবরাজদের বিশ্রাম ভবন ছিল। বর্তমানে দেয়ালের বেশির ভাগই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পুকুরগুলিও প্রায় শুকিয়ে গেছে। দুর্গ এলাকার অধিকাংশ স্থান এখনও জঙ্গলাকীর্ণ।

স্বরূপকাঠি

পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি একটি গ্রাম, ইউনিয়ন ও থানা সদর। এখানকার উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নারিকেলের ছোবড়াজাত দ্রব্যাদিও নৌকা তৈরির জন্য স্থানটি বিখ্যাত। সুন্দরবনের বিভিন্ন কাঠের ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবেও স্বরূপকাঠি সুবিখ্যাত।

শায়েস্তাবাদ

বরিশাল জেলার কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত এটি একটি বিখ্যাত গ্রাম। এখানে একটি প্রসিদ্ধ জমিদার বাড়ি আছে।

উলানিয়া

মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। উলানিয়ায় একটি বিখ্যাত মুসলিম জমিদার বাড়ি আছে। উলানিয়ার জমিদার ও তাঁদের উত্তর পুরুষরা যেমন ধনবান, সমাজ-সংস্কারক তেমনি উচ্চশিক্ষিত। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে এ বাড়ির বহু ব্যক্তিত্ব সমাসীন ছিলেন ও আছেন।

পাকিস্তান আমলে জেলা

প্রায় দু'শ বছর বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার পর পাকিস্তান স্বাধীন হয়। পাকিস্তানের পূর্বাংশ তদনীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের একটি সম্ভাবনাময় জেলা হিসেবে বরিশালের অভ্যুদয় ঘটে। বলা বাহুল্য, উপমহাদেশের বাঙালী মুসলমানরা যেভাবে আত্ম জাগৃতির ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশ-হিন্দু বিরোধী সংগ্রাম করেছেন, বরিশালের সংগ্রামী মুসলমানরাও তাতে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। বৃটিশ বিরোধী মুজাহিদ আন্দোলন, ফরাজী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতিতে বরিশালের জনগণের ভূমিকা সমুজ্জ্বল। ইসলামের অবমাননার বিরুদ্ধে কিংবা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে এ জেলার মুসলমানদের অবদান বিপুল। কুলকাঠিতে ইসলাম বিরোধী ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে গিয়ে অকাতরে জীবন দিয়েই বরিশালের জনগণ ইতিহাস সৃষ্টি করেনি, তারা বৃটিশ-হিন্দুদের সব ধরনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন।

বরিশাল ছিল বাংলার অবারিত প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদে ভরপুর একটি জনপদ। এ জেলাকে বলা হতো 'বাংলার শস্য ভান্ডার।' সে কারণেই বৃটিশ অনুগ্রহপুষ্ট হিন্দু জমিদারদের লোলুপ দৃষ্টি আগাগোড়াই বরিশালকে শোষণ করে এসেছে। বরিশালের অর্থনীতিও ছিল প্রধানত কৃষিভিত্তিক। ফলে বৃটিশ-হিন্দুর যৌথ শোষণে ঐ জেলার মুসলমান কৃষকরাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকেন। হান্টারের উদ্ধৃত সেই রাজার জাত মুসলমানরা আক্ষরিক অর্থে কাঠুরিয়া ও ভিস্তিওয়ালা যদি হয়ে থাকেন, তা এই বরিশালে। অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতায় বরিশালের হিন্দু জমিদার ও উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা ছিল। ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবালোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত হিন্দু জনগোষ্ঠী বরিশালে অবস্থিত তাদের ভূসম্পত্তি থেকে অর্জিত অর্থেই কলকাতায় বিত্তের বেসাতি করতো। বৃটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নির্মম শোষণ, ওয়াক্‌ফ ও লাখেরাজ সম্পত্তির বিলোপ এবং হিন্দুদের হাতে ভূমির রায়তী স্বত্ব হস্তান্তর হবার ফলে এ জেলার মুসলমানরা নির্জীব হয়ে পড়েন। কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভব ও

বিকাশ এবং তাদের আধুনিক মানস-তাড়িত সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উজ্জীবনের ফলে সারা বাংলায় মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। বিশেষত বরিশালে এর প্রভাব আরও ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়। হিন্দু জমিদার মধ্যবিত্তদের প্রচেষ্টায় বরিশালে বি.এম. কলেজের প্রতিষ্ঠা তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিকে নিশ্চিত করে। অন্যদিকে মুসলমানরা তখন অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত। এককালে বি.এম. কলেজকে 'বাংলার অক্সফোর্ড' বলা হতো এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষাব্রতীরা এ কলেজে শিক্ষকতা করার জন্য ছুটে আসতেন। ভারতীয় হিন্দুদের নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী 'স্বদেশী' আন্দোলন, যা কার্যত ছিল হিন্দু পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন, তাতে বরিশালের অশ্বিনীকুমার প্রমুখরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। ফলত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুসলমানরা ছিলেন পশ্চাদপদ। হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুল-কলেজের দরজা ছিল মুসলমানদের জন্য কন্টকিত। সঙ্গত কারণেই কংগ্রেসী রাজনীতির প্রভাব বরিশালে ব্যাপক প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছিল। শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মতো বিশাল ও লোকনন্দিত নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই বরিশালের দিশেহারা মুসলমানরা হিন্দুদের মুকাবিলায় অস্তিত্বের সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছিলেন। হিন্দু প্রধান এলাকা না হলেও বিভাগপূর্বকালে বরিশালের রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদিতে তাদের একচেটিয়া প্রভাব ছিল। সে কারণে বরিশালের মুসলমানদের অস্তিত্বের সংগ্রামে বেশিমাত্রায় প্রতিকূলতা মুকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে এ জেলার মুসলমানদের আত্মসচেতনতা ও স্বজাত্য বোধের তীব্রতাও চোখে পড়ে। শের-এ-বাংলা তো বলেই দিয়েছেন যে, 'হিন্দুরা যখন কোন মুসলমানের প্রশংসা করবেন, তখন বুঝতে হবে ঐ মুসলমানের দ্বারা স্বীয় জাতির ক্ষতি হচ্ছে।' হিন্দু চরিত্রের এর চেয়ে বড় বিশ্লেষণ আর কি হতে পারে? শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত শের-এ-বাংলা হিন্দুদের মানস-চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই একথা বলতে পেরেছেন। বরিশালে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক নেতাদের দৌরাত্ম্য বেশি ছিল বলেই মুসলিম লীগের আন্দোলনও শক্তভাবে গড়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক বঞ্চনার শতাব্দী ব্যাপী জগদ্দল পাথর অপসারণ, আপন কৃষ্টির উজ্জীবন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠা পাকিস্তান

আন্দোলনের সাথে বরিশালের জনমানস ছিল গভীরভাবে সম্পৃক্ত। পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে বরিশালের জনগণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তবে সাধারণ মানুষও নজীরবিহীন উদ্দামতা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পাকিস্তানে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের ন্যায় ইসলামী অনুশাসন প্রবর্তিত হবে, এ জেলার ইসলাম প্রিয় জনগণের এটাই প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকদের ব্যর্থতা সে স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয়। সূচিত হয় দু' অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড়। এই বৈষম্য বরিশালবাসীকেও পীড়িত ও ক্ষুব্ধ করে। এরপর শুরু হয় বৈষম্য নিরসন তথা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসন অর্জনের আন্দোলন। এ ক্ষেত্রেও বরিশালের জনগণ ছিল অগ্রগণ্য।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭১ সালের ষোলই ডিসেম্বর সাবেক পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু ইতিহাসের এই পট পরিবর্তনে লাখো লাখো মানুষকে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হয়। বরিশালের ছাত্র-জনতা-সৈনিকের আত্মত্যাগ এ ক্ষেত্রে অতুলনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া-মুজিব সমঝোতা বৈঠক ভেঙে যাবার পটভূমিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাক সামরিক বাহিনী অতর্কিতে গণহত্যা শুরু করলে সারা দেশে স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে। এটাই পরে সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের যেসব এলাকায় সর্বাগ্রে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়, বরিশাল ছিল তার অন্যতম। অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল বরিশালের ছাত্র যুব-জনতা সৈনিককে প্রতিরোধ পর্বের সূচনায়ই সংগঠিত করে এক দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দীর্ঘ ন' মাসের একটানা মুক্তিযুদ্ধে বরিশালের জনগণ যেভাবে সাহসিকতার সাথে লড়েছেন, তাতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, স্বাধীনতার জন্য তারা যে কোন আত্মত্যাগকেই তুচ্ছ মনে করেন।

বিপুল আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্ন আজও অপূর্ণ। ১৯৭১ সালের ২৫ বা ২৬শে মার্চে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়নি। আর তা ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর শেষও হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, এ উপমহাদেশে মুসলমানরা যখন থেকে একটি সংগঠিত জাতিগোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন থেকেই তাদের মাঝে স্বাধিকারের চেতনার উন্মেষ ঘটে। বৃটিশ-শাসন পূর্ব কম-বেশি প্রায় আট শ' বছর মুসলমানরা ভারত শাসন করেছেন। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় মুসলমানদের অপূর্ণ স্বপ্ন আরও বাঙময় হয়ে উঠেছে। তবে

বাংলাদেশের সম্ভাবনাও যেমন অফুরন্ত, তার সামনে আশংকা ও সংকটের বেড়াজালও রয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় তার রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-রাজনৈতিক ভূমিকা। সামরিক দিক দিয়েও বাংলাদেশের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রতিবেশী বৃহৎ ভারত, আমাদের মানচিত্রের তিনদিকে যার অবস্থান। উপমহাদেশের রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক সংঘাত যেভাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, তাতে আর্য-মানস উৎসারিত ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বপ্নের দেশ ভারত হচ্ছে আমাদের জাতিসত্তা বিকাশের পরিপন্থী চেতনার ধারক। কিন্তু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সুবাদে ভারত আমাদের স্বপক্ষ শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। এতে করে, রাজনৈতিক ও নৈতিকভাবে জাতি হিসাবে আমরা ভারতের কাছে দায়বদ্ধ। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু নানা কারণে বাংলাদেশে তার কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বর্তমানে দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা 'সার্ক' গঠিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধিপত্যবাদী অক্টোপাশে বাংলাদেশ বাধা।

বাংলাদেশের বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আছে। অন্তহীন দারিদ্র্য, উন্নয়ন কাঠামোর অভাব এবং শিল্পে অনগ্রসরতার কারণে বাংলাদেশ এখনও অস্তিত্বের সংগ্রামে নিরত। শিল্প সম্প্রসারণ ও স্বনির্ভরতার পথে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনীতি আমাদের জন্য বাঁধা। আমরা আজও আমাদের অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতির পরিপূরক বা খাতক অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারিনি।

আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আত্ম আবিষ্কারকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার উপাদান সক্রিয়। বস্তুত আমরা আজও এক দুর্বিষহ সাংস্কৃতিক সংকট মুকাবিলা করছি। সংস্কৃতি যদি হয় জনজীবনের প্রতিচ্ছবি, তা হলে বৃহত্তর জন-মানসের প্রতিবিম্বই হবে সংস্কৃতি। ভাষা, লোকজ কালচার কিংবা নৈসর্গিক উপাদান জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে ভূমিকা রাখে সত্য তবে যে কঠিন ও চিরায়ত ধর্ম বিশ্বাস মানুষকে পরিচালিত করে, সেই ধর্মের প্রভাব বর্জিত কোন সংস্কৃতি কখনও

শেকড় পেতে পারে না। হাজার বছর ব্যাপী দু'টি প্রধান সংস্কৃতির যে সংঘাত ও অভিঘাত বিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তার মূল উপাদান ছিল ধর্ম। আর মুসলমানদের জন্য সেটা অবধারিতভাবেই ছিল শাশ্বত ইসলাম। ইসলামই মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তা অর্জনে বাধ্য করেছে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মূল দর্শন নির্মাণ করেছে ইসলাম। আর লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তান হয়েছিল বলেই বাংলাদেশের স্বাধীন অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারে ইসলামী চেতনাকে অনুশীলন করেই।

বাংলাদেশ এলাকায় বেশ কয়েকটি স্বাধীন মুসলিম দেশের অভ্যুদয় ঘটলেও নানা কারণে পরিপূর্ণ ইসলামী রেনেসাঁর জন্য এ দেশটির মতো উর্বর আর কোন দেশ নেই। বাংলাদশের মুসলমানরা একটি একক ও অখণ্ড ভৌগোলিক মানচিত্রে বাস করেন। তাদের রয়েছে অভিন্ন নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় আন্তঃ সম্পর্ক। এটি একটি বিশ্বজয়ী জাতির জন্য বিরাট উপাদান। গোটা ভারত ভূমির আর্থ–সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় বিবর্তন সংঘাতের ধারায় বাংলাদেশের জনগণ একটি একক জাতিসত্তায় স্থিত হয়েছে। সংগ্রামে–সংকটে, আনন্দে–দুঃখে তারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে।

বাংলাদেশে ইসলামী রেনেসাঁর জন্য চাই একটি সর্বপ্লাবী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লব। কঠোর পরিশ্রম, সততা ও স্থিতিশীল একটি রাজনৈতিক কাঠামো দেশকে সত্যিকার সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। ইসলামের সামাজিক ভূমিকার সম্প্রসারণ ও পুনরুজ্জীবনই পারে এ দেশকে অগ্রগতির শিখরে পৌঁছে দিতে।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখলে এ কথা বলতে হবে যে, বাংলাদশেকে নিয়ে নানা চক্রান্ত আছে। বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠলে প্রতিবেশী বহু জাতিগোষ্ঠীই নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। এ কারণেই বাংলাদেশকে পঙ্গু করে রাখার একটি অশুভ খেলা চলছে। এসব ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের সতর্ক হতে হবে। তবে জাতীয় ঐক্যই পারে শত্রুর চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে। আর নির্ভেজাল জাতীয় ঐক্য গঠনের একক ও কার্যকর উপাদান হচ্ছে ইসলাম।

বরিশাল শহরের পত্তন

কীর্তনখোলা নদীটি বর্তমানে যে স্থান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, অতীতে সম্ভবত আরও পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। চন্দ্রদ্বীপ রাজার রাজধানী শ্রীনগর বা মাধব পাশাকে কেন্দ্র করে ১৭ শতকে কাশীপুর, করাপুর, রূপাতলী, মতপর, [illegible], কাউনিয়া , আওয়া প্রভৃতি গ্রাম–জনপদ গড়ে উঠে। বরিশাল শহরের পশ্চিম-দক্ষিণের বগুড়া আলেকান্দা ও সাগরদী গ্রামে তখন লোকসংখ্যা ছিল কম। এ গ্রামগুলো ছিল নিচু ও জঙ্গলাকীর্ণ, বর্ষাকালে পানিতে ডুবে যেত। ১৮ শতকের মধ্যভাগে এখানে 'আল' দিয়ে কয়েকটি পরিবার ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকে। 'আল' অর্থ বাঁধ, এই সূত্রেই এলাকাটির নাম হয়েছে আলেকান্দা। সুগন্ধা নদীতে আলেকান্দার পশ্চিমে যে দ্বীপটি সৃষ্টি হয়, তার নাম হয় সাগর দ্বীপ বা সাগরদী। এসব এলাকায় খননকালে মানুষের ব্যবহৃত এমন কিছু দ্রব্য পাওয়া গেছে, যাতে মনে হয় যে, এ অঞ্চল একদা সুগন্ধা নদীর অংশ ছিল।

কাউনিয়া গ্রামের জানকী সিং রোডে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ আছে। মোহাম্মদ বাকের ১৮৭৬ সালে এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট এবং গম্বুজটি তুলনামূলকভাবে অনেক উঁচু। মসজিদের শিলালিপিতে লেখা আছে,

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
কলেমা তায়্যেব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্
আবু বকর, ওমর, ওসমান, হায়দার।

১২০২ হিজরী,
মুহাম্মদ বাকের।

এই বাকেরের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে তিনি সম্ভবত ঢাকার নবাব নাজিমের কোন কর্মচারী হবেন। অথবা স্থানীয় কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।

আলেকান্দার কালু খানের পূর্বপুরুষ ১৮ শতকের প্রথম ভাগে আলেকান্দায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের বাড়ির সামনে নবাবী আমলে নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ আছে।

কাউনিয়ার খান্ পরিবার ১৭ শতকের মধ্যভাগে আগমন করেন। তাঁদের আদি পুরুষ বিষ্ণু খান চন্দ্রদ্বীপ রাজার কর্মচারী ছিলেন। এই পরিবার কাউনিয়া মৌজায় ৪০০ একর জমির মালিক ছিলেন। এই পরিবারের চানখার নামেই কাউনিয়ায় চানখার পুল। এ বাড়িতে ১৮ শতকে নির্মিত দুটি জোড় মসজিদ ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রুইয়া গ্রামে একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ আছে। এই গ্রামের কাজী পরিবারটি কয়েক শ' বছর আগে এখানে বসতি স্থাপন করেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর কয়েকজন ইসলাম প্রচারক বরিশালে আগমন করেন। এঁরা কাউনিয়া, ফকিরবাড়ী ও আলেকান্দায় বসবাস করতে থাকেন। সৈয়দ লাল ও সৈয়দ আরিফ নামে দু'ভাই আরব মুলুক থেকে এসে এখানে বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। আলেকান্দার বর্তমান মীর পরিবার তাঁদেরই বংশধর।

শাহ্ করিম বখ্শ ১৮ শতকে বরিশালে আগমন করেন এবং শহরের মধ্যস্থলে ধর্ম সাধনা শুরু করেন। তাঁর পিতা কু[illegible] বাগদাদী। রহমতপুরের জমিদার চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ১৮০৩ সালে শাহ করিম বক্সকে ৮.৫৭ একর নিষ্কর সম্পত্তি দান করেন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এই ইসলাম প্রচারক ধার্মিক পরিবারটির প্রতি হিন্দু জমিদারের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। দলীলে উল্লেখ আছে, "পুরুষানুক্রমে দুরগায় তৈল বাতি দিয়া পুত্র পৌত্রাদিসহ ভোগ দখল করিতে থাক ও দোয়া করিও বহত।" ১৮১৭ সালে তিনি ফকির বাড়ি মসজিদ নির্মাণ করেন। শাহ করিম বখ্শ ফকিরের নামানুসারেই ফকির বাড়ি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদের দক্ষিণ পাশে তাঁর মাযার রয়েছে।

১৮৩১ সালে বরিশাল শহরের আধুনিক গোড়াপত্তন হয়। এর আগে এখানে ইংরেজদের স্থায়ী বসতি ছিল না।

ভাটিখানা রোডে জনৈক মল্লিক নির্মিত তিনটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদগুলো উনিশ শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত। জনৈক মল্লিক গুপ্তধন পেয়ে এই মসজিদ তিনটি নির্মাণ করেন বলে জনশ্রুতি আছে। একটি মসজিদের অস্তিত্ব লুপ্ত প্রায়। বাকি দুটিতে এখনও যথারীতি নামায হয়। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পর বরিশাল শহরে লোকসংখ্যা এক হাজারের বেশি ছিল না। ১৮০১ সালের আগে বরিশাল ছিল একটি বাণিজ্য বন্দর। ১৭৯৭ সালে বাকেরগঞ্জ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বাকেরগঞ্জ জেলার সদর দফতর ছিল শ্রীমন্তপুর খালের তীরে। শ্রীমন্তপুর খাল খয়রাবাদ নদীতে প্রবাহিত। সাবেক জেলা সদরটি পরিত্যক্ত হয়েছে অনেক আগেই। এ এলাকাটি এখন বাকেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত। নদীতে চর পড়ার কারণে যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ ছাড়া ইংরেজ শাসন–বিরোধী কৃষকদের বিদ্রোহের নাগালের মধ্যে ছিল এ স্থানটি। এ কারণেই ইংরেজ শাসকরা জেলা সদর স্থানান্তর করে বর্তমান স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সালের ১লা মে নিযামত আদালত জেলা দফতর বাকেরগঞ্জ হতে বরিশালে স্থানান্তরের নির্দেশ দেয়। ইংরেজ শাসকদের নথি থেকে জানা যায় যে, বর্তমান জেলা সদরের স্থানটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। নতুন জেলা সদর স্থাপনের কারণে অনেক পরিবার স্থানান্তরিত হন। এই সুযোগে অনেকে জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী জমি তালুক হিসেবে বন্দোবস্ত নিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এদের মধ্যে দক্ষিণ আলেকান্দার–আব্দুল লতিফ খান, আমির আলী খান, মুহাম্মদ আলী সরদার ও সাগরদীর মল্লিক বাড়ির পূর্বপুরুষগণ। বিক্রমপুরের বহুসংখ্যক লোক বরিশালে ব্যবসায় উপলক্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। চকবাজার এবাদুল্লাহ মসজিদ ঢাকার ব্যবসায়ী জনাব এবাদুল্লাহ নির্মাণ করেন। এটি শহরের অন্যতম প্রধান মসজিদ। ১৮৪২ সালে এ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বরিশাল শহর সংলগ্ন নদীটির নাম সুগন্ধা। তবে শহরের পত্তন হলে হিন্দুরা নদী তীরের হাটখোলায় কীর্তন শুরু করে। সেই থেকে নদীর নাম পরিবর্তন করে কীর্তন খোলা রাখা হয়।

জিন্নাত বিবি একজন দানশীল মুসলিম মহিলা ছিলেন। তিনি বরিশাল সদর রোডে একটি পুকুর খনন করেন এটি বিবির পুকুর নামে খ্যাত। এতে শহরের

মুসলমান অধিবাসীদের পানির কষ্ট নিবারণ হয়। শহরের কালীবাড়ী এলাকায় একটি বড় পুকুর আছে। এটি হিন্দুরাই ব্যবহার করত। হিন্দুদের মধ্যে ছুঁৎমার্গ থাকায় মুসলমানরা ঐ পুকুরের পানি ব্যবহার করতে পারেনি। জিন্নাত বিবির মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি খান বাহাদুর হাশেম আলী খান ও বামনার চৌধুরীরা ক্রয় করেন।

১৮০১ সাল হতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বরিশাল শহরের স্থায়ী অধিবাসীদের সংখ্যা কম ছিল। মূল শহরে অধিবাসীদের সংখ্যা বেশী ছিল। তবে কাউনিয়া, অলেকান্দা, বগুড়া, আমানতগঞ্জ, সাগরদী ছিল মুসলমান প্রধান এলাকা।

সুলতানাবাদের জমিদার মেহেরুন্নেছা বেগম বরিশাল শহরে বসবাস করতেন। এই বড়িটি খানম বাড়ি নামে পরিচিত। এছাড়া শায়েস্তাবাদের জমিদার মীর তোজাম্মল আলী, চরামদ্দির আসমত আলী চৌধুরী, কাজী আকরাম প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলমানরা বরিশাল শহরে বসবাস করতেন। এছাড়া অনেক মুসলমান উকিল, মোক্তার, জমিদার শহরে বাস করেন। শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের পিতা ওয়াজেদ আলী বরিশাল শহরে বাস করতেন।

বরিশালের বিশিষ্ট মুসলিম পরিবার

জেলার অন্যান্য স্থানে বেশ কিছু অভিজাত মুসলিম পরিবার বসবাস করতেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চাখারের মজুমদার ও সৈয়দ। সুবাদার শায়েস্তা খানের সময় শের খাঁ ও চলবান খাঁ চাকুরী গ্রহণ করে ঢাকা থেকে শায়েস্তাবাদে বসতি স্থাপন করেন। শের খাঁর পুত্র মেন্দি ও শরফুদ্দীন মোঘল সম্রাটের পক্ষে বাকলা সরকারের অধীনস্থ পরগণার রাজস্ব আদায় করতেন। তাঁরা শায়েস্তাবাদ হতে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশা হতে ১০ মাইল পশ্চিমে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করেন। তাঁরা চৌথ ও কর আদায় করতেন এবং সেজন্য গ্রামের নাম হয় চাখার। আগা বাকের খান তাঁদের এক বোন বিয়ে করেন। মেন্দি বা মেহেদী মজুমদারের দু' কন্যা ছিল। মীর কুতুব ও মুহাম্মদ হানিফের কাছে তাঁদের বিয়ে দেন। চাখারে দশটি মিয়াবাড়ি আছে।

করাপুরের মিয়াবাড়ী

মালদার খাঁ ও হায়াত মাহমুদ চন্দদ্বীপ রাজার সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা একবার বন্দী হলে হায়াত মাহমুদ তাঁকে উদ্ধার করেন। হায়াত মাহমুদ ৩০ একর জমির উপর তাঁর বাড়ি নির্মাণ করেন। তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং প্রকান্ড দুটি দীঘি খনন করেন। তাঁর ৪০০ একর লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল।

কেওরার বাকলাই বংশ

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র বসুর পুত্র কীর্তিনারায়ণ ১৬৬৮ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নবাব দরবারে গো মাংসের ঘ্রাণ নিয়ে তিনি জাতিচ্যুত হন। তিনি মাধবপাশার বাদলা গ্রামের পর ঝালকাঠির কেওড়ায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নাম অনুসারে কীর্তিপাশা গ্রামের নামকরণ হয়। কীর্তিনারায়ণ সামাজিক চাপে মুসলমান হলেও তিনি পুরোপুরি হিন্দু আচার ত্যাগ করতে পারেননি। সম্ভবত তিনি উভয় ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানই পালন করতেন। কীর্তিনারায়ণের পুত্র মাহমুদ হাসান নাম ধারণ করেন এবং ইসলামের সকল অনুশাসন পালন করতে থাকেন। এই পরিবারটি 'বাকলাই' নামে পরিচিত।

আগরপুরের মিয়া

আগরপুরের মিয়া ও উজিরপুরের চাঙ্গুরিয়া সর্দারদের পূর্বপুরুষ হযরত শাহ সদর জাহান খান, হামিদ খান ও নাসির জাহান খান, আফগানিস্তান থেকে ইসলাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে এ জেলায় আগমন করেন। হযরত শাহ মুহাম্মদ নাসির জাহান খানের পুত্র শাহ মুহাম্মদ আশরাফ জাহান পাঠানদের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। মোঘলদের সাথে পরাজয়ের পর তিনি দিল্লী হতে উজিরপুর থানার চাংগুড়িয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তার প্রপৌত্র হানিফ জাহান খাঁ তালুক লাভ করে বাবুগঞ্জের আগরপুরে বসতি স্থাপন করেন। এই পরিবারে অনেক কীর্তিমান পুরুষের জন্ম হয়।

গাভার শেখ

শেখ বেরাহিম মোঘল আমলে চন্দ্রদ্বীপে ভূসম্পত্তি লাভ করে গাভা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। গাভার শেখ পরিবার আঠারো শতকের শেষভাগে সমাজে প্রভাবশালী পরিবার হিসেবে পরিচিত হন।

সাতুরিয়ার মিয়া

সাতুরিয়া মিয়াদের পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত খান জাহান আলীর সহচর হযরত সাজেন্দা। তিনি বাগেরহাটের হাবেলী গ্রামে বাস করতেন। তাঁর বংশধর শেখ শাহাবুদ্দীন। শাহাবুদ্দীন আরব হতে প্রথমে দিল্লী হয়ে বাগেরহাটে আসেন। ১৮ শতকের শেষ দিকে তিনি সাতুরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। বৈষয়িক বিষয়ে তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। লোকে তাঁকে ফকির বলতো। তাঁর ন' পুত্র ছিলেন। তাঁরাও ইসলাম প্রচারে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর মাযারের শিলালিপিতে তাঁর জন্ম তারিখ বাংলা ১০৩৫ সাল উল্লেখ আছে। মৃত্যুকাল উল্লেখ আছে ১১৫২ বাংলা সন। শেষ বয়সে তিনি তিন পুত্র নিয়ে শুক্তগিড়ে বাস করতেন। তাঁর মাযারের নিকট মসজিদ ও একটি ফিরনী গাছ আছে। এ গাছের ফল দুগ্ধ ও মিষ্টিতে পূর্ণ। এই বংশের মেয়ে মেহেরুন্নেছাকে শায়েস্তাবাদের সৈয়দ ওবায়দুল্লাহ বিয়ে করেন। এ পরিবারের কন্যা সায়দুন নেসা শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের

মাতা। শেখ শাহাবুদ্দীনের শতাধিক উত্তরাধিকারী রয়েছেন। এই পরিবারের নারী-পুরুষরা ইসলামের প্রভূত সেবা করেন এবং সমাজ সেবায় বিশেষ অবদান রাখেন।

বুযুর্গ উমেদ

সম্রাট আওরঙ্গজেব পর্তুগীজদের সাথে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য চন্দ্রদ্বীপ পরগনা ও সরকার বাজুয়া হতে নতুন একটি পরগণা সৃষ্টি করে শায়েস্তা খানের পুত্র বুজর্গ উমেদকে প্রদান করেন। তাঁর নামে এ পরগণার নাম হয় বুযুর্গ উমেদপুর। বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালী, বেতাগী, আমতলী, বরগুনা, পাথরঘাটা বামনা প্রভৃতি এ পরগণার অন্তর্গত ছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনের শেষ ভাগে আগা বাকের খান এই পরগণা লাভ করেন। ১৭৫৩ সালে তিনি নিহত হলে রাজবল্লভ বুযুর্গ উমেদপুর দখল করে নেয়।

নিয়ামতির সিকদার

বাকেরগঞ্জ থানার নিয়ামতির সিকদারদের পূর্বপুরুষ শেখ আবদুল লতিফ বুযুর্গ উমেদপুরে তালুক লাভ করেন। ফরিদপুর হতে চামটানিয়ামতি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পৌত্র আইনউদ্দীন সিকদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ১৭৮৭ সালে তাঁকে হত্যা করা হয় এবং ঢাকার কালেক্টর তাঁর তালুক বাজেয়াফ্ত করে নেয়। শেখ আবদুল লতিফের পুত্র নবাবের রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন। এ কারণেই তাদের সিকদার পদবী।

চালিতাবুনিয়ার মীর

বামনার চালিতা বুনিয়ার মীরদের পূর্বপুরুষ মীর চাঁদ আলী পারস্য হতে বাকেরগঞ্জের চৌদ্দবুড়িয়ায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি নবাবের নিকট থেকে প্রাপ্ত লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন।

শাহবাজ খাঁ

শাহবাজ খাঁ কুম্বু সম্রাট আকবরের একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৫৮২ সালে ঈসা খাঁকে দমন করার জন্য ভাটি অঞ্চলে এসেছিলেন। সম্ভবত তিনি বাকলার উত্তরাংশ দখল করেছিলেন। তাঁর নামেই এ অঞ্চলের নাম হয় শাহবাজপুর।

ইদিলপুর পরগণা

সম্রাট আকবরের সময় সরকার বাকলার ৪টি পরগণার মধ্যে ইদিলপুরের নাম আছে। আদিল থেকে ইদিলপুর হয়েছে। শেরশাহের বংশধর আদিলের নামানুসারে ইদিলপুর হতে পারে। মনে হয় প্রাচীনকাল হতেই হিজলা, মুলাদী ও মাদারীপুরের ঘোষের হাট এলাকাকে ইদিলপুর বলা হতো।

উলানিয়ার চৌধুরী

মেহেন্দীগঞ্জ থানার উলানিয়ার চৌধুরীগণ মুহাম্মদ হানিফের বংশধর। তিনি শায়েস্তা খানের আমলে গোবিন্দপুরের সংগ্রাম কেল্লার জমাদার ও একজন সেনানায়ক ছিলেন। তিনি হিজলার তেতুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। জনশ্রুতি আছে, তিনি পারস্য থেকে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর বংশধর মুহাম্মদ তকী তেতুলিয়া জমাদার বাড়ি হতে উলানিয়া বসতি স্থাপন করেন। এঁদের বংশধররা ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ-সম্পদের মালিক হন এবং প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক হন।

এ দেশের রাজনীতি, বিচার-ব্যবস্থা, আইন-ব্যবসা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে এ বংশের ব্যাপক অবদান আছে।

তপ্পে নাজিরপুর পরগণা

নাজিরপুর পরগণার ভূমি চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজকার্যে সন্তুষ্ট হয়ে তার উযীর উলফত গাজীকে তপ্পে নাজিরপুর পরগণা প্রদান করেন। উলফত গাজী বিহারের গাজীপুরের অধিবাসী। তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর বংশধর। তিনি ঢাকায় বাস করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সৈয়দজান মুলাদী থানার তেরচর নামক স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করেন। তিনি একজন ধর্ম প্রচারক ও প্রজাবৎসল জামিদার ছিলেন। খুব সম্ভব ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তার অপর নাম ছিল সৈয়দ কুতুব বা মীর কুতুব। তেরচরে ভাঙ্গন দেখা দিলে মীর কুতুব নলচিড়ায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র আইনউদ্দীন। আইনউদ্দীনের পুত্র শামসুদ্দীন ১৭০৪ সালে নাজিরপুরের জমিদার ছিলেন। তাঁর পুত্র হোসেন উদ্দীনের এবং তৎপুত্র সৈয়দ ইমাম উদ্দীনের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়।

শায়েস্তাবাদের জমিদার

১৬৬৬ সালে সুবাদার শায়েস্তা খান বাকলা চন্দ্রদ্বীপ হতে মগ পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেন। ইরাচ খাঁ এতে অপূর্ব সাহসের পরিচয় দেন। শায়েস্তা খান পুরস্কার স্বরূপ ইরাচ খাঁকে চন্দ্রদ্বীপ হতে একটি ছোট পরগণা সৃষ্টি করে জায়গীর প্রদান করেন। শায়েস্তা খাঁর স্মরণে পরগণার নাম হয় শায়েস্তাবাদ। ইরাচ খাঁ এ পরগণা তার কন্যা উমাদাতুন নেছাকে দান করেন। তিনি মুহাম্মদ হানিফ চৌধুরীকে পরগণাটি ইজারা দেন। হানিফ চৌধুরী শায়েস্তাবাদের আইচা গ্রামে বাস করতেন। তার পূর্বে চাখারের মেন্দি মজুমদার এ পরগণার মালিক ছিলেন। মীর সলিমউদ্দীন মেন্দি মজুমদারের দৌহিত্রী বিয়ে করে শায়েস্তাবাদ পরগণা লাভ করেন। মনে করা হয়, হানিফ চৌধুরী চাখারের মেন্দি মজুমদারের জামাতা ছিলেন। শায়েস্তাবাদ জমিদার পরিবারের মীর মোয়াজ্জেম হোসেন ১৮৭৫ সালে একটি বংশ তালিকা উপস্থাপন করেন। তাতে দেখা যায় যে, এই বংশ নবীনন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা) বংশ সূত্রে সম্পর্কিত। হযরত মুহাম্মদ (সা), হযরত ফাতিমা (রা), ইমাম হাসান (রা), হযরত ইমাম হোসেন (রা), সৈয়দ জয়নুল আবেদীন, সৈয়দ মুহাম্মদ বাকের, সৈয়দ মুহাম্মদ ইমাম জাফর সাদিক, সৈয়দ আহমদ বলখী, সৈয়দ আবু লুনাস, সৈয়দ আনোয়ারুল বলখী, সৈয়দ আবদুল হক বলখী, সৈয়দ শাহ আলম বলখী, সৈয়দ শাহ আবদুল খালেক বলখী (সমরখন্দী), সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ আবদুল কাদের, সৈয়দ গোদুল হক, সৈয়দ শাহ সুলতান, সালার সমরখন্দী, শাহ বকশী, শাহ আমানত, শাহ জাকারিয়া, শামসউদ্দীন, শাহ মুহাম্মদ ওয়ালী, শাহ আদম ওয়ালী সিন্দ, মুর্তজা, হুসামউদ্দীন (সিন্ধু থেকে মকিমপুর আসেন), শামসুদ্দীন, সলিম উদ্দীন চৌধুরী, মীর এমদাদ আলী। এমদাদ আলীর তিন পুত্র ঃ মীর তোজাম্মল আলী, মীর মোয়াজ্জেম হোসেন, মীর আবদুল্লাহ। কবি সুফিয়া কামাল এই বংশেরই কন্যা।

শায়েস্তাবাদের মীর পরিবার ১৯ শতকে বাকেরগঞ্জের মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত পরিবার ছিল। এই পরিবারের কয়েকজন সরকারী উচ্চ পদে কর্মরত ছিলেন। মীর তোজাম্মল আলী কোম্পানী আমলে জেলার প্রথম ডেপুটী

কালেক্টর ছিলেন। তাঁর ভাই নবাব সৈয়দ মৌলবী মোয়াজ্জেম হোসেন খান বাহাদুর পরিবারের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি আরবী-ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন জেলার প্রথম মুন্সেফ। চাকরি জীবনে বিশেষ অবদান ও সমাজ সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে খান বাহাদুর ও নবাব উপাধি দেন। তিনি নিজেকে বাকেরগঞ্জের নবাব বলতেন। তার জমিদারির মনোগ্রাম ছিল 'Trust in God' -আল্লাহ্য় বিশ্বাস। পরিবারের ভাষা ছিল উর্দু। তিনি ধার্মিক ছিলেন এবং বংশ মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। শায়েস্তাবাদে তাঁর নির্মিত মসজিদে অনেক মূল্যবান পাথর ও কারুকাজ খচিত ছিল। তাঁর একটি বৃহৎ লাইব্রেরী ছিল। তৎকালীন বঙ্গের অন্যতম খ্যাতিমান এই মুসলিম জমিদার ১৯০৯ সনের ৭ই অক্টোবর ৯৯ বছর বয়সে নিজ গ্রামে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাযার এবং মূল বাড়িটি নদীতে তলিয়ে যায়। ১৯৩০ সালের পরে মসজিদটিও নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। জেলায় ধর্ম প্রচার, মসজিদ-মক্তব নির্মাণে দান-খয়রাত ও সমাজ সেবায় এই পরিবারের বিশেষ অবদান রয়েছে। বিশিষ্ট আইনজীবী ডঃ কামাল হোসেন এই বংশের লোক।

দুর্গাপাশার মিয়া

বাকেরগঞ্জ থানার দুর্গাপাশার মিয়ারা পাঠান বংশের লোক। এই বংশের পূর্বপুরুষ মুহাম্মদ হোসেন খান। তিনি রহমত খানের ভাই ও পাঠান সৈন্য ছিলেন। মিয়ারা অনেক ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। পরে তেঁতুলিয়া নদীতে এঁদের সম্পত্তি বিলীন হয়ে যায়।

চরামদ্দির চৌধুরী

সুগন্ধিয়ার সর্দারদের পূর্বপুরুষ শ্রাবণ ঠাকুরের পুত্র আহম্মদের নামে চর আহাম্মদিয়া এবং পরে তা বিকৃত উচ্চারণের সূত্র চরামদ্দি হয়েছে। চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ ঈসা খান ও মুঙ্গা খান দু'ভাই ফরিদপুর জেলার রবিপুর হতে চরামদ্দি গ্রামে আগমন করেন। মুঙ্গা খানের পুত্র রসিদ খান কয়েকটি তালুক ক্রয় করেন। তার পুত্র আরমান আলী খান সিপাহী যুদ্ধের সময় বাকেরগঞ্জে একজন উদীয়মান ভূস্বামী ছিলেন।

আরমান আলীর পুত্র আছমত আলী খান ১৮৬৮ সালে জেলার একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। আছমত আলীর পুত্র ইসমাইল খান। তিনি বঙ্গের একজন বিশিষ্ট মুসলিম রাজনীতিক ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি পৌরসভার পক্ষ থেকে বঙ্গীয় আইন সভার এবং ১৯১৯ সালে ইমপিরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর পুত্র শাহজাহান চৌধুরী জেলার একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সমাজ সেবক ছিলেন। তিনিও সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ইসমাইল খান 'খান বাহাদুর' উপধিতে ভূষিত হন। বরিশালের অন্যতম মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ.কে. ইনস্টিটিউশন ইসমাইল খানের অন্যতম সমাজ কর্মের নিদর্শন।

বরিশালের কাজী পরিবার

শের-এ-বাংলা এ.কে ফজলুল হকের পূর্বপুরুষ নবাবী আমলে বাউফলের কাজী ছিলেন এবং নিষ্কর ভূমি ভোগ করতেন। তাঁর পিতামহ কাজী মুহাম্মদ আকরম ও পিতা মুহাম্মদ ওয়াজেদ চন্দ্রদ্বীপ পরগণার জমিদারি ও তালুকের মালিক ছিলেন। তিনি নিজ মাতুলবাড়ী হতে সেলিমাবাদ পরগণায় তালুক লাভ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ কাজী মুহাম্মদ মুর্তাজা বাউফল থানার বিলবিলাসের অধিবাসী। মুহাম্মদ মুর্তাজার পুত্র কাজী মুহাম্মদ আমিন চাখারের শরীফ বাড়ির সৈয়দ ফজর আলীর কন্যা ফাতেমা খাতুনকে বিয়ে করেন। এই ঘরে কাজী আকরম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চাখারের এমদাদ আলীর কন্যা জিন্নাতুন্নেছাকে বিয়ে করেন এবং চাখারে বসবাস করতে থাকেন। ইনি ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক হকের দাদা।

নাঠৈ-এর সৈয়দ

নাঠৈ-এর সৈয়দদের আদি পুরুষ সৈয়দ আজম মদীনা হতে ইসলাম প্রচারের জন্য বাকলায় আগমন করেন। গৌরনদীর সিহিপাশায় তাঁর মাযার আছে। তাঁর পুত্র সৈয়দ বোরহান উদ্দীন ঠাকুর। পীরালী তাঁদের প্রধান পেশা ছিল এবং ঐ অঞ্চলে তাঁদের অনেক মুরীদ ছিলেন।

কনকদিয়ার তালুকদার

এই পরিবারের আদি পুরুষ শেখ কুতুবউদ্দীন ঢাকা জেলার কদম রসূল হতে বাউফলের ঝিলনা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কোম্পানী আমলে শেখ মনসুর আলী তালুক লাভ করেন। রাজস্ব নিয়ে জমিদারের সাথে বিবাদ হলে তিনি কনকদিয়ার বউলতলী গ্রামে চলে আসেন। তাঁর মামা দেনাতুল্লা মোল্লা হাজী শরীয়তুল্লাহর খলীফা ছিলেন।

কসবার কাজী

কসবার কাজীদের পূর্বপুরুষ কাজী মুহাম্মদ নূর মোগল আমলে দিল্লী হতে গৌরনদী আগমন করেন। এ পরিবারের কাজী গোলাম মাহবুবের কাছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের 'পাঞ্জা' রক্ষিত আছে।

কালিকাপুরের কাজী

নবাবী আমলে শেখ ইয়ার মুহাম্মদ কাজী নিযুক্ত হয়ে মেহেন্দীগঞ্জের কালিকাপুর গ্রামে চলে আসেন। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন।

সুজাবাদের সৈয়দ

সৈয়দ মোস্তফা বাংলার সুবাদার শাহ সুজার কাতিব বা লেখক ছিলেন। তিনি নিষ্কর ভূমি লাভ করে সুজাবাদে বসতি স্থাপন করেন। তিনি দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন।

গৌরবদীর মিয়া

হিজলা থানার গৌরবদী মিয়াদের পূর্বপুরুষ শেখ ঠাকুর নবাবী আমলে একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন। চাঁদপুরে তাঁর মাযার আছে। মাওলানা হেকিম আহসান উল্লাহ ইদিলপুর ও উত্তর শাহবাজপুরের জমিদার প্রফুল্ল নাথ ঠাকুরের চিকিৎসা করে কোম্পানী আমলে তালুক লাভ করেন।

বরিশালের ইতিহাস ও প্রশাসনিক বিন্যাস

'জেলা গেজেটিয়ার' বরিশালের আদি প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে নীরব। 'জেলা গেজেটিয়ার'-এর মতে বৈদিক যুগে বরিশালের অস্তিত্ব ছিল না, কারণ বৈদিক সাহিত্যে এই অঞ্চলের কোন উল্লেখ নেই। এই একটি কারণেই বরিশালের প্রাচীনত্ব নিয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। আর্যরা ভারতে যখন পুরোপুরি পুনর্বাসিত, তারও বহুকাল পরে বাংলাদেশের সাথে তাদের সংশ্রব ঘটে। বিশেষ করে, এখনও যেখানে বরিশাল অগম্য, সেখানে উত্তর ভারতে পুনর্বাসিত আর্যদের পক্ষে নদী-সমুদ্র বেষ্টিত দক্ষিণ বাংলার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন ছিল। উপরন্তু সমুদ্র যাত্রায় ছিল আর্যদের ভীতি ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা। অন্যদিকে ভারতে আর্যদের আগমন ঘটেছে স্থলপথে। সুতরাং যে এলাকার সাথে বৈদিক আর্যদের পরিচয় নেই, তার সম্পর্কে তাদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'-এ উল্লেখ না থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং এই একটি মাত্র কারণে এ কথা বলা যায় না যে, বৈদিক যুগে বরিশালের অস্তিত্ব ছিল না। তবে ঐ সময়ে বরিশালের অস্তিত্ব প্রমাণ করার বিকল্প তথ্য-প্রমাণও আমাদের নাগালে নেই। সেন বংশের শাসনামলের পূর্বের কোন ইতিহাস তথ্য পাওয়া যায় না।

আদি অধিবাসী

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় এ জেলার অধিবাসীরা কোল, ভিল ও অন্যান্য উপজাতীয়দের উত্তরপুরুষ বলে মনে হয়। পণ্ডিতগণ এদেরকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অষ্ট্রিক শ্রেণীর বলে মনে করেন। এরা নিশাদ নামেও পরিচিত। সঙ্গত কারণেই মানব বসতির স্বাভাবিক ধারায় বাংলাদেশে জনবসতি গড়ে উঠেছে। বরিশালের জনবসতির ইতিহাস এর থেকে আলাদা নয়। তবে এ ব্যাপারে পণ্ডিত গবেষকরা নিশ্চিত যে, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী মিশ্র ধারার। সম্ভবত বিশ্বের প্রায় সবগুলো মানবগোষ্ঠীর বেলায়ই এটা সত্য।

পণ্ডিতদের মতে, বাংলাদেশে মূল দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেনি। তবে দ্রাবিড় রক্তের ধারার সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী যে এ দেশে এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গুপ্ত রাজবংশের সমুদ্র গুপ্তের সময় থেকে (৩৪০–৩৮০ খৃ) জেলার ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি সমতট নামে একটি করদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐতিহাসিক ডঃ আর. সি. মজুমদারের মতে উত্তরবঙ্গ এবং ফরিদপুর এলাকা সহ পশ্চিমবঙ্গ সমুদ্র গুপ্তের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাকেরগঞ্জ জেলাসহ সমগ্র বাংলাদেশ একদা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পণ্ডিতদের মতে, সমতট বলতে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলাকেই বোঝায়। ৫০৭–০৮ খৃষ্টাব্দে–বৈন্যগুপ্ত সমতট রাজ্যের শাসক ছিলেন। বৈন্যগুপ্ত গুপ্ত পরিবারের সদস্য হলেও তিনি গুপ্ত রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ–পূর্ব বাংলা স্বাধীন হয়। গোপাল চন্দ্র, ধর্মাধিপত্য, নরেন্দ্রাদিত্য প্রমুখ শাসন কাজ পরিচালনা করেন।

সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে শশাঙ্ক গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্ত রাজবংশের মহাসামন্ত গুপ্তের অমাত্যরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল কর্ণ সুবর্ণ।

সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি গুপ্ত বংশের শেষদিকের নরপতিগণের গৌড়, মগধ এবং দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় ক্ষমতা বিস্তারের সময়ে খড়্গ নামক নতুন রাজবংশের উথান ঘটে। অনেকে অনুমান করেন যে, বর্তমান বাকেরগঞ্জ এলাকা এই রাজাদের শাসনাধীন ছিল।

খড়্গ রাজত্বের পতনের পর অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমতট রাজ্যে দেব বংশের লোকেরা ক্ষমতায় আসেন। কুমিল্লা জেলার ময়নামতি এলাকায় আবিষ্কৃত দুটি ফলক থেকে জানা যায় যে, দেব রাজগণ অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তবে বাকেরগঞ্জ জেলায় দেব বংশের শাসন বিস্তৃত হয়েছিল কি না, তা জানা যায় না।

চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত কান্তিদেবের তাম্র শাসন থেকে জানা যায় যে, নবম শতাব্দীতে দেব শাসকদের পতনের পর কান্তিদেব দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় ক্ষমতা

বিস্তার করেন। কান্তি দেব এবং তাঁর বংশের রাজার হরিকেলের শাসক হিসেবে নিজেদের দাবি করতেন। হরিকেল নামের দ্বারা সংকীর্ণ অর্থে সিলেট অঞ্চল এবং ব্যাপক অর্থে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাত। রামপালে প্রাপ্ত শ্রী চন্দ্রের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, ত্রৈলোক্য চন্দ্র প্রথমে হরিকেলের রাজাদের একজন সামন্ত ছিলেন। এই ত্রৈলোক্য চন্দ্র এবং কান্তি দেবের রাজ্য সীমা বর্তমান বাকেরগঞ্জ, জেলার চন্দ্রদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে চন্দ্র বংশের শাসকরা বাকেরগঞ্জসহ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

সেন বংশের তৃতীয় রাজা বিজয় সেন গৌড় থেকে পাল রাজাদের উৎখাত করেন এবং বর্মণদের বিতাড়িত করে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেন।

'ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী রাজা লক্ষণ সেনের কাছ থেকে নদীয়া-লক্ষণাবতী এবং অন্যান্য স্থান দখল করে নেন এবং উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে মুসলিম শাসন দক্ষিণবঙ্গে প্রসারিত হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের (১২৬৬-১২৮৬) রাজত্বকালে মুগিসউদ্দীন তুঘ্রল বাংলার প্রশাসক (১২৬৮-১২৮১) নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনামলে আধিপত্য ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে পূর্ব এবং দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তৃত হয়। অনুমান করা হয়, এই সময় মুসলিম শাসন ঢাকা এবং ফরিদপুর জেলায় বিস্তৃত হয়। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদী বিধৌত বদ্বীপ অঞ্চল ১৩০১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের দখলে চলে আসে। পূর্ববঙ্গে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে বাকেরগঞ্জ ভূখণ্ডে মুসলিম শাসন কখন বিস্তার লাভ করেছিল, তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। জানা যায় ১৫০০ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের পরবর্তী সুলতানদের আমলে (১৪৩৬-৮৬ খৃষ্টাব্দে) সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রখ্যাত দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক খান জাহান আলীর দরগাহ্ বাগেরহাটে অবস্থিত। যশোর, খুলনা ও সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলে মুসলমান রাজ্য সম্প্রসারণে তাঁর বিশেষ অবদান আছে। এ সময় মুসলমান রাজ্যের সীমানা বাকেরগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সুন্দরবন এলাকার একটি মসজিদের গায়ে খোদিত লিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গুলশাসালী থানার (পটুয়াখালী) কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে মীর্জাগঞ্জ-বিঘাই নদীর একটি শাখার পাশে মসজিদবাড়ী গ্রামে ইট দ্বারা তৈরি এই মসজিদটি অবস্থিত। সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র আবুল মোজাফফর বরবক শাহের রাজত্বকালে ৮৭০ হিজরী সনে (সম্ভবত ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দ) খান মোয়াজ্জেম ওজিয়েল খান কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হয়। সম্ভবত ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে মসজিদের খোদিত লিপি অনুযায়ী এই জেলা সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪) খৃষ্টাব্দে রাজ্যের একটি অংশ ছিল। বাখরগঞ্জ থানার শিয়ালঘুনী গ্রামে আরও একটি প্রাচীন মসজিদ আবিষ্কৃত হয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী জনৈক নুসরত গাজী এই মসজিদ নির্মাণ করেন। মনে হয়, মসজিদটি এককালে খুব বর্ণাঢ্য ছিল। এই মসজিদের কাছে পীলখানা গ্রাম অবস্থিত। এতে ধারণা হয় যে, এখানে সুলতানদের একটি হাতীশালা ছিল এবং এই মসজিদটি বাংলার সুলতানদের মুসলিম শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। আরও একটি প্রাচীন মসজিদ গৌরনদী থানার রামসিদ্ধি গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। গৌরনদীর কস্‌বার মসজিদটিও বেশ প্রাচীন।

পূর্ব বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সময় বাকেরগঞ্জ এলাকায় একটি ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যশক্তির উদ্ভব ঘটে বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রাজ্যের নাম চন্দ্র দ্বীপ-বাকলা। ডঃ কানুনগোর মতানুসারে সোনারগাঁয়ের দনুজ রায় মুসলিম বিজয়ীদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার পর এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই মতের পক্ষে তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে চন্দ্রদ্বীপ-বাকলা রাজ পরিবারের তেমন কোন পারিবারিক নথিপত্রে পাওয়া যায় না। 'বাকেরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার'-এর মতে "এই বংশের সামান্য যা নথিপত্র ছিল, তা উন্মাদ রাজা শিব্রাইন (Sibrain) পুড়িয়ে ফেলেন। এই পারিবারিক ঐতিহ্য, স্থানীয় জনশ্রুতি, কিছু মুদ্রা এবং পরবর্তীকালের নথিপত্রের মাধ্যমে

ঘর পারবার সম্পর্কে কিছুটা ধারাণা করা যায়। পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র দ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রমনাথ দনুজ মর্দন দে। ইদিলপুরের ঘটক সম্প্রদায়ের দলীলপত্র অনুযায়ী এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দনুজ রায় কায়স্থ।"

স্থানীয় জনশ্রুতি এবং প্রাপ্ত নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে চন্দ্রদ্বীপ পরিবারের একটি বংশ তালিকা তৈরি করা হয়েছে। দনুজ মর্দন রায়ের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন রাম বল্লভ, হরিবল্লভ এবং কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লাভের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তার কন্যা কমলা দেবী উত্তরাধিকারিণী হন। বলবর্ধন বসুর সাথে কমলা দেবীর বিয়ে হয়। কমলা দেবীর পুত্র শিবানন্দ (পরমানন্দ রায়) ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী এবং চন্দ্রদ্বীপের বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। পরমানন্দের উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন জগদানন্দ, কন্দর্প নারায়ণ এবং রামচন্দ্র। মেহেন্দীগঞ্জে এই পরিবারের লোকেরা প্রথম বসতি স্থাপন করেন। পরে কচুয়ায় (বাউফল থানায়) এবং সবশেষে বরিশাল শহর থেকে সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমদিকে মাধবপাশায় বসতি স্থাপন করেন। উল্লেখ্য, এই কচুয়ায় এককালে বাকলা রাজ্যের রাজধানী ছিল বলেও অনুমান করা হয়। স্থানটি তেঁতুলিয়া নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সম্ভবত সে কারণেই কন্দর্প নারায়ণ মাধব পাশায় নতুন বসতি গড়ে তোলা হয়। কমলা রাণী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে যে দীঘি খনন করিয়েছিলেন, কচুয়ার অদূরে কালাইয়া গ্রামে তা আজও স্মৃতি-চিহ্ন নিয়ে অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। পরমানন্দ রায়, জগদানন্দ এবং কন্দর্প নারায়ণ ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে। বাকলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দনুজ মর্দন দে আসলেই কি হিন্দু ছিলেন? তিনি কি সেন রাজাদের সংস্কৃতির উত্তরসূরী? আর্যরা সমুদ্রবিহারী ছিল না; বরং তারা সমুদ্র যাত্রাকে ধর্মীয়ভাবে পাপকার্য মনে করত। অথচ দক্ষিণ বাংলার দুর্গম এলাকায় যারা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁদের সমুদ্র বা নৌ-পথ ব্যবহার করার কোন বিকল্প ছিল না। বৈদিক হিন্দুদের পক্ষে

এমনটা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা রাজ্যটিকে আমরা হিন্দু রাজ্য না বলে অমুসলিম রাজ্য বলতে পারি। এখানে আরও একটি প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বরিশাল এলাকায় যখন কথিত হিন্দু রাজ্য গড়ে উঠে, তার আগে কি তাহলে ঐ এলাকায় মুসলিম জনবসতি ছিল না? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। এ ব্যাপারে আরও ব্যাপক গবেষণা হওয়া দরকার। তবে কিছু কিছু ঘটনা-প্রবাহ থেকে এটা বলা যায় যে, 'হিন্দু' রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগেও বরিশাল অঞ্চলে মুসলমানদের বসতি ছিল। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। এখন পর্যন্ত বরিশালের প্রাচীন ইতিহাসের যে সঞ্চয় পাওয়া যায়, তা হচ্ছে বৃটিশ-হিন্দু মিলিত প্রয়াসে রচিত জেলা গেজেটিয়ার। একমাত্র এই একটি গবেষণা কর্মের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।

এইচ ব্লকম্যানের মতানুযায়ী চন্দ্র দ্বীপ-বাকলা প্রায় ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। মুসলিম সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খৃষ্টাব্দ) সময় এই রাজ্য মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় থেকে চন্দ্র দ্বীপ-বাকলা মুসলিম সুলতানদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ইতিহাস এ ব্যাপারে যথেষ্ট আলোকপাত না করলেও এটা জানা যায় যে, এ রাজ্য প্রচুর সমৃদ্ধ ছিল। হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫৩৮ খৃ) ও শের শাহের (১৫৩৯-১৫৪৫ খৃ) আমলে এবং তাঁর উত্তরাধিকারী আফগান শাসকদের (১৫৪৫-১৫৭৬ খৃঃ) সময়েও এ রাজ্য মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এ কারণেই এখানে যথেষ্ট সংখ্যক মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

রাজমহলের যুদ্ধে সর্বশেষ আফগান শাসক দাউদ খান করাণী (১৫৭৬) নিহত হওয়ার পর বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ঘটে। এবং এই অঞ্চল মুঘল সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন। স্বাধীনভাবে তিনি তাঁর জমিদারি শাসন করতেন। বাংলার অন্যান্য স্বাধীন জমিদারদের মতো তিনিও মুঘল শাসনের বিরোধিতা করতেন। এ মত সত্য হলে ডঃ কানুনগোর মত সত্য বলে মানা যায় না। তিনি বলেছেন, দনুজ মর্দন দে বারো ভুঁইয়াদের দ্বারা বিতাড়িত হন। প্রকৃতপক্ষে মুঘলদের

দ্বারা বঙ্গ বিজয়ের পর থেকেই চন্দ্রদ্বীপ–বাকলার ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণ শুরু হয়। ফলে বাকলার প্রাচীন ইতিহাস আজও রহস্যের পাথর চাপা পড়ে আছে। আবুল ফজলই প্রথম ঐতিহাসিক, যিনি বাকলা সম্পর্কিত কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ফলে বাকলার প্রাচীন ইতিহাস থাকলেও প্রামাণ্য তথ্য সূত্রের অভাবে আমাদের পেছনে যাওয়ার সুযোগ সীমিত। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে টোডরমলের রাজস্ব তালিকায় বাকলা একটি সরকার ছিল এবং বাকলা, শ্রীরামপুর, শাহবাজপুর ও ইদিলপুর এই চারটি পরগণা–এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বছরে ১,৮০,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হতো। আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই সরকারের ৩২০ জন অশ্বারোহী এবং ১৫,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। বাকলা শহরটি সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। দুর্গের অবস্থান ছিল বনবৃক্ষাচ্ছাদিত।

তবে বাকলা শহরটি ঠিক বরিশাল জেলার কোন্ স্থানটিতে অবস্থিত ছিল, তা নির্ণয় করা দুরূহ। প্রথমত. এ শহরটি যদি সমুদ্র তীরে অবস্থিত হয়ে থাকে, তাহলে নদীগর্ভে তা বিলীন হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত. সম্ভবত ঐ সময় সমুদ্র আরও উত্তরে প্রসারিত ছিল। বর্তমানে সমুদ্রে নতুন নতুন ভূখণ্ডের উদ্ভবের ফলে খেপুপাড়া কুয়াকাটার দক্ষিণে সরে গেছে। তৃতীয়ত. সমুদ্র তীরে বাকলার অবস্থান থেকে এটা স্পষ্ট যে, তৎকালীন নৌ–পথ ভিত্তিক যাতায়াত ব্যবস্থায় এমন একটি স্থানকে রাজধানী হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে যে স্থানের সাথে নৌ–পথে আন্তঃ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজ। প্রাচীনকালে আফ্রিকী–আরব বণিকরা যখন বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর চীনের বন্দরে তাদের জাহাজ ভিড়াতো ঐ সময় বাকলা বন্দরের সাথেও যে তাদের সংযোগ ঘটতো না বা তারা যাত্রা বিরতি করত না, তারই বা নিশ্চয়তা কি ! চট্টগ্রাম শহরের সাথে আরব বণিকদের যোগাযোগ ঘটে থাকলে বাকলার সাথে ঘটা তো খুবই স্বাভাবিক। প্রাচীন সন্দ্বীপকে ঐতিহাসিকরা সমৃদ্ধ ও বিশ্ববিশ্রুত নগর–বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এবং সেখানে মুসলিম রাজত্বের কথাও জানিয়েছেন। প্রাচীনকালে সন্দ্বীপ সহ গোটা দক্ষিণ বঙ্গ ছিল সমুদ্র বেষ্টিত। নদীপথে গোটা এলাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা যে গড়ে উঠেনি, তাই বা বলি কিভাবে?

এমনকি আরবীয় বণিকদের দ্বারা প্রধানত সমৃদ্ধ ও বিকশিত চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে বাকলার যে কোন সংযোগ ছিল না, এটাও বলা যাবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, চট্টগ্রাম যখন আরবীয় বণিকদের কাছে আকর্ষণীয় সমুদ্র বন্দর, তখন বাকলা গড়ে উঠেছিল কি না? দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এ তথ্যটি ইতিহাসের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা কঠিন। এ ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদী ও বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা হওয়া দরকার। এমনটা হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে, বাকলা শহরটিই কচুয়ায় অবস্থিত ছিল। এ কথা সত্য যে, বরিশাল অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই সমসাময়িককালের পলিগঠিত। তবে এ দ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না যে, পুরো বরিশালই নদী গর্ভ থেকে স্বল্পকাল আগে মাত্র উত্থিত হয়েছে। বরিশাল এলাকায় ভূমি গঠন ও তার বিলুপ্তির যে প্রক্রিয়া এখনও দৃশ্যমান, সেটি অতীতেও সচল ছিল। ফলত বরিশাল এলাকায় যেসব জনপদ আজ দৃশ্যমান, পুরাকালে একই স্থানে যে ভাঙ্গাগড়ার খেলা চলেনি, তা বলা যাবে না। বরিশালের বহু চর এলাকায় আজ থেকে পঞ্চাশ বা এক শ বছর আগে কোন জনবসতিই ছিল না। আবার নতুন চর জেগে ওঠার সাথে সাথেই প্রমত্তা খেয়ালী নদীর অভিঘাতে তা ভেঙ্গে যায়। সম্ভবত এমন ক্ষণস্থায়ী জনপদ দুনিয়ার আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ থেকে আমরা অন্তত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বরিশাল এলাকার পুরো জনপদই একাধিক ভাঙ্গাগড়ার শিকার হয়েছে। তবে ভাঙ্গাগড়ার নীরব সাক্ষী বরিশাল এলাকার জনবসতি হালের নয়। দুরন্ত প্রকৃতি ও নদী-সমুদ্রের নির্দয় আচরণের সাথে তারা দীর্ঘদিন থেকেই পরিচিত এবং সহনীয়। তারা বার বার নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বসতি গড়ে তুলেছে। ফলে বরিশাল এলাকার জনবতি গড়ে উঠার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা দুরূহ। এ ছাড়া ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস এ এলাকার জনগণের নিত্য দিনের সাথী। সম্রাট আকবরের শাসনামলে ১৫৮৪ সালে একটি মারাত্মক প্লাবনের কথা জানা যায়। এটি সমগ্র বাকলা এলাকায় মহাপ্লাবন হিসেব ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় সমুদ্রও মারাত্মকরূপে আন্দোলিত হয়ে উঠে। বাড়িঘর, নগর, জনপদ, নৌকা, গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ

ও জীবজন্তু এই প্লাবনে প্রাণ হারায়। ১৯৭০ সালের ভয়াল জলোচ্ছ্বাসেও দশ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। এসব কারণেও বরিশাল এলাকার জনবসতির আদি উৎপত্তি সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য উদ্ধার করা কঠিন।

বৃহত্তর বরিশাল জেলার সমগ্র ভূখণ্ড বাকলা রাজ্য বা বাকলা জমিদারির অন্তর্গত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এর বদ্বীপীয় অঞ্চল ছিল উর্বর। এককালে এ জেলা ছিল 'শস্য ভাণ্ডার'। ফলে এলাকার প্রকৃতি হিংস্র ও নির্দয় হলেও অতি দ্রুত জনবসতি গড়ে উঠেছে। এ জেলার অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। তবে নদীতে মাছ ধরা কিংবা নৌ–পথে ব্যবসা–বাণিজ্যও তাদের জীবিকার মাধ্যম। 'বাখরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার'–এর মতে, ''বাকলার রাজা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি খৃষ্টানদের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। নৌকায় করে শিকার করতে তিনি আনন্দ পেতেন। তাঁর রাজ্য ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশে প্রচুর খাদ্য, সূতী বস্ত্র এবং রেশমী বস্ত্র ছিল। ঘরবাড়িগুলি ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং উঁচু রাস্তাগুলি ছিল বেশ চওড়া।"

আর্য নিরিখে বাকলার রাজা হিন্দু ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে তিনি মুসলমান ছিলেন না, এটা বলা চলে। আর্য–মানুষ তাড়িত হিন্দুরা কখনও সমুদ্র বা নৌ–পথে শিকারে বের হতে পারে না। কেননা, সমুদ্র বা নৌ–পথে ভ্রমণ তাদের ধর্মে বারণ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একথা সত্য যে, পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আগমনের আগে, খোদ মক্কাই মূর্তি উপাসকদের আখড়া ছিল। তৌহিদের মৌলিক শিক্ষা বিস্মৃত হয়েছিল তারা। ইসলাম মূর্তি পূজকদের তৌহিদবাদী মুসলমানে পরিণত করে। বাংলার সব এলাকায় একই সময় ইসলাম প্রচারিত হয়নি। সুতরাং বাকলা এলাকায় ইসলামের বিজয়ের আগে অমুসলিম শাসক থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তবে সুনির্দিষ্টভাবে সপ্রমাণ, এ কথা বলার কোন কারণ নেই যে, ঐ সময়কার শাসক বৈদিক হিন্দু ছিলেন। ঐ শাসকও মিশ্র ধারার সেমেটিক কোন উত্তরপুরুষ যে নন, তারই বা প্রমাণ কি?

'বাখরগঞ্জ গেজেটিয়ার' সূত্রে জানা যায় যে, বাকলা প্রাথমিক পর্যায়ে পর্তুগীজদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। পর্তুগীজদের নথিপত্র থেকে জানা

যায় যে, বাকলার রাজা পরমানন্দ ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ভারতের তৎকালীন পর্তুগীজ বড়লাটের (ডোম কনস্টনটিন্‌স ডি বড়গঞ্জা) সাথে এক বাণিজ্য ও সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। রাজার পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তাঁর সহকারী নিয়ামত খান এবং গণু বিশ্বাস। ঐতিহাসিকদের ধারণা, এই সময় তারা শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য গোয়া যান। রাজা পর্তুগীজদের ব্যবসা–বাণিজ্যের জন্য বাকলা বন্দর বা জমিদারির অন্য কোন বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দান করেন। এই ব্যবসায়ীদের সাথে সদয় ব্যবহার করা হতো। উপকূল ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে পর্তুগীজ মালবাহী জাহাজগুলো বন্দর শুল্ক না দিয়ে বাকলা থেকে পয়গ্রাম (খুলনা) পর্যন্ত চলাচল করত।

"রাজার দেওয়া সুযোগ–সুবিধার পরিবর্তে পর্তুগীজরা চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত যে বাণিজ্যিক পথ ব্যবহার করত, তা বন্ধ করে দেয়, বাকলার রাজাকে বন্দরে দেয় বৈধ কর দিতে সম্মত হয় এবং বাণিজ্যের জন্য চারটি জাহাজকে গোয়া, তরমুজ ও মালাক্কায় প্রতি বছর যাতায়াতের জন্য অনুমতি দেন, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য–সামন্ত দিয়ে সাহায্য করার জন্য পর্তুগীজরা চুক্তিবদ্ধ হয় এবং রাজা তাদেরকে এর বিনিময়ে বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণে চাল, মাখন, তেল, আলকাতরা, চিনি এবং তাঁতের কাপড় দিতে সম্মত হন। অন্যান্য অঞ্চলের প্রধানদের সঙ্গেও পর্তুগীজদের অনুরূপ মৈত্রী স্থাপন করার অধিকার স্বীকার করা হয়। অপরপক্ষে রাজা পর্তুগীজদের শত্রুদের সঙ্গে কোন মৈত্রী স্থাপন করতে পারবেন না সিদ্ধান্ত হয়।

বলা বাহুল্য, ইউরোপীয়দের ভারত ও বাংলায় আসার বহুকাল আগে থেকেই আরবরা এ এলকায় আগমন করেন। নৌ–পথ সম্পর্কে সেমেটিক আরবরাই সম্ভবত অভিজ্ঞ জাতি। কলম্বাসের আগেই মুসলমানরা আমেরিকার অবস্থান জানতো। ভাস্কো দা গামার গাইড ছিলেন আরবীয় ভূগোলবিদ আবদুল মজিদ। ক্রুসেডীয় উত্তেজনা–উত্তরকালে মুসলমানদের অবক্ষয়ের প্রাক্কালে ইউরোপে জাতিগোষ্ঠীগুলোর মাঝে রেঁনেসার সূত্রপাত। এককালে মুসলমানদের

রণপোত ও বাণিজ্য জাহাজই ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল সমুদ্র কাঁপিয়ে রাখত। কিন্তু ক্রমে মুসলিম শক্তির অবক্ষয় সূচিত হয়। মুসলমানদের পরিচিত ও আবিষ্কৃত এ বাণিজ্যপথ চলে যায় ইউরোপীয়দের দখলে। পর্তুগীজরা তাদেরই একটি শাখা। সুতরাং পর্তুগীজদের বাকলা রাজার সাথে যোগাযোগ ঘটারও বহু আগে অতি স্বাভাবিকভাবেই আরবীয় মুসলমান বণিকদের বাকলায় আগমন ঘটে থাকবে। ইতিহাস এ ব্যাপারে একমত যে, বাকলা একটি স্বাধীন ও স্বনির্ভর রাজ্য ছিল। তার যেমন স্বদেশী শত্রু ছিল, তেমনি ছিল বিদেশী মিত্রও। খুব সম্ভবত পর্তুগীজদের সাথেও বাকলা রাজার যুদ্ধ–সংঘাত হয়ে থাকবে। এর পটভূমিতেই হয়তো শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তবে রাজা পরমানন্দের দুজন সহকারীর পরিচয় যেহেতু মুসলমান, তাতে সহজেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, বাকলা রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি নগণ্য ছিল না। এবং বাকলা রাজ্যে মুসলমানদের বসতির সূচনাও মাত্র দু পাঁচ শ' বছর আগে থেকে ঘটেনি। উপরন্তু বাকলা রাজ্যের নাম যে পরমানন্দ তারই বা অকাট্য প্রমাণ কি। বৈদিক আর্যরা যেমন ভারতের অন্যত্র ইতিহাস বিকৃত করেছেন, এ ক্ষেত্রেও যে বাকলা রাজার নামটি বিকৃত করেননি, তারই বা নিশ্চয়তা কি?

গোয়ার মিশনের প্রধান ফাদার নিকোলাস প্রিমেন্টার লিখিত ১৬০০ খৃষ্টাব্দের এক চিঠিতে বাকলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বাকলার রাজা রামচন্দ্র সহ বাংলার বারো ভুঁইয়াদের মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বরিশাল জেলার দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন এলাকা এবং নলছিটি বন্দরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগদের বসতি আছে। এছাড়া পটুয়াখালীর দক্ষিণে খেপুপাড়া এলাকায়ও ঘন বসতি রয়েছে। বাকলা রাজার অনুমতি নিয়েই পর্তুগীজ মিশনারীরা এ জেলায় খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করে। বরিশালের পাদ্রী শিবপুর এবং গৌরনদীতে এখনও খৃষ্টান বসতি আছে। বরিশাল শহরেও খৃষ্টানদের বেশ কয়েকটি গীর্জা আছে।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন ঃ "বাকলা একটি দেশ এবং সেখানে একটি বন্দর রয়েছে।" রালফ ফিচ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকলা পরিদর্শন করেন। তিনিও বাকলায় সুন্দর বাড়িঘর উঁচু অট্টালিকা এবং সুবৃহৎ রাস্তাগুলোর প্রশংসা করেছেন। মেলকয়ের দ্য ফনসেকা (Melchoir Da Fonseca) ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে বাকলা রাজ্যের ভেতর দিয়ে পরিভ্রমণ করার সময় বাকলা শহরে কিছুদিন অবস্থান করেন। এসব তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে, বাকেরগঞ্জ জেলার প্রায় সব অঞ্চলই চন্দ্রদ্বীপ রাজ পরিবারের আওতায় ছিল এবং গোটা অঞ্চলই বাকলা নামে অভিহিত ছিল। বাকলা বলতে বাকেরগঞ্জের মূল ভূখণ্ডকেই বোঝাত। রাজা পরামানন্দ রায় এবং তার উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে বাকলা ও চন্দ্রদ্বীপ সমার্থক ছিল। তবে বর্তমানে এই জেলার কোথাও বাকলা নামে কোন জনপদ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভ্যান ডেন ব্রাউক (Van Den Broucke) প্রণীত ম্যাপে বাকলাকে একটি দ্বীপ হিসেবে দেখানো হয়েছে। হেনরী বেভারীজ মনে করেন, বাকলাই কচুয়া নামে অভিহিত হতো। ১৮৭৪ সালে তিনি কচুয়া ভ্রমণ করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সে সময়ে সেখানে পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দির, রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ছাড়া কিছুই দেখতে পাননি। রাজবাড়িটি চারদিক থেকে জঙ্গলে ঢাকা ছিল। মন্দিরগুলো ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট এবং মোচাকৃতি। সম আকৃতির মন্দির বা মঠ এখনও বরিশাল এলাকায় দৃশ্যমান।

সত্যিকথা বলতে কি, সর্বনাশা নদীর ভাঙ্গন বাকলা ও তার প্রাচীন কীর্তি, স্মৃতি-চিহ্ন ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। আর এ কারণেই ঐতিহাসিক গবেষকদের বিভ্রান্ত হতে হচ্ছে। কচুয়া থেকে পাঁচ-ছ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে এবং সাবেক বাকেরগঞ্জ জেলার সদর দফতরের উল্টোদিকে 'বগা' নামক একটি সমৃদ্ধ বন্দর এখনও দেখা যায়। কে জানে এটিও বাকলার অপভ্রংশ কি না।

অনেক ঐতিহাসিক প্রাচীন বেঙ্গলা শহরের সাথেও বাকলাকে সমার্থক ভাবেন। অনেকে বঙ্গদেশের একটি অনাবিষ্কৃত অথবা স্বল্প পরিচিত শহর বেঙ্গলাকেই বাকলা বলতে চান। ইটালিয়ান ব্যবসায়ী লুইস ভারথেমা (Lewis Verthema) প্রথম বেঙ্গলা শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। টেনারসেরিম

(Tenarsserim) থেকে তিনি জাহাজ যোগে এখানে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন ; "এমন একটি সুন্দর শহর আর কখনও দেখেননি। এখান থেকে তখন (১৫০৩–১৫০৮ খৃ) প্রচুর পরিমাণে তুলা ও রেশম রপ্তানী হতো।" পর্তুগীজ ব্যবসায়ী বারবোসা ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে এই বেঙ্গলা শহর পরিভ্রমণ করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় সহ এ শহর একটি সমুদ্র বন্দর ছিল। তিনি আরও লিখেছে যে, এ শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিলেন মুসলমান। তাদের অনেকেই ছিলেন বড় ব্যবসায়ী এবং জাহাজ মালিক। বেঙ্গলা শহরবাসীর উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম সূতী বস্ত্র, চিনি ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে ব্যবসায়ীদের দ্বারা করমণ্ডল, মালাবার, ক্যাম্বে, শ্রীলংকা, সেমু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা এবং মালাক্কায় রফতানী করা হতো। এই দু'জন বিদেশী বণিকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বোঝা যায়, ষোল শতকের শুরুতে বঙ্গোপসাগরের মুখে বেঙ্গলা একটি সমৃদ্ধ বড় ধরনের বন্দর ছিল। তবে অন্য কোন পরিব্রাজক বা ঐতিহাসিকের বর্ণনায় এ শহরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ভারথেমা এবং বারবোসা সিটি অব বেঙ্গলা নামক বন্দর শহরের উল্লেখ করেছেন কিন্তু চট্টগ্রাম, সাতগাঁও, গৌড়, সোনারগাঁও, শ্রীপুর, বাকলা এবং সন্দ্বীপের মত সুপরিচিত শহরগুলির নাম উল্লেখ করেননি। তাঁরা এসব শহরের মধ্যে যে কোন একটিকে বেঙ্গলা নামে অভিহিত করেছিলেন কি না, অথবা সিটি অব বেঙ্গলা আলোচিত শহরগুলোর মধ্যে যে কোন একটি শহর ছিল কি না, তা ঠিক জানা যায় না।

ভারথেমা এবং বারবোসা সিটি অব বেঙ্গলা পরিভ্রমণ করার পর নিজেদের যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, ভারথেমা টেনাসেরিম থেকে যাত্রা করার এগারো দিন পর সিটি অব বেঙ্গলায় উপস্থিত হন। বারবোসা ও উড়িষ্যা থেকে জাহাজ যোগে এখানে আসেন।

বারবোসা দেশের অভ্যান্তরে এবং সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত শহরগুলোর মধ্যকার পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বেঙ্গলাকে একটি সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বেঙ্গলা রাজ্যের অভ্যান্তরে এবং সমুদ্র উপকূলে তিনি

অনেকগুলো শহর দেখতে পেয়েছিলেন। সমুদ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই উপসাগর দেশের উত্তরদিকে অনেকটা ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট ছিল এবং এর শেষ প্রান্তে অবস্থিত মূর অধ্যুষিত সুন্দর পোতাশ্রয়সহ শহরটির নাম ছিল বেঙ্গলা।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম একটি বড় সামুদ্রিক বন্দর হলেও এটি উপসাগরীয় এলাকার একেবারে মুখে অবস্থিত নয়। সাতগাঁও, গৌড়, সোনারগাঁও এবং শ্রীপুর নদী বন্দর বাংলার উপসাগরীয় উপকূল থেকে অনেক ভেতরের দিকে অবস্থিত ছিল। পোর্ট অব বেঙ্গলার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যই এই নদী বন্দরগুলোর ছিল না। সন্দ্বীপ, হাতিয়া এবং অন্য দ্বীপগুলোর অবস্থান ছিল বাংলার উপসাগরীয় এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং এই দ্বীপগুলো গংগা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার মিলিত জলস্রোতের মুখে অবস্থিত ছিল। তাহলে প্রশ্ন আসে, সন্দ্বীপই কি উল্লেখিত সিটি অব বেঙ্গলা? ভেনিসের বণিক সিজার ফ্রেডারিক এবং রালফ ফিচ দুজনেই লবণ ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে সন্দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। তখনও সন্দ্বীপ ছিল পরিচিত শহর। সুতরাং ইউরোপীয় বণিকরা সন্দ্বীপকে সিটি অব বেঙ্গলা বলে অভিহিত করবেন এটা মনে করা যায় না। এই পটভূমিতে পণ্ডিতদের সুচিন্তিত প্রশ্ন, তাহলে বাকলাকেই তাঁরা সিটি অব বেঙ্গলা বলে চিহ্নিত করেছেন?

১৫৪৯ ঈসায়ী পর্তুগীজরা বাকলার রাজার সাথে ব্যবসা এবং সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং তারা বাকলাকে চট্টগ্রামের একটি নদী বন্দর হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

আবুল ফজলের বর্ণনাকে সঠিক ধরে নিলে বাকলার অবস্থান ছিল সমুদ্রের উপকূলে। বাকলাকে একটি সামুদ্রিক বন্দর ধরে নিলেও সিটি অব বেঙ্গলার প্রধান বৈশিষ্ট্যের সংগে এর কোন মিল নেই। ভারথেমা এবং বারবোসা উভয়েই বলেছেন যে, সিটি অব বেঙ্গলা মুসলিম সুলতানদের অধীনে ছিল এবং এই বন্দরে বড় বড় মুসলিম ব্যবসায়ীরা বাস করত। বাকলা রাজ্য, গৌড়ের মুসলিম সুলতানের প্রতিনিধি এক হিন্দু রাজার দ্বারা শাসিত হয়েছে বলে উল্লেখিত হলেও রাজ্যটির অধিবাসী অধিকাংশই তখন মুসলমান থাকতে পারেন।

ঐতিহাসিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান যে, বেঙ্গলা বঙ্গোপসাগরের একেবারে অভ্যন্তরে কোন দ্বীপে অবস্থিত ছিল এবং গংগা ও অন্য নদীগুলো এই শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ভেনিকোর গস্তালদী এশিয়ার যে মানচিত্র প্রকাশ করেন তাতেও বেঙ্গলা ও সাতগাঁও-এর উল্লেখ আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বেঙ্গলা শহর গংগা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মোহনায় অবস্থিত ছিল।

সন্দ্বীপ একটি সমৃদ্ধশালী ও পুরাতন দ্বীপ। এর ইতিহাস বহুলাংশে বাকলার সাথে জড়িত। সন্দ্বীপ সম্পর্কে জনৈক পরিব্রাজকের মন্তব্য ''আমরা এ স্থানটিকে বসতিপূর্ণ দেখেছি। আমার মনে হয়, পৃথিবীতে এমন উর্বর দ্বীপ আর নাই।" সন্দ্বীপের সকল অধিবাসী মুসলমান ছিলেন বলে জানা যায়। এই দ্বীপের রাজা ছিলেন একজন মুর। সন্দ্বীপের সমসাময়িক এবং সম্ভবত একইভাবে সমুদ্র সন্নিহিত বাকলার অধিবাসীরাও যে মুসলমান হবেন এতে আর সন্দেহ কি! সুতরাং বরিশাল এলাকার অধিবাসীদের আদি উৎস যে সেমেটিক আরব ধারা থেকে এসে থাকবে, এতে আর বিচিত্র কি !

মোঘল আমল

সম্রাট আকবর কর্তৃক ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ বিজিত হলেও বারো ভুঁইয়াদের বিরোধিতার কারণে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে বিলম্বিত হয়। আবুল ফজলের রাজস্ব ব্যবস্থায় বাকলা একটি সরকার ছিল। বাকলার রাজা রামচন্দ্র আফগান শাসকদের অনুগত ছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রামচন্দ্র অন্যান্য বারো ভুঁইয়াদের মতোই স্বাধীন ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে স্বাধীন জমিদারের দমন এবং বাকলাসহ সমগ্র বাংলায় মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইসলাম খান নামক এক সাহসী ব্যক্তিকে বাংলায় সুবাদার করে পাঠান। বারো ভুঁইয়াদের নেতা মূসা খান মোঘল বাহিনীর হাতে পরাজিত হন।

বাকলার রাজা রামচন্দ্র এবং তার শ্বশুর যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য মূসা খানের সাথে যোগ দেননি। মোঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি নীরব ভূমিকা পালন করেন। তবে রাজা প্রতাপাদিত্যকে যাতে তার জামাতা রামচন্দ্র মোঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনরূপ সাহায্য করতে না পারে, সেজন্য রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পাঠানো হয়। ১৬১১ সালে রামচন্দ্র তার মায়ের পরামর্শ অনুযায়ী মোঘলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। রাজা ছত্রজিৎ–এর প্রহরাধীনে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। মূসা খান ও অন্যান্য জমিদারদের মতো তাঁকেও নজরবন্দী করে রাখা হয়। মীর্জা নাথান–এর মতে রামচন্দ্রকে পরে তাঁর জমিদারির একটি অংশ জায়গির হিসেবে দেয়া হয়।

১৬১১ সালে ইসলাম খান কর্তৃক বাকলা দখল করার সাথে সাথে গোটা বাকেরগঞ্জ এলাকায় মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় মোঘল বাহিনী দক্ষিণ এলাকায় বেশ কয়েকটি আরাকানী দস্যু বাহিনীর হামলা প্রতিহত করে। আরাকানী দস্যুদের হামলা প্রতিরোধে মোঘল বাহিনী বেশ কয়েকটি দুর্গও নির্মাণ করেন। এর মধ্যে একটি দুর্গ ছিল সুজাবাদে (নলছিটি), একটি ঝালকাঠির রূপসিয়ার এবং অপরটি ছিল রাজাপুরের কাছে ইন্দ্রপাশায়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে (১৬৪৮–১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) আরাকানীদের বিরুদ্ধে জলে–স্থলে যুদ্ধাভিযান চালান। মোঘল বাহিনী মেঘনা নদী এবং বাকেরগঞ্জ ভূখণ্ড থেকে আরাকানীদেরকে বিতাড়িত করেন।

রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মেন্দি মজুমদার ও শরফুদ্দীন মজুমদার নামে চাখারের দুজন মুসলমান জমিদার চন্দ্রদ্বীপ জমিদারির বিপুল অংশ দখল করে নেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় চন্দ্রদ্বীপ জমিদারি বিক্রি হয়ে যায়।

আগা বাকেরের জমিদারী

মুর্শিদাবাদের নবাবের সময় বাংলার অন্যান্য জেলার ন্যায় এ জেলায়ও বিভিন্ন নতুন জমিদারির উদ্ভব হয়। নবাব আলীবর্দী খানের (১৭৪০–১৭৫৬) শাসনামলে আগা বাকের এ জেলায় এক বিরাট জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন, ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে বুজর্গ উমেদপুরের বিদ্রোহী হিন্দু জমিদারদের দমন করে আগা বাকের এ জেলায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। বুজর্গ উমেদপুরে তিনি একটি ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারই নামানুসারে কেন্দ্রটির নামকরণ করা হয় বাকেরগঞ্জ। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে এক রাতে আগা বাকের এবং তাঁর পুত্র আগা সাদিক জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম হোসেন কুলীখানের ভাইপো এবং সহকারী হুসামউদ্দীন খানকে আকাস্মিকভাবে আক্রমণ করে হত্যা করেন। পরে হোসেনকুলী খানের সমর্থকগণ পাল্টা আক্রমণ করে আগা বাকেরকে হত্যা করেন। তার আহত পুত্র আগা সাদিকও পরে আহত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর রাজনৈতিক পট–পরিবর্তনের ফলে জাহাঙ্গীরনগরের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ বুজর্গ উমেদপুরের জমিদারি লাভ করেন। বাকেরগঞ্জে রাজবল্লভ তাঁর প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে শিবপুরে কিছুসংখ্যক ভাড়াটে পর্তুগীজ সৈনিকের বসতি স্থানের অনুমতি দেন। রাজবল্লভের মৃত্যুর পর এই জমিদারি তাঁর পুত্র গোপালকৃষ্ণ লাভ করেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তদীয় পুত্র পিতাম্বর সেন এবং ভাইপো উত্তরাধিকার সূত্রে এই জমিদারি লাভ

করেন। পারিবারিক কলহ ও মামলার ফলে এই জমিদারি বিনষ্ট হয়। ঘোষাল জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা গোকুল চন্দ্র ঘোষাল সেলিমাবাদ পরগণার জমিদারির এক বিরাট অংশ ক্রয় ও দখল করেন।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এ জেলার নাজিরপুর পরগনায় একটি মুসলিম জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদারি প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ জান এই পরগণা লাভ করেন। ১৮৬১ সালে এই পরিবার অর্থকষ্টে পড়ে কলকাতার ঠাকুর পরিবারের কাছে জমিদারি বিক্রি করে দেন।

বাংলার নবাবদের আমলে শায়েস্তাবাদ পরগণায় আরও একটি জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইরিচ খান নামক জনৈক সামরিক অফিসার এই পরগণার জায়গীর হিসেবে লাভ করেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ফকিররা বরিশালে একটি বৃটিশ কারখানা আক্রমণ করেছিলেন। ১৭৯২ সালে ফকির বুলাকী শাহ বিপ্লবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি সুবান্দিয়ায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সেখানে সাতটি কামান ও ১২টি জিনবানর্য ও বেশ কিছু সংখ্যক বন্দুক ছিল। বারুদ তৈরির জন্য দু'জন লোক সেখানে কাজ করত। বুলাকী শাহ পরে সিপাহীদের হাতে ধরা পড়েন। তার পরিণতি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা না গেলেও সম্ভবত তাঁকে ফাঁসীতে হত্যা করা হয়।

১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাকলা অঞ্চলের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। ১৭৬২ সালেই বাকেরগঞ্জের প্রতি বৃটিশের দৃষ্টি পড়ে। এর কারণ হচ্ছে কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত বাণিজ্য পথের মাঝে এর অবস্থান। এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ চাল ও লবণ উৎপাদিত হওয়াটাও এর অন্যতম কারণ।

পরবর্তীকালে যেসব অঞ্চল নিয়ে বরিশাল জেলা গঠিত হয়, কোম্পানী শাসনের গোড়ার দিকে তা ঢাকার একটি অংশ হিসেবে শাসিত হত। এই অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে নলছিটি থানার বরইকরণে প্রশাসনিক ক্ষমতাসহ একজন সিভিল জজ নিয়োগ করা হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে

সুন্দরবনের কমিশনার বরইকরণে তাঁর সাথে যোগ দেন। এই অঞ্চলে ডাকাতদের অত্যাচার দমন করার জন্য সুন্দরবনের কমিশনারকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সিভিল জজ ও সুন্দরবনের কমিশনারের সদর দফতর বাকেরগঞ্জে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বাকেরগঞ্জে ঢাকার কোর্ট অব সার্কিটের অন্যতম স্টেশন ছিল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কমিশনারের বিচার ক্ষমতা লোপ করা হয়, এবং ঢাকা প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলসমূহ নিয়ে বাকেরগঞ্জ নামে নতুন জেলা গঠন করা হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জেলা প্রশাসন মিঃ উইন্টল তাঁর দফতর বাকেরগঞ্জ থেকে বরিশালে স্থানান্তর করেন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বলেশ্বর নদীর পশ্চিমে অবস্থিত কচুয়া থানা এবং শাহবাজপুর ও হাতিয়ার দ্বীপগুলো নিয়ে এ জেলা গঠিত হয়েছিল। সে সময় গৌরনদী এবং মাদারীপুরের পূর্বাঞ্চল ঢাকা জেলা থেকে বাকেরগঞ্জের সাথে সংযোজিত হয়েছিল। যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধা এবং দুরন্ত নদীর কারণে এ জেলা ছিল অগম্য। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হাতীয়া এবং দক্ষিণ শাহবাজপুরের দ্বীপগুলো ছিল নতুন জেলা নোয়াখালীর সাথে যুক্ত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কচুয়া থানা এবং বলেশ্বর নদীর পূর্বাঞ্চল যশোরের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নতুন মহকুমা বাগেরহাটের সাথে সংযোজিত হয়। যশোরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশ বাকেরগঞ্জের সাথে যুক্ত করা হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ শাহবাজপুর মহকুমা এ জেলার অধিবাসীদের অনুরোধে নোয়াখালী জেলা থেকে নিয়ে বাকেরগঞ্জের সাথে যুক্ত করা হয়। এরপর ফরিদপুরের পালং (বর্তমান শরিয়তপুর) ও কোটালীপাড়া থানা এবং মাদারীপুর মহকুমা সৃষ্টি করা হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পিরোজপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। পটুয়াখালী মহকুমার সৃষ্টি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে পটুয়াখালী মহকুমা একটি নতুন জেলায় পরিণত হয়।

বৃটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন এ জেলা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নদীপথে মগ পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রতিনিয়ত হামলা বিশেষভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ জেলার ইতিহাসে এমন প্রমাণও রয়েছে যে, উপকূলের নারী-পুরুষদের অপহরণ করে নিয়ে দাসরূপে বিক্রি করে ফেলা হতো। তাদের হাতের মাঝখানে ছিদ্র করে জাহাজের ডেকে বন্দী করে নিয়ে

যাওয়া হতো। মোঘল আমলে দক্ষিণাঞ্চলের জলদস্যুদের উপদ্রব বন্ধকরণে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। বৃটিশ শাসনে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় নীল চাষের ফলে ফসলী জমি যেমন বিরান হয়েছে, তেমনি বরিশালের বিভিন্ন এলাকায় লবণ উৎপাদন কারখানা গড়ে উঠে। এগুলো মূলত বৃটিশ বেনিয়াদের বাণিজ্যিক স্বার্থেই গড়ে উঠে। এর ফলে ব্যাপক এলাকা জনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠে।

বৃটিশ শাসনামলে এ জেলা বৃটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। ফরাজী আন্দোলন এর মধ্যে অন্যতম। ফরাজী আন্দোলন নামে খ্যাত-এই ধর্মীয়, সামাজিক এবং কৃষক আন্দোলন মাদারীপুর মহকুমা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মাদারীপুর মহকুমা বাকেরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুদু মিয়া ফরাজীদের নেতৃত্ব লাভ করেন। পিতার সূচিত আন্দোলনকে তিনি কৃষক আন্দোলনে পরিণত করেন। তাঁর নেতৃত্বে কৃষকরা অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই আন্দোলন সমগ্র বাকেরগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে ডবলিউ ডবলিউ হান্টার বলেন : "বাকেরগঞ্জ জেলায় বিশেষ করে এ জেলার দক্ষিণাঞ্চলে ফরাজীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। হিন্দু জমিদাররা এই আন্দোলন ব্যর্থ করার প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। নীলকরদের সাথে নিয়েও জমিদাররা এ আন্দোলন দমনের প্রয়াস চালায়। কিন্তু দুর্দমনীয় ফরায়েজীদের দৃঢ়তার কাছে তারা টিকতে পারেনি।"

বৃটিশ লেখকদের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে এ জেলায় তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে বৃটিশ সরকার সন্দেহ পোষণ করতেন যে, ফরাজী নেতা দুদু মিয়া বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেন কিনা। প্রধানত সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং দ্বিতীয়ত বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলো এ জেলা থেকে দূরতম স্থানে অবস্থিত থাকায় জেলার লোকজন প্রত্যক্ষভাবে সিপাহী বিদ্রোহে সম্ভবত অংশ নিতে পারেনি। তবে এ জেলার লোকজন মানসিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। পীর দুদু মিয়া যাতে সিপাহী বিদ্রোহে

প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, সে জন্য তাঁকে আলীপুর জেলে দু'বছর বন্দী রাখা হয়। জেমস ওয়াইজের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দুদু মিয়াকে আদালতে হাজির করার পর তিনি আদালতকে জানান যে, "তাঁর ডাকে ৫০ হাজার লোক সাড়া দিতে প্রস্তুত এবং তাঁর আদেশে তারা যে কোন স্থানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে।"

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বিলোপ করা হয়। ১৮৫৭ সালের ১লা নভেম্বর রাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে শাসনভার গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহ উত্তর গণরোষ প্রশমিত করার লক্ষ্যে বৃটিশ শাসকরা কৃষকদের খুশি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সময় একটি খাজনা আইন পাস হয়। জমিদারদের খাজনা আদায় সংক্রান্ত জুলুমের বিরুদ্ধে এতে কৃষকদের আদালতের শরণাপন্ন হবার সুযোগ দেয়া হয়।

বৃটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা হিন্দু জমিদাররা সাধারণ মানুষের উপর নিদারুণ অত্যাচার চালায়। মুসলমান সাধারণ কৃষকদের তারা মানুষই মনে করত না। এ ছাড়া ছিল জাতিভেদ ও বর্ণ-বিদ্বেষের অভিশাপ।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এ জেলার জনগণ বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ জেলার মুসলিম নেতা হাজী মুহম্মদ ইসমাইল এবং এ. কে. ফজলুল হক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে স্বাগত জানান এবং এর স্বপক্ষে জনমত সংগঠিত করেন। অবশ্য এর পাশাপাশি উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরা এবং হিন্দু জমিদাররাও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট হিন্দু রাজনৈতিকরা বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেন।

বৃটিশ ভারতের রাজধানী ও রাজনীতি-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র যতদিন কলকাতায় ছিল, ততদিন পর্যন্ত বরিশাল এলাকার হিন্দু শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। শিক্ষা ও বিত্তে পশ্চাৎপদ বরিশালের সাধারণ মুসলমানদের এ কারণে যথেষ্ট প্রতিকূলতা ও নির্মম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। স্কুল-কলেজগুলো কিংবা হাট-বাজার ও

সাংস্কৃতিক সংগঠন–অনুষ্ঠান ইত্যাদি হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এমনকি পানির পুকুর দীঘিও ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। স্কুলে ভর্তি হওয়া এবং সম অধিকার পাওয়া ছিল মুসলমান ছাত্রের জন্য দুর্লভ। হিন্দুদের ছুঁৎমার্গের জন্য মুসলমানরা কলকাতায় যেতে পারত না। এটা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এ জেলার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে কুলকাঠির গুলি বর্ষণের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৫৭ সালে নলছিটি থানার কুলকাঠির মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে হিন্দুরা শোভাযাত্রার পরিকল্পনা নিলে স্থানীয় মুসলমানরা তাতে রুখে দাঁড়ায়। তৎকালীন জেলা প্রশাসক মিঃ ব্লান্ডি এই হিন্দু শোভাযাত্রার অনুমতি দেন এবং শোভাযাত্রা বিরোধীদের উপর গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। এতে ঘটনাস্থলে বিশজন মুসলমান শহীদ হন। এতে গোটা জেলায় প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্যার আবদুর রহিম এবং এ.কে. ফজলুল হক এ সময় ঐ স্থান পরিদর্শন করেন এবং ঐ বছরই বরিশালে একটি মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন কুলকাঠিতে মুসলিম হত্যার নিন্দা করে।

এ জেলার জনগণ আলী ভ্রাতৃদ্বয় সূচিত খিলাফত আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছেন। খিলাফত আন্দোলনের সংগঠকদের মধ্যে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ছিলেন অন্যতম।

১৯২১ সালে সূচিত অসহযোগ আন্দোলনেও এ জেলার জনগণ সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন জেলাবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জেলার প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতারা মুসলিম লীগের সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িত হন। এঁদের মধ্যে মুহম্মদ ইসমাইল, ফজলুল হক প্রমুখ নেতারা ছিলেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে বরিশালের জনগণের ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল। বরিশালে ইসলামের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল বলেই এলাকাটি প্রথমে পাকিস্তানের এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলাম প্রচারের ধারা

মুসলিম সমাজ বিস্তৃতি

বরিশালে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ধারাটি গোটা উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির না হওয়াই স্বাভাবিক। জ্ঞাত ইতিহাসের সূত্রে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, মাত্র পাঁচ-ছ'শত বছর আগে থেকে বরিশাল তথা দক্ষিণ বাংলায় ইসলাম তার ভিত্তি নির্মাণ করেছে। যশোর ও খুলনা অঞ্চলের সর্বজনস্বীকৃত পথিকৃৎ ইসলাম প্রচারক হযরত খান জাহান আলী (র)-এর মৃত্যু তারিখ যদি ৮৬৩ হিজরী সালের ২৬শে যিলহজ্জ হয় এবং তাঁর সমসাময়িক কালকে যদি এতদঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের ভিত্তি-সময় ধরা হয়, তাহলেও মোটামুটি পাঁচ থেকে ছ' শ বছর আগে এই এলাকায় ইসলাম প্রবেশ করার সুযোগ পায়। হযরত খান জাহান আলী বা উলুগ খান-ই জাহানের সমাধি গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তিনি গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪৩৭-১৪৫৯ খৃ) আমলে খুলনায় আগমন করেন। বরিশাল-পটুয়াখালী এলাকার মশহুর দরবেশ হযরত সাইয়েদুল আরেফীনের ইসলাম প্রচার ও এই এলাকায় আগমনের যে সময় জানা যায়, তার পরিধিও পাঁচ-ছ' শ' বছরের বেশি নয়। ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি দিগ্বিজয়ী তৈমুর লংগের আমলে (১৩৬১-১৪০৫ খৃ) বাংলায় আগমন করেন। প্রাপ্ত ইতিহাসের ধারাটিকে আর একটু পেছনে টেনে নিলে এতটুকু বলা যায় যে, বাংলাদেশে ওলী-দরবেশের মাধ্যমে সংগঠিতভাবে ইসলাম প্রচারের কাজটি শুরু হয় একাদশ শতক থেকে। 'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থে আবদুল মান্নান তালিবও উল্লেখ করেছেন যে, "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এ দেশে ইসলাম প্রচারের ঢেউ চলতে থাকে।" বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতাও তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি গ্রানাডায় ভারতীয়দের এবং ভারতে গ্রানাডাবাসীদের

সাক্ষাত পেয়েছেন। আরাকানে তিনি দেখেছেন বাংলার ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের কলোনি। মালদ্বীপে তিনি এক বাঙ্গালী মুসলিম রাজবংশের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করেন। ইবনে বতুতা তাঁর সফরনামায় বলেছেন ঃ "পরমাশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এই দ্বীপপুঞ্জের (মালদ্বীপ) বাদশাহ্ হচ্ছেন খাদীজা নাম্নী জনৈকা মহিলা। তিনি সুলতান জালালউদ্দীন উমর ইবনে সুলতান সালাহউদ্দীন সালেহ বাঙ্গালীর কন্যা। তাঁর দাদা বাদশাহ্ ছিলেন, অতঃপর তাঁর পিতা বাদশাহ্ হন।"

"চট্টগ্রামের অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবি করে। চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকা যেমন আল করণ, মুলক বহর, বাকালিয়া ইত্যাদি আজও আরবী নাম বহন করে আছে।"

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যায় যে, 'করণ' শব্দ যুক্ত একটি গ্রাম রয়েছে পটুয়াখালী জেলায়–নাম হচ্ছে ঃ 'মৌকরণ'। 'বাক্যালিয়া' আর 'বাকলা' শব্দের মাঝে খুব কি তফাৎ আছে? 'গাঙ্গ' শব্দটি এখনও বরিশাল-পটুয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় বহুল শ্রুত। ব্যাপক গবেষণা করলে হয়তো বরিশাল–পাটুয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষা এবং বিভিন্ন এলাকার নামসমূহে আরবীয় প্রভাবের স্বাক্ষর যথেষ্ট পাওয়া যাবে। শাতি–উল–গঙ্গ (গঙ্গার শেষপ্রান্ত উপদ্বীপ) থেকে যদি ধ্বনি বিকৃতি বা উত্তরণের মাধ্যমে চাঁটগাও বা চিটাগাং হতে পারে, তাহলে শাতি–উল–বহর বা সমোচ্চারিত কোন শব্দ থেকে বরিশাল শব্দের উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব নয়। খনন কার্য আমাদের এ সিদ্ধান্তকে আরো শক্তিশালী করে। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহারে বাগদাদের আব্বাসীয় বাদশাহ্ হারুনূর রশীদের আমলের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রাটি ১৭২ হিজরী সনের (৭৮৮ খৃ) তারিখ খোদিত রয়েছে।"

বাংলার উপকূল থেকে অভ্যন্তরভাগে আরবীয় বণিকদের যাতায়াত সম্পর্কে ডঃ এ. রহীম তাঁর গ্রন্থে ইব্‌নে খুরদাদবা, মাসুদী, আল ইদ্রিসী প্রমুখ আরব ভৌগোলিক ও পর্যটকের মতামত উদ্ধৃত করে গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম যোগসূত্রের কথা প্রমাণ করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিব তাঁর 'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমেই এ দেশে ইসলামের সূত্রপাত হয়। আরব ভূমি থেকে সুদূর চীন কিংবা বাংলা অঞ্চলের ব্যাপক দূরত্ব। ফলে মনুষ্য চালিত পালতোলা জাহাজে সমুদ্র সফর সঙ্গত কারণেই দীর্ঘায়িত হতো। প্রতিটি সমুদ্র যাত্রাই ছিল তখন ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল। আরবীয় বণিকরা বাণিজ্য শেষে পুনরায় সহি-সালামতে দেশে ফিরে যেতে পারবেন, এমন নিশ্চয়তা কমই ছিল। সুতরাং তারা দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য সফরে অনিশ্চিত জীবনে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের সাথে আনার ভরসা পেতেন না। অনেকে দীর্ঘ যাত্রা বিরতি বা বাণিজ্য সফরের সময় স্থানীয় নারীদের বিয়ে করে ঘরসংসারও করেছেন। ইসলাম পরবর্তীকালের এসব বিয়ে-শাদীর ফলে সঙ্গত কারণেই মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যাঁরা ইসলাম প্রচারে পথিকৃৎ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : শাহ সুলতান বল্খী, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, বাবা আদম শহীদ, মখদুম শাহ দৌলা শহীদ, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী, শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন, শাহ মাখদুম রূপোশ ও শায়খ ফরিদুদ্দীন গাঞ্জে শকর প্রমুখ।

ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, বাংলার নৌ-বন্দর চট্টগ্রাম অঞ্চলেই প্রথম ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে। এই চট্টগ্রামের প্রাচীন সূফী-দরবেশদের মধ্যে ঈসায়ী নবম শতকে পারস্যের হযরত বায়োজিদ বোস্তামীর (মৃত্যু ৮৭৪ খৃ) আগমন ঘটে। অবশ্য এ ব্যাপারে কোন প্রামাণ্য তথ্যপঞ্জি আমাদের হাতে নেই। তবে এ তথ্যকে মেনে নিলে আমরা খুব সহজেই বলতে পারি যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলামের আগমনের কাল এক হাজার বছরেরও বেশি। ভারতে কিংবা বাংলায় মুসলিম বিজয় সাধিত হবার বহু আগেই যে ইসলামের আলো এ দেশে বিচ্ছুরিত হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ডঃ আবদুল করিম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "এই সময়ের শেষভাগে কান-রাদজাগীর বংশধর মহত ইহাত চন্দয়ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা ২২ বছর রাজত্বের পর মারা যান। কথিত আছে যে, তাঁর সময়ে (৭৮৮-৮১০) কয়েকটি কু-ল অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ রমবী (বর্তমানে

রামরী) দ্বীপের সাথে সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে এবং মুসলমান আরোহীদেরকে আরাকানে পাঠানো হয়। সেখানে তারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন।" 'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "অষ্টম ও নবম শতকে আরবীয় মুসলমান বণিকরাই এ পথে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য করতেন। কাজেই এ বিদেশী মুসলমানরা আরব বণিক দল ছাড়া যে আর কেউ হতে পারে না, তাতে সন্দেহ নেই। পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক বলে উড়িয়ে দেয়া কঠিন। ভাষা ও ধ্বনি বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে আমাদের আলোকিত করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে যদি ইসলামের আগমন সর্বাগ্রে হয়ে থাকে, তাহলে বরিশাল অঞ্চলেও ঐ সময় কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে ইসলামের আগমন ঘটে থাকবে। একইভাবে কেরালায় ইসলাম যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। অবশ্য বরিশালের প্রাচীন ইতিহাস যেহেতু দুষ্প্রাপ্য, সে কারণে এ প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহ হয়ে কিছু বলা কঠিন। তবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, সাইয়েদুল আরেফীনই এ অঞ্চলের ইসলামের পয়লা বার্তাবাহী দরবেশ। তাঁর আগমনের আগেও যে, বরিশাল-পটুয়াখালী এলাকায় ইসলামের আলো বিকীরিত হয়নি, তেমনটা বলা যায় না।

'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে চীনদেশে যাবার পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করতো। কাজেই, বাংলার উপকূলে তাদের আনাগোনা হতো। এ সময় (সপ্তম ও অষ্টম শতক) বঙ্গোপসাগর জাহাজ চলাচল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বাংলার উপকূলে তাম্রলিপ্তি (তমলুক) ও শৎগুগ (বর্তমানে চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর। দক্ষিণের উপকূল পথে এ সময় ইসলামের সত্যবাণী বাংলায় প্রবেশ করে। অতঃপর ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়ের (১২০৪ খৃ) পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পথ দিয়ে ইসলাম প্রচারকের দল বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সত্যবাণী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পৌঁছাতে থাকে।"

বস্তুত 'জেলা গেজেটিয়ার' রচিত হয়েছে ইংরেজ শাসকদের উদ্যোগে এবং তাদের নিজেদের প্রয়োজনে। গোটা ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের

সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না। প্রথমত, ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকেই রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, মুসলমানরা একটানা এক শ 'বছর বহিরাগত জবরদখলকারী বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের শোচনীয় ব্যর্থতার পরও তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়নি। তৃতীয়ত, বৃটিশের হাতে প্রথম পতন ঘটে বাংলার। বাংলাকে দখল করেই বৃটিশ তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে। সঙ্গত কারণেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণ ও বঞ্চনার প্রথম শিকার হয়েছিল এই বাংলার মুসলমানরাই। আর সে কারণেই বাংলার জনগণের পক্ষ থেকে (বিশেষত মুসলমান) বৃটিশ শাসকরা তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। বাংলার মুসলমানরা আজন্ম সংগ্রামী এবং স্বাধীনতাপ্রিয়। মোঘল শাসকদের বিরুদ্ধেও তাদের গৌরবময় সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। এ সব বাস্তব পটভূমি সামনে রাখলে একথা বিশ্বাস করা সহজ হবে যে, বৃটিশ রচিত জেলা গেজেটিয়ারগুলোতে মুসলমানের সত্যিকার ইতিহাস বিধৃত হয়নি। ইংরেজ লেখক-ঐতিহাসিকরা মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাস বিকৃত করেছেন।

এ তথ্য আমাদের প্রায় সকলেরই জানা যে, প্রাচীন আরবরা ছিল সমুদ্রাভিযাত্রী এবং বাণিজ্যই ছিল তাদের মূল জীবিকা। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আগমনের বহু আগে থেকেই আরব বণিকরা বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেন। এশিয়ার এ অঞ্চলে ইসলাম প্রসারের ধারাটি লক্ষ্য করলে এটা পরিষ্কার হয় যে, সমুদ্র পারের জনবসতিতেই ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। এটা আরবদের নৌ-পথে সুদক্ষ সংযোগেরই ফল। আরব মুসলিম বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয় করেন ৭১২ খৃষ্টাব্দে। আর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় ঘটে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ের ব্যবধান হচ্ছে প্রায় পাঁচ শ' বছর। এই দীর্ঘ সময় পীর-আউলিয়া আরবীয় বণিকরা নীরবে-নিভৃতে ইসলাম প্রচার করেছেন। স্থলপথে ইসলামের প্রসার কিংবা মুসলিম বিজয়াভিযান বহু বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু নৌ-পথে অবাধে নীরবে-নিভৃতে অতি দ্রুত ইসলামের বিস্তার ঘটেছে।

আর সেটা সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায়ই ব্যাপকভাবে ঘটেছে। বাংলাদেশ সহ দক্ষিণের নদী বেষ্টিত বরিশাল এলাকার মুসলিম জনসংখ্যাধিক্য প্রাচীন আরবীয় সমুদ্রাভিযাত্রী বণিকদের সংযোগ–কার্যক্রমের ফল কি না, তাই বা কে বলবে। প্রাচীন গঙ্গ শহরটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ইতিহাসের কোন সুদূর অতীতে। কেউ কেউ 'গঙ্গ' শহরের অবস্থান বরিশাল অঞ্চলে বলে অনুমান করেন। প্রাচীন বাকলা সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। বাকলাও নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে কখন এবং বাকলার অবস্থান কোথায় ছিল, তা–ও নিরূপিত হয়নি।

বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের মাত্র পাঁচ–ছ'শ বছরের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যয়। তাও পূর্ণাঙ্গ নয়। অথচ এ কথা বিশ্বাস করা অসঙ্গত হবে যে, পাঁচ শতাধিক বছর আগে, বরিশাল এলাকায় ইসলামের অনুসারীরা এককালে নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিল। এই উক্তিকে তারা ইতিহাস–সিদ্ধরূপে প্রশ্নাতীত প্রমাণ করতে পারেন নি। অজ্ঞতার যুগে গোটা বিশ্ববাসীই শিরক কিংবা গুমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তাদের কারো কারো মাঝে তৌহিদের ক্ষীণধারা অবশ্য বর্তমান ছিল। আরবেও পৌত্তলিক কোরেশ ও তাদের অনুসারীদের প্রভাব ছিল। বাংলাদেশ সহ গোটা ভারতেও পৌত্তলিক অমুসলমানদের আধিক্য ছিল। কিন্তু তাই বলে তারা হিন্দু ছিলেন এর পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। বৈদিক আর্যরা যে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি নিয়ে বর্তমানে টিকে আছে, তাঁর অনুপুঙ্খ অনুসরণকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে রসূল–পূর্ব যুগের বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা কঠিন। কেননা, আর্য বহিরাগতদের বিরুদ্ধে কিংবা গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যারা দীর্ঘতর সংগ্রামের ধারা রচনা করলেন, তারা কারা ? এই সব জনগোষ্ঠী নিশ্চয়ই পৌত্তলিক বা হিন্দু ছিলেন না। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য আর্যরা তাদের রাজনৈতিক কূট–কৌশল, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং ধর্মীয় পুনর্বিন্যাসের ধারায় বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর এক বিপুল অংশকে তাদের নিজেদের বৃত্তে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ভারতে হরিজন কিংবা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়রা নিজেদেরকে আর্যদের অনুরূপ 'হিন্দু' বলে মনে করে না। বরিশাল সহ বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী, আর্যরা যাদেরকে আপন স্বার্থে বর্ণ ভিত্তিক বিভাজন করে নমশূদ্র

রূপে চিহ্নিত করেছে, নীচু জাতের নয়। তারাই আদি অধিবাসী, 'সান অব দি সয়েল'। আগ্রাসনের বহুমুখী ধারায় এ মাটির সন্তানরা যখন পরাভূত হয়, তখন আর্যরা তাদের উপর হিন্দুত্ব আরোপ করেছে। পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ও এ অঞ্চলের তথাকথিত নমশূদ্ররা কংগ্রেসের ব্রাহ্মণ্য ধারার রাজনীতিকে সমর্থন করেনি। এই জনগোষ্ঠী পরিপূর্ণভাবে ইসলামে বায়আত না হলেও তারা ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছেও আত্মসমর্পণ করতে চায় না। তবে এ কথা সত্য যে, তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী অহমিকার অসহায় শিকার।

বরিশালের মুসলমানরা কি পরিমাণে ধর্মান্তরিত, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, গবেষণা চলতে পারে। হিন্দু–বৃটিশ ঐতিহাসিকরা একথা নানাভাবে স্বীকার করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণে কারো উপর জবরদস্তি করা হয়নি। বিশেষত জবরদস্তি ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করার কোন রেওয়াজ ইসলাম সমর্থিত নয়। যেসব বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদেরকে বৈদিক আর্য দৃষ্টিকোণ থেকে 'হিন্দু' রূপে চিহ্নিত করা যাবে কি না, এ ব্যাপারে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। এ অর্থে আরবের পৌত্তলিকরাও কি তাহলে হিন্দু ছিল ? অজ্ঞতার যুগে বাংলাদেশে কিংবা বরিশালের অধিবাসীরা ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলেন না। পরে নানা অভ্যন্তরীণ অভিঘাতের মুখে হিন্দু ধর্মের নেতৃত্বদানকারীরা বিচিত্রমুখী আপোসবাদী সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণে উন্মুখ অথবা ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী জনগোষ্ঠীকে হিন্দুত্বের প্রসাদ খাইয়ে ফিরিয়ে রেখেছেন মাত্র। চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব আন্দোলন কিংবা রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম ধর্ম এরই সাক্ষ্য বহন করে। এ পর্যায়ে আমার অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, বরিশালের বিপুল পরিমাণ মুসলমান আদৌ হিন্দু ছিলেন না ; নিম্ন বর্ণের তো নয়ই। আর্য ব্রাহ্মণ আরোপিত অপবাদ এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক সমর্থিত এ ভ্রান্ত তত্ত্বের আমি ঘোরতর প্রতিবাদ করি। হ্যাঁ, ইসলামের প্রচার ও সংস্কার কার্যক্রমের অভাবে, অশিক্ষাজনিত অন্ধত্বে এবং সর্বোপরি দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে সাধারণ মুসলমানদের উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল বৈ কি !

বরিশাল সহ গোটা বাংলার বিপুল পরিমাণ মুসলমান যদি হিন্দু ধর্মের বেষ্টনী ছিন্ন করে ইসলামে দাখিল হয়ে থাকেন, তাহলে দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক গোলামী যুগের ঘোরতর দুর্দিনে যখন হিন্দু জনগোষ্ঠীর উন্নতি অগ্রগতি উপচে পড়ছিল, শাসকের জাত মুসলমানরা যখন 'ভিস্তিওয়ালার' জাতে পরিণত হয়েছিল, তখনও কোন মুসলমান হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছে-এমন নযীর নেই। আমার প্রশ্ন ঃ কেন এমনটা ঘটল? যদি এরা ধর্মান্তরিতই হয়ে থাকবে, তাহলে আপন ধর্মে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগকে তাদের মাঝে কেউ লুফে নিতে প্রলুব্ধ হলো না কেন? কে তাদের বারণ করেছে? সত্য গ্রহণে ইসলাম যেমন জবরদস্তি আরোপ করে না, তেমনি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী মুরতাদ-মুশরিককেও বেঁধে রাখার প্রয়োজন মনে করে না। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই বিপুল পরিমাণ নও-মুসলমানদের মননে-চেতনায় তৌহিদ দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠিত। এবং এরা কোনকালে নিশ্চয়ই খোদায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন? তাঁদের মনে তৌহিদের অতৃপ্ত তৃষ্ণা প্রকট ছিল বলেই তাঁরা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে থাকবেন। এঁরা কোনক্রমেই হিন্দু বা ধর্মান্তরিত নন। এঁরা হারিয়ে যাওয়া পরশ পাথরকে পুনঃ খুঁজে নিয়েছেন মাত্র।

শত শত বছর মুসলিম শাসনে শাসকদের অনুগ্রহ-আনুকূল্য পাবার প্রলোভনে স্বল্প সংখ্যক উচ্চ বর্ণের হিন্দু যে ইসলাম গ্রহণ করেননি, তা নয়। এদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে মুসলিম অভিজাতদের সাথে। কৌশলে গরুর গোশ্‌ত খাইয়ে কিছু সংখ্যক হিন্দুকে মুসলমান করা হলে তাদের সংখ্যাও স্বল্প। দক্ষিণ বাংলাসহ বরিশালের মুসলমানরা আগে 'হিন্দু' ছিলেন, এই প্রচারণা একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের সূচনা মাত্র।

এটা মুসলমানদের উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং তাদের মাঝে অদৃশ্যে হীনমন্যতা জাগিয়ে তোলে। অথচ এই সিদ্ধান্তের তেমন কোন অভ্রান্ত ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এ ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণা হওয়া দরকার।

বরিশালের সূফী-সাধক, পীর-আউলিয়া

এ কথা নতুন করে বলার অবকাশ নেই যে, গাঙ্গেয় বদ্বীপের এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে সূফী-সাধকদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। আরব বণিকদের সাথে বাংলা অঞ্চলের সাথে যে সংযোগসূত্র রচিত হয়, তার মাধ্যম ছিল চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর। তবে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে যখন আরব বণিকরা রীতিমত ব্যবসায়িক লেনদেনে ব্যস্ত, ঠিক তখনই বরিশালে জনবসতি ছিল কি না, থাকলেও তা কি পরিমাণ বিস্তৃত ছিল, তা জানা দরকার। এ প্রশ্নের মীমাংসা হলে আমরা অন্তত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, চট্টগ্রামের সাথে নদী পথের দূরত্বে বিভক্ত বরিশালে ও বাংলার প্রথম দিককার ওলী-দরবেশদের পদচারণা ঘটে থাকবে। এ প্রসঙ্গে ডঃ গোলাম সাকলায়েন তাঁর 'বাংলাদেশের সূফী-সাধক' বইয়ে লিখেছেন ঃ "ঈসায়ী অষ্টম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে প্রাচীন আরবদের উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং প্রথমে আরব ব্যবসায়ী ও বণিক এবং পরে ধর্ম প্রচারক সাধু, দরবেশ ও সূফীদের আগমনে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়।" ডঃ সাকলায়েন চট্টগ্রামের দশজন আউলিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। এঁরা চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন। এখন 'সন্নিহিত' অঞ্চল বলতে কি বোঝায়? মুসলিম বিজয়ের আগে, যখন গোটা ভারতের সড়ক যোগাযোগই ছিল পশ্চাদপদ, সে অবস্থায় চট্টগ্রামে ঐ সব সূফী-সাধক নৌ-পথেই আগমন করে থাকবেন। যেহেতু তাঁরা নৌ-পথে যোগাযোগে অভ্যস্ত ছিলেন, সে কারণে চট্টগ্রামের অদূরে বরিশাল এলাকায় যে তাঁদের অনুগামীদের সহযোগে আসেননি, এমন ধারণা করা চলে না। তবে তাঁরা সম্ভবত স্থায়ীভাবে বরিশালে আস্তানা গাড়েননি। ইসলাম প্রচার করেই তাঁরা হয়তো চট্টগ্রামের আস্তানায় ফিরে গেছেন। দু-চার জন শিষ্য যে বরিশাল এলাকায় স্থায়ীভাবে আস্তানা গাড়েননি, এমনও নয়। শুধু বরিশালই নয়, গোটা বাংলাদেশেরই প্রথম দিককার ইসলাম প্রচারকদের ইতিহাস অনুদ্‌ঘাটিত। প্রথমত. ঐ সব সূফী-সাধক নিজেরা ছিলেন প্রচারবিমুখ। তাঁরা

আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে গৃহত্যাগ করেন। ফলে তাঁরা নিজেদের কাজকর্ম প্রচারের কোন চেষ্টাই করেননি। তবে অনেক ওলী–সাধক এবং তাঁদের অনুগামীদের ইতিহাস পাওয়া না গেলেও এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মুসলমানই তাঁদের অক্লান্ত ও নিবেদিতপ্রাণ তৎপরতার প্রমাণ।

বরিশাল ও নোয়াখালী জেলার মানুষ ধর্মপরায়ণতায় অগ্রসর। পীর–বুযর্গ, ওলী–দরবেশদের পদচারণায় মুখরিত বরিশালে সুদূর অতীতকাল থেকেই ইসলামী শিক্ষার যে ধারা শুরু হয়, তারই ফলে এ এলাকার জনগণের মাঝে ধর্মের ব্যাপারে আজও উৎসাহ–উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

মীর কুতুব শাহ

হযরত মীর কুতুব শাহ বরিশালে আগত অন্যতম বুযর্গ। তিনি দিল্লীর উলফত গাজীর বংশধর। উলফত গাজী ছিলেন মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। ওস্তাদ পীরের আদেশ স্বপ্নযোগে পেয়ে তিনি দিল্লী হতে বাংলাদেশের সুদূর দক্ষিণে আগমন করেন। বাংলাদেশে আসার পর হযরত মীর কুতুব শাহ বরিশাল জেলার উদচড়া নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন। এ স্থানটি ছিল লাখেরাজ সম্পত্তি। কোন এক বুযর্গের নামে এটি ওয়াক্ফ করা ছিল। কিন্তু মোঘল আমলে সাবি খান যখন বরিশালে ফৌজদার হয়ে আসেন, তখন তিনি কুতুব শাহের নিকট খাজনা দাবি করে বসেন। কুতুব শাহ সাবি খানকে জানালেন যে, যেহেতু সম্পত্তিটি আগে থেকেই লাখেরাজ সম্পত্তি, সুতরাং তিনি খাজনা দিতে পারবেন না।

সাবি খান তাঁর এই বক্তব্যকে ঔদ্ধত্য হিসেবে গ্রহণ করেন। কুতুব শাহ সাবি খানকে যালিম বলে অভিহিত করেন। সাবি খান এতে আরও ক্ষেপে যান এবং কুতুব শাহকে শাস্তি দেবার জন্য তিনি তাঁকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করার কথা ঘোষণা করেন।

একটি তামার পাত্রে তৈল গরমও করা হয়েছিল। মীর কুতুব বললেন, "তোমাদের আর কষ্ট করে ঐ তেলে আমাকে নিক্ষেপ করতে হবে না, আমি নিজেই তেলের মধ্যে ঝাঁপ দিচ্ছি।" এই বলে তিনি ফুটন্ত তেলের মধ্যে পা রেখে বসে পড়লেন। আল্লাহ্র অসীম কুদরত! তাঁর কিছুই হলো না! এতে সাবি

খানের গায়ে আরও জ্বালা ধরে গেল। মীর কুতুব শাহ বললেন, যালিমের দশা এমনিই হয়।

সাবি খান মীর কুতুব শাহের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে পরিশেষে তাঁর মুরীদ হলেন। তিনি পীর কুতুবের কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ঐ সম্পত্তি ছাড়াও আল্লাহর ওলীকে আরও একটি নিষ্কর সম্পত্তি দিলেন। এ থেকে যে আয় হতো, তা তিনি জনকল্যাণে ব্যয় করতেন। বহু দুস্থ পরিবার এ আয় দ্বারা জীবন নির্বাহ করত।

জীবনের এক বিপুল সময় পর্যন্ত হযরত পীর কুতুব শাহ হেদায়েতের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক স্পর্শে বরিশাল জেলার বহু লোক ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। গৌরনদী থানার 'নলচিরা থানাবাড়ী' নামক স্থানে এই পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের মাযার রয়েছে।

হযরত শাহ চেরাগ আলম (র)

চেরাগ আলম বা জগৎ প্রদীপ এই মহান বুযর্গের আসল নাম নয়। সম্ভবত তাঁর ভক্ত অনুরক্তরা তাঁর অলৌকিক গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এই সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তবে তিনি আল্লাহর নূরের দ্যুতিতে মানুষের অন্তর উদ্ভাসিত করেছিলেন, এটাই তাঁর বড় পরিচয়।

হযরত শাহ চেরাগ আলম (র) বরিশাল জেলার নলছিটি থানা হতে মাইল পাঁচেক উত্তরে শাহ বাঙ্গাল নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। এই স্থানের নামকরণ শাহ বাঙ্গাল আগেই হয়েছিল কি না, জানা যায় না। তবে এমনও হতে পারে যে, শাহ-এ-বাঙ্গাল থেকেই শাহ বাঙ্গাল নামকরণ হয়ে থাকবে এবং তাঁর ভক্তরাই তাঁকে এই নামে ডাকতেন। হিদায়াত ও জনসেবাই ছিল শাহ চেরাগের মূল কাজ। তিনি শুধু মানুষকে নসীহত করেই ক্ষান্ত হননি; এর পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণধর্মী কাজেও তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। হযরত শাহ চেরাগ আলম এই এলাকায় বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করে ছিলেন। পানির সুবিধার জন্য পুকুরও খনন করেন। তৎকালীন দিল্লীর সুলতান শাহ চেরাগ (র)-এর অতুলনীয় জনসেবায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তিন শ ষাট বিঘা

নিকর জমি দান করেছিলেন। অবশ্য এই জমির আয় জনগণের কল্যাণেই ব্যয় হতো। নলছিটি থানার শাহ বাঙ্গাল নামক স্থানে আজও এই বুযর্গর মাযার রয়েছে।

মওলানা নফিসুর রহমান (র)

বরিশালের অন্যতম আউলিয়া ছিলেন হযরত মওলানা নফিসুর রহমান হক্কোননূরী। তিনি সংসারের মায়া ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র প্রেমে আত্মহারা হয়ে বিবাগী হয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন চট্টগ্রামের বিখ্যাত সূফী পীর গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (র)–এর শরণাপন্ন হন। সেখানে উপস্থিত হয়েই বলে উঠলেন :

মওলা ধন রে কি দিয়া তজিব তোমারে
কিবা আছে হেন ধন এই অসার সংসারে।

তিনি চট্টগ্রামের নানা স্থান, বন–অরণ্য পরিভ্রমণ করে আত্মোপলব্ধি লাভ করেন। বহু দিন সাধনার পরে একদিন তিনি দেশে ফিরে আসেন। তিনি ঘোষণা করেন :

কে বলে এ ধরাধামে নাহি কিছু সার।
আছে দিব্য সার–রত্ন
করিলে আদর–যত্ন
অবশ্য মিলিবে তাহা ঘুচিবে আঁধার।

ক্রমশ তাঁর আধ্যাত্মিক চরিত্রের উন্নয়ন ও পূত চরিত্রের খবর সবখানে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তাসাউফের সার সত্য ও নূরের সন্ধান পান। এ জন্য তাঁর আস্তানার নামকরণ হয় 'হক্কোননূর দরবার'–সত্যময় জ্যোতি ও জ্যোতির্ময় সত্যের দরবার। তিনি তাঁর প্রিয় মুরীদ ও অনুরাগীদের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম যে সবক দিয়েছিলেন তা হচ্ছে :

নবীজীর চার তরীকা ধর।
চার তরীকার ফকির নবী হাদীসে প্রচার।
শরীয়ত আর তরীকত, হাকীকত আর মারেফত

চার মঞ্জিলে সাধন করে সাধন পুরা কর।
শরীয়তে শরাহ জারী, তরীকতে তরীক ধরি,
হাকীকতে হক জানিবে, মারেফতে দীদার।
এক মঞ্জিল হলে ছাড়া না হইবে সাধন পুরা
নবীজীর শাফায়াত পাওয়া হবে ভার।

এই মহান সাধকের সন্নিধ্যে বহু রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক পীড়া থেকে মুক্তি পেয়েছে। বহু জ্ঞান-সাধক তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানের আলো পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তিনি আজীবন আল্লাহ্‌র নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। ঠিক একইভাবে মুরীদদের প্রাণে আল্লাহ্‌ প্রেমের ধারা প্রবাহিত করেছেন। তাঁর সম্মেলন ক্ষেত্রে প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক ওরস এবং প্রতি বছর ফাল্গুন-বসন্ত সমাগমে প্রথম বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বার্ষিক ওরস সম্পন্ন হয়।

হযরত শাহ্‌ ওয়াজির আলী (র)

তাঁর আদিবাস ছিল ইয়েমেনে। শায়খের নির্দেশে তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে তাবলীগী দায়িত্ব পালন করে অবশেষে বরিশাল জেলার ভোলা দ্বীপে এসে জীবনের নোঙ্গর ফেলেন।

স্বল্পভাষী এই মহান বুযর্গের অনেক মুরীদ ছিল। জীবনসায়াহ্নে তিনি তাঁদের মাধ্যমেই হিদায়াত কার্য পরিচালনা করতেন। দিন ও রাতের বেশির ভাগ সময় তিনি নীরব সাধনায় এবং আল্লাহ্‌র ধ্যানে সময় কাটাতেন। শিষ্যদের তিনি বলে দিয়েছিলেন যে, কখনও যদি তাঁরা তাঁকে না দেখে, তাহলে যেন তাঁকে তালাশ না করে। কারণ, মাঝে মাঝে তিনি উধাও হয়ে যেতেন। একই সময়ে তাঁকে একাধিক স্থানেও দেখা গেছে। এই মহান সাধকের বিস্তারিত জীবনালেখ্য জানা যায় না। ভোলা দ্বীপেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রতি বছর সাতাশে ফাল্গুন তাঁর মাযারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

সাইয়েদুল আরেফীন (র)

হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র)-এর প্রকৃত নাম জানা যায়নি। এটি তাঁর প্রশংসামূলক উপাধি। তৈমুর লং-এর এশিয়া অভিযানের শেষের দিকে তিনি

বাংলাদেশে আগমন করেন। তবে তাঁর আগমনের সঠিক সময় জানা যায় না। তিনি ছিলেন পারস্যের (ইরান) অধিবাসী। সুদূর পারস্য থেকে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যন্ত একটি জনপদে তিনি একাকী নিঃসঙ্গ এসেছিলেন, এমনটা ধারণা করা চলে না। উপরন্তু স্থানীয় ভাষার ব্যবধানও ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র) যখন নদী তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একটি তরুণী নদীতে চাল ধু'তে যাচ্ছিল। তাকে দেখে সাইয়েদুল আরেফীন বললেন ঃ কি হে, তুমি কি আমাকে দাওয়াত করে খাওয়াবে নাকি? একজন অপরিচিত-ভিন্‌দেশী লোকের এ ধরনের প্রশ্নে তরুণীটি ক্ষিপ্ত হলো এবং তাচ্ছিল্য ভরে কোন জবাবই দিল না। হযরত সাইয়েদুল আরেফীন আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাধ্যমে ঐ তরুণীটির মনের কথা জানতে পারলেন।

তরুণীটি কিছুক্ষণ পর দেখল যে, তার পাতিলের চালগুলো আগুনের তাপ ছাড়াই ফুটতে শুরু করেছে। এতে সে দারুণভাবে ঘাবড়ে গেল। হাঁক-ডাক দিলে বাড়ির অন্যান্য লোকেরা জড়ো হয়ে এসে একই অবস্থা দেখতে পেল। দরবেশের প্রশ্নের কথা বলতেই সবাই এই অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল। এরই মধ্যে আবার তিনি সেখানে আবির্ভূত হলেন। এতে ঐ লোকগুলো আরও বিস্মিত হলো এবং সাথে সাথে তারা কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। ঐ তরুণীটির নামানুসারে ঐ গ্রামের নাম হয়েছে কালিশূরী। এটি এখন পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার অন্তর্ভুক্ত। এখানেই হাইস্কুল সংলগ্ন তাঁর মাযার আছে। সম্ভবত মাযার সংলগ্নই তাঁর আস্তানা আছে। তবে অন্যান্য এলাকায় মাযারকে কেন্দ্র করে যে নযর-নিয়াযের প্রচলন হয়েছে, হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র)-এর মাযারে তা হয় না।

পাকিস্তান-পূর্ব কালেও কালিশূরীতে প্রতি বছর তাঁর মাযার সংলগ্ন এলাকায় জাঁকজমকপূর্ণ মেলা বসত। মাযারকে কেন্দ্র করে বিদআত-শিরক শুরু হলে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতিরোধের মুখে মেলা ও কবর পূজা বন্ধ হয়েছে।

হযরত সাইয়েদুল আরেফীন (র)-কে কেন্দ্র করে যে জনশ্রুতি প্রচলিত, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে একজন ভিন্‌দেশী মুসলমান

দরবেশ কালিশূরী এসে কেন আস্তানা গাড়লেন, তা-ও খতিয়ে দেখা দরকার। এ ছাড়া কালিশূরী এলাকায় আগে থেকেই যদি কোন মুসলমান না থাকবেন, তবে তিনি সেখানে এলেন কিভাবে? আর এলেও একা যে আসেননি, এটা বোঝা যায়। তবে তাঁর কোন মুরীদের ইতিহাস জানা যায় না।

হযরত শাহ ইয়ার (র)

ফরিদপুর জেলার পালং থানার ধূমসী গ্রামে ইয়ারউদ্দীনের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সাধারণ দীনদার মুসলমান। কালক্রমে তিনি কামিল ওলী হিসেবে পরিচিত হন। তিনি যে কত বড় আল্লাহ্ প্রেমিক সাধক ছিলেন, তা সাধারণ মানুষের অজানাই ছিল। জীবনের প্রথমদিকে ফরিদপুরে কাটালেও জীবনের শেষ অংশটুকু বৃহত্তর বরিশালের মৃজাগঞ্জে কাটান। ব্যবসা ব্যাপদেশে তিনি সেখানে গেলেও ইসলাম প্রচারই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। দীর্ঘদিন ধরে ফরিদপুরের ব্যবসায়ীরা বরিশাল-পটুয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চলে ব্যবসা করতেন। সম্ভবত তাদের সাহচর্যেই তিনি মৃজাগঞ্জ এসে থাকতেন। তাঁর ছোট-খাট একটি দোকান ছিল। দিনে ব্যবসা এবং রাতে গোপনে আল্লাহ্র ইবাদত করে তিনি সময় কাটাতেন।

একটি ঘটনায় তাঁর অলৌকিকত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। দোকান খোলা রেখে একদিন তিনি নামায পড়তে গেলে এই ঘটনাটি ঘটে। খালি দোকান পেয়ে একজন লোভী ও অসাধু লোক কিছু মালামাল নিয়ে কেটে পড়তে চাইল। কিন্তু লোকটি যেইমাত্র সটকে পড়তে চাইল, অমনি তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। এ অবস্থায় মালগুলো দোকানে রেখে দিতে চাইলেও সে পারল না। এমনকি তার যবানও আটকে গেল। হযরত ইয়ারউদ্দীন (র) নামায শেষ করে এসে লোকটিকে উদ্ধার করেন। এর পর থেকেই তাঁর কেরামত প্রকাশ হয়ে পড়ে। লোকটি অবশ্য সাথে সাথেই তাঁর মুরীদ হয়ে যায়। এরপর থেকে এত অধিক সংখ্যক লোক তাঁর আস্তানায় ভীড় করতে থাকে যে, তাঁর পক্ষে আর ব্যবসা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তিনি সহসা রাগ করতেন না; তবে যখন রাগ করতেন, মনে হতো যেন আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে গেছে। বাংলা ১৩২৮ সালে মৃজাগঞ্জে তাঁর মৃত্যু হয়

দরবেশ কালিশূরী এসে কেন আস্তানা গাড়লেন, তা-ও খতিয়ে দেখা দরকার। এ ছাড়া কালিশূরী এলাকায় আগে থেকেই যদি কোন মুসলমান না থাকবেন, তবে তিনি সেখানে এলেন কিভাবে? আর এলেও একা যে আসেননি, এটা বোঝা যায়। তবে তাঁর কোন মুরীদের ইতিহাস জানা যায় না।

হযরত শাহ ইয়ার (র)

ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার ধূমসী গ্রামে ইয়ারউদ্দীনের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সাধারণ দীনদার মুসলমান। কালক্রমে তিনি কামিল ওলী হিসেবে পরিচিত হন। তিনি যে কত বড় আল্লাহ্ প্রেমিক সাধক ছিলেন, তা সাধারণ মানুষের অজানাই ছিল। জীবনের প্রথমদিকে ফরিদপুরে কাটালেও জীবনের শেষ অংশটুকু বৃহত্তর বরিশালের মৃজাগঞ্জে কাটান। ব্যবসা ব্যাপদেশে তিনি সেখানে গেলেও ইসলাম প্রচারই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। দীর্ঘদিন ধরে ফরিদপুরের ব্যবসায়ীরা বরিশাল-পটুয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চলে ব্যবসা করতেন। সম্ভবত তাদের সাহচর্যেই তিনি মৃজাগঞ্জ এসে থাকতেন। তাঁর ছোট-খাট একটি দোকান ছিল। দিনে ব্যবসা এবং রাতে গোপনে আল্লাহ্র ইবাদত করে তিনি সময় কাটাতেন।

একটি ঘটনায় তাঁর অলৌকিকত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। দোকান খোলা রেখে একদিন তিনি নামায পড়তে গেলে এই ঘটনাটি ঘটে। খালি দোকান পেয়ে একজন লোভী ও অসাধু লোক কিছু মালামাল নিয়ে কেটে পড়তে চাইল। কিন্তু লোকটি যেইমাত্র সটকে পড়তে চাইল, অমনি তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। এ অবস্থায় মালগুলো দোকানে রেখে দিতে চাইলেও সে পারল না। এমনকি তার যবানও আটকে গেল। হযরত ইয়ারউদ্দীন (র) নামায শেষ করে এসে লোকটিকে উদ্ধার করেন। এর পর থেকেই তাঁর কেরামত প্রকাশ হয়ে পড়ে। লোকটি অবশ্য সাথে সাথেই তাঁর মুরীদ হয়ে যায়। এরপর থেকে এত অধিক সংখ্যক লোক তাঁর আস্তানায় ভীড় করতে থাকে যে, তাঁর পক্ষে আর ব্যবসা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তিনি সহসা রাগ করতেন না; তবে যখন রাগ করতেন, মনে হতো যেন আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে গেছে। বাংলা ১৩২৮ সালে মৃজাগঞ্জে তাঁর মৃত্যু হয়

এবং সেখানেই তাঁর মাযার বিদ্যমান। এলাকার লোক তাঁর প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা পোষণ করে।

হযরত মাওলানা নেছারউদ্দীন আহমদ (র)

পীরে কামিল ও আধ্যাত্মিক সাধক হযরত মাওলানা নেছারউদ্দীন (র) প্রধানত একজন ইসলামী শিক্ষা বিস্তারকারী যুগপ্রবর্তক আলিম হিসেবেই সমধিক পরিচিত। ছারছীনার যে মাদ্রাসাটি আজ গৌবর ও সৌকর্যে বিশ্ববিখ্যাত, তার স্থপতি হচ্ছেন হযরত মাওলানা নেছারউদ্দীন (র)। ১৯১৪ সালে তিনি নিজ বাড়ির সুপারি বাগান কেটে এই মাদ্রাসার গোড়াপত্তন করেন। এই মাদ্রাসাকে ইসলামী শিক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলা যায়।

পূর্ববঙ্গ–বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলার মুসলমানরা যখন ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখী, জাতীয় অস্তিত্ব যখন বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হুমকির সম্মুখীন, তখন পীরে কামল হযরত নেছারউদ্দীন (র)–এর আবির্তাব। দু'শ বছরের গোলামী শাসনের বিরুদ্ধে আলিম সমাজের লাগাতার প্রতিরোধ আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে আসে, তখন বৃটিশ শাসকরা মুসলমানদের সমাজ শক্তির মূল উৎস নিজস্ব দ্বীনী শিক্ষাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। মুসলমান পীর–দরবেশ, ফকীর–ওলীরা যুগ যুগ ধরে আয়মা–লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ–দখল করে আসছিলেন এবং এর আয় থেকেই খানকাহ, মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন। ধুরন্ধর বৃটিশ শাসকরা সর্বপ্রথম এই সুযোগটুকুই কেড়ে নিল। ফলে প্রায় এক শ' বছর পর্যন্ত মুসলমানরা আপন শিক্ষা তাহযীব–তমদ্দুন হতে বঞ্চিত হলো। ইংরেজদের আগমন ঘটেছিল বাংলায় সর্বপ্রথম এবং বাংগালী হিন্দু আমলা পুঁজিপতি অমাত্যদের উদার অবারিত সুযোগ নিয়েই ইংরেজ তার শাসনের শিকড় বিস্তার করে। পরবর্তী বৃটিশ শাসনের দেড় শ' বছর বাংগালী হিন্দুরা নানাভাবে বৃটিশকে সহযোগিতা করেছে। এর বিনিময়ে তারা পেয়েছে ইউরোপীয় ভাবধারা পুষ্ট জাতীয় রেনেসাঁ এবং এটিকে তারা হিন্দু পুনরুজ্জীবনের ধারায় প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়। এ সময়টিতে মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে প্রতারিত, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত

এবং তামুদ্দুনিকভাবে ছিল বিভ্রান্ত। কেননা তাদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থাই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। সেই ঘোরতর দুর্দিনে মাওলানা নেছারউদ্দীনের আগমন। মুসলমানরা তখন হিন্দুদের পূজা-পার্বণ থেকে শুরু করে, আচার-ব্যবহার, রসম-রেওয়ায, তিথিলগ্ন মান্য করা, দিকশূল পালন এবং দেব-দেবীর নামে মানত পর্যন্ত করতে শুরু করে।

মাওলানা নেছারউদ্দীনের পিতার নাম আলহাজ্জ ছদরুদ্দীন আহমদ। বাংলা ১২৭৯ সালে তাঁর জন্ম। হুগলী মোহসীনীয়া মাদ্রাসায় পড়ার সময় তিনি বাংলার তৎকালীন মুজাদ্দিদে জামান ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর সাহচর্যে আসেন। অতি অল্প সময়েই আপন নিষ্ঠা ও প্রতিভার গুণে আধ্যাত্মিক সাধনায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। ফুরফুরা পীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে তিনি নিজের এলাকায় এসে হিদায়েতের কাজ শুরু করেন। লাখো মানুষ তাঁর আহবানে সাড়া দিল। চোর ডাকাত, সুদখোর-মজুতদার, হাঙ্গামাবাজরা তাঁর হাতে বায়আত হয়ে সূফী হয়ে গেল। ক্রমশ সমাজে তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব সৃষ্টি হলো। বিচার মীমাংসার কাজও তাঁকে করতে হতো। তিনি যত কঠোর শাস্তিই দিতেন, তার বিরুদ্ধে কারো প্রতিবাদ করার শক্তি ছিল না। বৃটিশ আমলে অনেক সময় মহকুমা হাকিম বহু মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসার দায়িত্ব তাঁর উপরই ফেরত পাঠাতেন। কিন্তু অল্পদিনেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, শুধু সামাজিক কাজকর্ম করেই মুসলমানদের অবক্ষয় ঠেকানো যাবে না। এজন্য তিনি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এই পটভূমিতেই তিনি ছারছীনা মাদ্রাসার গোড়াপত্তন করেন। এই মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদেরকে তিনি আপাদমস্তক রসূল (সা)-এর সুন্নতী তরীকায় পরিচালনা করেন। এভাবে সুন্নত ও বিদ'আতের মাঝে তিনি একটি প্রত্যক্ষ বিভক্তি রেখা টেনে দেন। শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পর্যন্ত এই মাদ্রাসার উন্নয়নে এগিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো ছারছীনা দারুস্সুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসা। এ দেশে এই মাদ্রাসায়ই প্রথম টাইটেল শ্রেণী খোলা হয়। প্রথম থেকেই একটি আদর্শ দীনী প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য তিনি আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করেন। এ জন্য লিল্লাহ্ বোর্ডিং-এ সকল ছাত্রের

থাকা-খাওয়া, বাধ্যতামূলক করা হয়। এতে একটি উপযুক্ত ইসলামী পরিবেশে ছাত্ররা পড়ালেখা করার সুযোগ পাচ্ছে। পীর সাহেব শুধু ওয়াজ মাহফিল করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাসাউফের শিক্ষাও দিতেন। বছরে দু'বার নিজ বাড়িতে ইছালে ছওয়াবের মাহফিল করে সকলকে দাওয়াত দিতেন। একদিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দীনী শিক্ষার মহান পথিকৃৎ, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের পীর- মুর্শীদ হিসেবে গোটা দক্ষিণ এলাকায় তিনি ছিলেন কিংবদন্তী। অচিরেই গোটা দক্ষিণ এলাকায় তিনি বিপুল ভক্তকুল সৃষ্টি করেন। আপন প্রচেষ্টায় তিনি ছারছীনায় মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের এক সমৃদ্ধ কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তৌহিদ ও রিসালত প্রচারের জন্য তিনি গঠন করেছিলেন জমিয়তে হেজবুল্লাহ্। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। পাকিস্তান অর্জিত হবার পর ছারছীনায় আহুত সর্বদলীয় উলামা সম্মেলন তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রভাবেরই ফল।

নও-মুসলিমদের দুঃখ মোচনের জন্য অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য দানের জন্য 'হেমায়েতে ইসলাম তহবিল', মাদ্রাসাসমূহের আর্থিক অসচ্ছলতা দূরকারী 'এহইয়ায়ে ছুন্নাত তহবিল', 'মক্কা-মদীনা রিলিফ ফাণ্ড' ইত্যাদি তহবিল গঠন করেছিলেন।

নতুন মুসলমান বানানোর চেয়ে ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে ইসলামী আকীদায় ফিরিয়ে আনার কাজই তিনি করেছেন। এ ছাড়া দীনী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। সারা বাংলাদেশের মধ্যে বরিশাল-পটুয়াখালীতে মাদ্রাসার সংখ্যা যে আজ অত্যধিক, তা ছারছীনার দীনী শিক্ষা আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল। নিজ জেলার বাইরেও তিনি এবং তদীয় পুত্র পীর মওলানা আবু জাফর বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। বরিশালে ইসলামী পরিবেশ ও তাহযীব-তমদ্দুন রক্ষায় এ সব মাদ্রাসা ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

হযরত মওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র)

মওলানা শাহ আবু জাফর পীরে কামিল হযরত মাওলানা নেছারউদ্দীন (র)-এর পুত্র। ১৯১৫ সালে তিনি পৈতৃক নিবাস নেছারাবাদে (সাবেক

স্বরূপকাঠী) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাবলীগী কাজে সফরে থাকার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত তিনি দীনী খেদমত আনজাম দিয়েছেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার সম্প্রসারণ কিংবা মাদ্রাসাকে একটি অতুলনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার মাঝেই তিনি তাঁর দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি দেশব্যাপী দীনী তবলীগ করেছেন। সারা দেশে শত শত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ছারছীনা আলীয়া মাদ্রাসা এবং পরে দারুল উলুম সাহরানপুরে কুরআন–হাদীসের শিক্ষা লাভ করে মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি তাঁর পিতার সাথে তবলীগ–হিদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর গদ্দীনশীন পীর হিসেবে তিনি শরীয়ত ও মারিফতের শিক্ষা দানের জন্য ব্যাপকভাবে সারা দেশ সফর করেন। শিরক, বিদাআত, কুসংস্কার উচ্ছেদের জন্য তিনি সারা জীবন কঠিন সাধনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন এলাকায় শত শত মাদ্রাসা, মক্তব, তালিমী খানকাহ, মসজিদ ও যিকিরের মজলিস কায়েম করেন। সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত 'জমিয়তে হিজবুল্লাহ' নামক অরাজনৈতিক দীনী আন্দোলন পরিচালনা করেন। পরে বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে সুন্নাত অল–জামাত ও বাংলাদেশ জমিয়তে উলামা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে পাক্ষিক 'তাবলীগ' নামে একটি উঁচুমানের ধর্মীয় পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয় এবং এখনও তা অব্যাহত আছে। বাংলা ভাষায় তফসীরে কুরআন সহ বহুসংখ্যক ইসলামী বই–পুস্তক প্রকাশেও তাঁর ভূমিকা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে শিক্ষা প্রচারে তাঁর অতুলনীয় ভূমিকার জন্য তাঁকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার দেয়া হয়। পীর সাহেব তাঁর সমগ্র জীবন ইসলামের সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন। শুধুমাত্র খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে, ভক্তদের নযর–নিয়ায নেয়াকে তাঁর পিতা ও তিনি পছন্দ করেননি। লব্ধ অর্থ দীনী শিক্ষা প্রচারের কাজে তিনি ব্যয় করেছেন। ইসলামী শিক্ষা প্রচারে ছারছীনা খানকা শরীফের অবদানের কোন তুলনা আছে বলে আমাদের জানা নেই। তদানীন্তন পাকিস্তানে ইসলামী নিযাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি বহুবার উলামা সম্মেলন করেছেন। ১৯৪৭ সালে

সিলেট রেফারেণ্ডামে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেন। ১৯৫৪ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় উলামা কনফারেন্সে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা ২২ দফা আদর্শ প্রস্তাব রচনার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন।

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন তাঁর অমর কীর্তি। এখানে প্রায় দেড় হাজার তালিবে ইলেম লিল্লাহ্ খোরাকী লাভ করে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা লাভ করছে।

ছারছীনা দরবার শুধু মুরীদ তৈরি করেই দায়িত্ব শেষ করে না। এখান থেকে সবক ও হিদায়েত নিয়ে অনেকেই পীরের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে দেশের আনাচে-কানাচে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। বরিশালে আজ যে বহুসংখ্যক মাদ্রাসা দেখা যায়, তার মূল প্রেরণা এসেছে ছারছীনা থেকে। ইসলামী শিক্ষায় বরিশালের প্রধান্য সৃষ্টির মূল কৃতিত্ব ছারছীনার শিক্ষা আন্দোলন ও তাবলীগী তৎপরতার। বরিশালে বিগত এক শ' বছরের ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ছারছীনার অবদান অপরিসীম।

চরমোনাইর পীর সাহেব (র)

বরিশাল জেলার কোতয়ালী থানাধীন চরমোনাই একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এখানেই পীর সাহেব মরহুম হযরত মাওলানা ইছহাক (র) একটি খানকাহ্ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি সারা জীবন ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও ইসলাম প্রচারে নিরলস কাজ করে গেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য এলাকা সফর করে ওয়াজ-নসীহত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র পীরে কামিল পীর সাহেব হযরত মওলানা ফজলুল করিম সাহেব গদ্দীনশীন পীর হন। তিনি সাধারণ্যে 'চরমোনাইর' পীর হিসেবে সুপরিচিত। ছারছীনার পরই চরমোনাই এতদঞ্চলের আধ্যাত্মিক সাধনার একটি প্রাণকেন্দ্র রূপে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সারা দেশে চরমোনাইর পীর সাহেবের কয়েক লক্ষ মুরীদ আছে। পীর সাহেব তাঁর মুরীদদের আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা)-এর পথে জিহাদের তালিম দেন। এ দেশে বহু খানকাহ ও পীরের দরবার রয়েছে, যে সব জায়গায়

আধ্যাত্মিক প্রচারের চেয়ে বৈষয়িক স্বার্থ বেশি গুরুত্ব পায়। কিন্তু চরমোনাই এদিক থেকে ব্যতিক্রম। আত্মপ্রচার বিমুখ পীর সাহেবের মুরীদদের মাঝে সমাজের বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি। প্রতি বছর এখানে একবার বার্ষিক মাহফিল হয়। তাতে সারা দেশ থেকে কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। ভক্ত মুরীদরা মাহফিলে আসা–যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে আল্লাহ্র যিক্র করেন। চরমোনাইর মুরীদরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা)–এর হুকুম–আহকামের প্রতি অত্যন্ত সচেতন। লেবাস–পোশাক–আচরণে তাঁরা প্রকৃত মু'মিন হবার সাধনা করেন। বরিশাল সহ সারা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে চরমোনাইর পীর সাহেবের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

বরিশালে ইসলাম ঃ খানজাহান আলী, হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ প্রমুখদের প্রভাব

'খুলনা জেলায় ইসলাম' গবেষণা গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব লিখেছেন ঃ "বাংলাদেশে প্রায় দশ কোটি লোকের বাস। তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা নয় কোটির বেশী, কম নয়। খুলনা জেলাতে এদের বর্তমান সংখ্যা ১৪, ৭৪, ২৩৮ জন মাত্র। এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ...... এদের পূর্বপুরুষের কে কখন, কোথায় কিভাবে এ এলাকায় আসেন এবং কে প্রথম বসতি স্থাপন করেন তা নির্ণয় করা একরকম অসম্ভব। তবে সুন্দরবনের কাননময় প্রদেশের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় যিনি ব্যাপকভাবে আবাদ ও বসতি স্থাপন করেন এবং কালক্রমে একটি সুসংবদ্ধ ধর্ম ও কল্যাণ রাষ্ট্রে রূপ দেন, সেই রূপকুমার –হযরত উলুঘ খান–ই–জাহান (৮৬৩ হিঃ/১৪৫৯ খৃঃ) সংক্ষেপে খান জাহানের ইতিহাস যেমন কৌতূহলজনক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ।"

"এই মহান কর্মবীর তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে যে অতীত স্মৃতির নিদর্শনাদি রেখে গেছেন, তা আমাদের বিশেষ গৌরবময় জাতীয় সম্পদ। খুলনা জেলায় ইসলাম ও মুসলমানের ইতিহাস রচনায় তাঁর যাদুকরী প্রতিভার কথা স্মরণ করলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। শুধু খুলনা জেলাতে নয়, তদানীন্তন নিম্ন বাংলার (Lower Bengal) খুলনা, যশোর, বরিশাল, ফরিদপুর এমনকি পশ্চিমবঙ্গের (ভারত) চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই মহাপুরুষের কীর্তিরাজি বিস্তৃত রয়েছে।"

সিলেট, চট্টগ্রাম উত্তর বাংলা কিংবা দক্ষিণের খুলনা অঞ্চলে মোটামুটি একটি সুসংবদ্ধ ইসলাম প্রচারের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া গেলেও বরিশালের বেলায় তেমনটা পাওয়া যায় না। তবে হাজী শরীয়তুল্লাহ (র)–এর সুবাদে

ফরিদপুরে ইসলাম প্রচারের একটি পরিকল্পিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। একদিকে ফরিদপুর এবং অন্যদিকে খুলনা, বরিশালের এই দুই সন্নিহিত অঞ্চলের ইসলাম প্রচারক সাধকদের অনুসারীদের প্রয়াসেই যে বরিশালে ইসলামের আলো বিস্তৃত হয়েছে, এটা এক প্রকার নিশ্চিত। যাঁরা ইসলাম প্রচার করেছেন, তাঁরা তা করেছেন অত্যন্ত নীরবে–নিভৃতে আল্লাহর রেযামন্দির জন্য – নবী পাক (স)–এর সীরাত অনুসরণ করে। তাঁরা ছিলেন প্রচার বিমুখ। সত্যধর্ম গ্রহণকারী একজন মুসলমান হিসেবে তাঁরা ইসলাম প্রচারকে ঈমানী দায়িত্ব মনে করেছেন। এ কারণেই প্রাচীন আমলের ইসলাম প্রচারকদের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। এ কারণে যে কোন লেখক গবেষককেই একাজে হোঁচট খেতে হবে।

হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরাজী আন্দোলন শুধু বরিশাল নয়, গোটা বাংলাকেই আলোড়িত করেছিল। বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও অসংখ্য ফরাজী উপাধিধারী লোক বাস করেন। হাজী সাহেবের জন্মকাল ১৭৮০ ইং পলাশী যুদ্ধ–উত্তর তিন দশক পর। এ সময় মুসলমানদের উপর ইংরেজ শাসকদের চরম নির্যাতন নেমে আসে। আজাদী হারিয়ে মুসলমানরা তখনও ছটফট করছিলেন। "বাংলা ১২২৭ সনে হযরত মাওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ সাহেব ফরিরদপুর, বরিশাল, ঢাকা, মোমেনশাহী, ত্রিপুরা, খুলনা প্রভৃতি জেলার নানা স্থানে নির্ভীকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর ধর্ম প্রচারের দরুন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার সর্বত্র এবং আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলায় তাঁর সুনাম বিস্তৃত হয়। তিনি তাঁর শিষ্যগণকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার, বিদ'আত ও অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে থাকবার জন্য নির্দেশ দিতেন। তিনি মুসলিম সমাজ ও ধর্ম অনুপ্রবিষ্ট বহুদিনের বহু হিন্দু দেব–দেবীর অর্চনাসম্ভূত অন্ধবিশ্বাস অস্বীকার করে সত্য প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। ফলত, অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জমান মানুষকে ইসলামের আলোক প্রভা বিকীরণ দ্বারা আলোকিত করবার জন্য মওলানা শরীয়তউল্লাহ যে বিরামহীন পরিশ্রম করেছিলেন, তার নজীর বাংলাদেশের ইতিহাসে বেশি নেই (বাংলাদেশের সূফী সাধক, ১৭০)।

১৮৪০ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ১৭ বছর আগে হাজী শরীয়তুল্লাহ (র) ইন্তেকাল করেন। তবে তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র মওলানা মুহসিন উদ্দীন 'দুদু মিয়া' ফরাজী আন্দোলনের দায়িত্ব নেন। এ সময় ফরাজী আন্দোলনের আরও বিস্তৃতি ঘটে। হাজী শরীয়তউল্লাহ সূচিত ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে হিন্দু জমিদার ও নীল কুঠিয়ালরা উত্তপ্ত বারুদ হয়ে উঠছিল। ইংরেজরা প্রভাবশালী হিন্দুদের সহায়তায় মুসলমানদের ভূমিহীন প্রজায় পরিণত করে। ইংরেজদের সাথে মুকাবিলার জন্য তিনি তাঁর মুরীদদের অস্ত্র চালনা পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন। পীর দুদু মিয়া বলতেনঃ 'মানুষ কেবল আল্লাহর দাস। অতএব ইংরেজদের দাসত্ব করা মানুষের স্বভাব ধর্মের বিরোধী। এভাবে ইংরেজ শাসকদের সাথে তাঁর সংঘাতের সূত্রপাত হয়। পীর দুদু মিয়ার অসংখ্য শিষ্য ছিল বরিশাল অঞ্চলে। এঁরা ইসলাম প্রচারে বিশেষ অবদান রাখেন। মোটকথা, খান জাহান, হাজী শরীয়তুল্লাহ, পীর দুদু মিয়া প্রমুখের অক্লান্ত সাধনায় বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে যে শত শত মুরীদ তৈরি হয়েছেন, তাঁরা এ জেলায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক সোপান রচনা করেছেন। এদের সংখ্যা ও পরিচয় উদ্ধার করা সত্যি কঠিন।

বাংলার ইসলাম প্রচারের দিশারী ফুরফুরার পীর সাহেব

মোঘল শাসনের শেষের দিক মুসলমানদের অবক্ষয়ের যুগ। ইসলামী শরীয়তের অনুসরণে শৈথিল্যজাত বিলাসিতা এই অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে। অধিকাংশ মোঘল শাসকই শাসন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য হিন্দু ও রাজপুতদের সাথে সমন্বয়ের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা হিন্দু ও রাজপুত রমণীদের আপন হেরেমে স্থান দেন এবং তাদেরকে ধর্মান্তরিত না করেই বিয়ে করেন। ফলে তারা মোঘল হেরেমের মধ্যে পূজা-অর্চনা ও হিন্দু-সংস্কৃতির চর্চা শুরু করে দেয়। ক্রমশ বিজাতীয় এই হেরেম-নন্দিনীরা মোঘল হেরেমের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে। সম্রাট আকবর নিজে সর্বধর্মের সমন্বয় ভিত্তিক এক অদ্ভুত ধর্ম 'দীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তন করেন। এ সময়ই মহান মুজাদ্দিদ হযরত আলফেসানী (র)-এর আবির্ভাব ঘটে।

মোঘল সাম্রাজ্যের নিশান-বরদারদের যখন অধঃপতন চলছিল, তখন মারাঠাবাসীদের শক্তি সঞ্চয়-প্রয়াস ও হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয়। এই দ্বৈত সংকট সন্ধিক্ষণেই বৃটিশ বেনিয়ারা চূড়ান্ত আঘাত হানে। ১৭৫৭ সালে তারা যুদ্ধ নামক এক প্রহসনের মাধ্যমে পলাশী প্রান্তরে মুসলমানদের থেকে রাজ্য শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। সংগত কারণেই সাত শ' বছর মুসলিম শাসনাধীনে থাকা হিন্দু জনগোষ্ঠী মনিব বদলের সুযোগকে ভাগ্য বদলের সুযোগে পরিণত করে। এই অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে আজাদী পুনরুদ্ধার করাও কঠিন হয়ে উঠে। ১৮৩১ সালে বালাকোটে এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লব হিন্দু ও শিখদের গাদ্দারীর কারণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। ফলে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এ সময়ে দিশেহারা জাতিকে সত্যিকার দীনী চেতনা ও ঈমানের শক্তিতে উজ্জীবিত করার জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (ওফাত ১৮৩৮ ঈসায়ী), মওলানা

ইমামুদ্দীন হাজীপুরী (ওফাত ১৮৫৭ ঈসায়ী), মওলানা সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (ওফাত ১৮৫৮ ঈসায়ী) এবং হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (ওফাত ১৮৭৩ ঈসায়ী) প্রমুখ বুযর্গ আপ্রাণ সচেষ্ট থাকেন।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর মুসলমানদের যখন ঘোরতর দুর্দিন চলছিল, তখন ১৮৫৯ সালে পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার ফুরফুরা শরীফে এক মহান ওলীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহুর বংশধর। তাঁর পূর্বপুরুষ মুনসুর বাগদাদী (র) দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সময় ৭৪১ হিজরী সনে বাংলাদেশের হুগলী জেলার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশের মুস্তফা মাদানী (র) ছিলেন মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর সাহেবজাদা খাজা মাসুম রব্বানী (র)-এর মুরীদ এবং বাদশাহ্ আলমগীর যিন্দাপীর আওরঙ্গজেব মুহিউদ্দীনের পীরভাই ছিলেন। তাঁরই নামে মেদিনীপুর জেলার নামকরণ করা হয়। সেখানে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব তাঁকে লাখেরাজ জমিদারী দিয়েছিলেন। ফুরফুরার পীর সাহেব তাঁরই অধঃস্তন পুরুষ। তাঁর পিতার নাম মওলানা আবদুল মুক্তাদির। তিনি প্রথমে সিতাপুর মাদ্রাসা এবং পরে হুগলী মুহসীনীয়া মাদ্রাসা থেকে জমাতে উলা পাশ করেন। কলকাতা সুন্দরিয়া পট্টি জামে মসজিদে শহীদ সায়্যিদ আহমদ (র)-এর খলীফা হাফেয জামাল উদ্দীনের নিকট তিনি হাদীস, তফসীর ও ফিক্হ পড়েন। এরপর তিনি নাখোদা মসজিদে মওলানা বেলায়েত হুসাইন সাহেবের নিকট মানতিক ও হিকমত পড়েন। মদীনা শরীফে তিনি কিছুদিন অবস্থান করে চল্লিশখানা হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি কলকাতায় হযরত শাহ সুফী ফতেহ আলী ওয়াইছী (র)-এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করে বাতিনী ইলম শিক্ষা করেন। পরে তাঁর প্রধান খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। গোটা উপমহাদেশে ফুরফুরার পীর সাহেব তাছাউফ চর্চা ও তরীকত প্রচারে অসামান্য অবদান রেখেছেন।' তিনি বলতেন, 'আড়াই কোটি মুসলমান আমার মুতাকিদ।' প্রায় আড়াই শ' মুরীদ

তাঁর খাস খিলাফত লাভ করে সারা জাহানে কামিল পীর ও মুরশীদে মুকাম্মিল হয়েছেন। মওলানা শাহ সূফী নেছার উদ্দীন আহমদ ফুরফুরা পীর সাহেবের খাস মুরীদ ও অন্যতম খলীফাহ হিসাবে বরিশালে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ফুরফুরার পীর সাহেবই তাঁর আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার দিশারী।

বরিশাল তথা দক্ষিণ বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে ফুরফুরার পীর সাহেবের প্রসঙ্গ না এনে উপায় নেই। তিনি মুসলমানদের জীবনে ইল্‌মে জাহের ও বাতেনের জোয়ার এনে দিয়েছেন। হাজার হাজার মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকায়, হুজরা, আস্তানা, দরবার কায়েম করে তিনি আলোর দিশা দিয়েছেন। মাতৃভাষায় ওয়াজ-নসীহত, দোয়া-মিলাদ, মুনাজাত পরিচালনা করে তিনি আঞ্জুমান ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালা' কায়েম করেন। মুসলমানের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগে তিনি প্রাণের সঞ্চার করেন। পকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অসীম। ১৯৩৯ সালের ১৭ ই মার্চ, শুক্রবার এই মহান পীর ইন্তেকাল করেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে ফুরফুরার পীর সাহেবের জীবন ও দ্বীন প্রচারের কথা বয়ান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তিনিই মূলত বরিশালে সিপাহী বিপ্লব উত্তর দুর্দিনে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। "Hogly District Hand Book"-এ ফুরফুরাকে "Apka of Pilgrimage for Musalims" বর্ণনা করা হয়েছে। West Bengal District Gazetters Hogly-তে ও এর উল্লেখ রয়েছে। 'বাংলাদেশের সুফী সাধক'-এর লেখক ডঃ গোলাম সাকলায়েম বলেছেনঃ "ফুরফুরা শরীফের মর্যাদা এখানে যে, চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এখানকার সুফী সাধক ও দরবেশ, মৌলবী ও মওলানাগণ ইসলাম প্রচারের মহান কাজে বংশ পরম্পরায় নিযুক্ত আছেন। তাঁরা মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ তৈরি করতেন, ধর্মোপদেশ দিতেন পথভ্রষ্টকে, শিক্ষা প্রচার ও আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে দিশারী ছিলেন। সামগ্রিকভাবে জাতি, ধর্ম ও সমাজ সেবার কাজে ফুরফুরার পীর দরবেশগণ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছেন। (পৃ ২১৩ ঃ বাংলাদেশের সুফী সাধক)।

ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে হযরত শাহ সূফী মাওলানা নেছার উদ্দীন (র)–এর অবদান ঃ (১৮৭২–১৯৫২)

রাজনৈতিক পটভূমি

১৮৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে একটি যুদ্ধ নাটকের ফলে বাংলার মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারায় । একই সাথে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে একদিকে যেমন ইংরেজ শাসনাধীন এলাকার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে, অন্যদিকে তেমন স্থানে স্থানে কোম্পানী শাসকরা মুসলমানদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে থাকে। পলাশীতে স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার এক শ' বছর পর ১৮৫৭ সালে ইংরেজ বিরোধী বিপ্লব সংঘটিত হয়। তবে এ বিপ্লব নানা কারণে ব্যর্থ হয়। উপর্যুপরি ভারতের জনগণ বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ইংলণ্ডের মূল সরকার ভারত শাসনের কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করে। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর হতে বাকেরগঞ্জও ইংলণ্ডের মহারাণীর শাসনাধীনে চলে যায়। তবে ১৭৫৭ সালের পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকেই শস্য–শ্যামলা বাণিজ্য স্বার্থ সম্পৃক্ত দক্ষিণের এ জেলায় ইংরেজ বণিকদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বাকেরগঞ্জের সমুদ্র সংযুক্ত নৌ–পথ, চাল, লবণ ও সুপারীর প্রাচুর্য এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ শুরু থেকেই ইংরেজ বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম সুযোগেই তারা বাকেরগঞ্জের বাণিজ্য বন্দর বারৈকরণ, মুতালরী ও বাকেরগঞ্জ দখল করে নেয়। জনশ্রুতি আছে, রবার্ট ক্লাইভ নলছিটির বারৈকরণে এসেছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমলে বারৈকরণে তাদের স্থায়ী বাণিজ্য–কর্মচারী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে । ইংরেজ সুহৃদ ও পলাশীর নাটকের অন্যতম নায়ক রাজবল্লভের জমিদারির কাছারীও এই বারৈকরণে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উল্লেখ্য , রাজবল্লভের জমিদারি আওতায় ছিল বাকেরগঞ্জ অঞ্চলটি। ঐতিহাসিকরা

এব্যাপারে নিশ্চিত যে, রাজবল্লভের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল বাকেরগঞ্জের জমিদারি লব্ধ আয় । বাকেরগঞ্জ শুরুতে ঢাকা জেলা প্রশাসনের অধীন ছিল । ১৮৫৮ সালে বাকেরগঞ্জকে আলাদা ম্যাজিস্ট্রেসি ও কালেক্টরেটের অধীনে আনা হয় ।

ইংরেজ বণিকরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে বাংলা মুলুকে এসেছিল প্রথমত অর্থনৈতিক স্বার্থে এবং এই স্বার্থের নিশ্চয়তার জন্যই তাদের কূট - কৌশল ও শক্তি ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে নিতে হয়। যেহেতু বাকেরগঞ্জ এলাকায় অফুরান ধান, চাল, লবণ, সুপারী ব্যবসায়িক সাফল্যের উপাদান ছিল , সে কারণে পয়লা নযরেই ইংরেজ বণিকরা বাকেরগঞ্জের উপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করে।

মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বৈরী আচরণ

বৃটিশ বেনিয়ারা মুসলমানদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেয় এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপক্ষ হিন্দু উচ্চবিত্ত আমলা মুৎসুদ্দীরা মুসলমানদের রাজ্য হারানোর ঘটনায় নীরব দর্শক ছিল না। তারাই মূলত ঘর-শত্রু বিভীষণ হয়ে ইংরেজ বণিকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এবং পরবর্তী দু'শ বছর ইংরেজ শাসন টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে মুসলমানরা কখনও ইংরেজ শাসনকে মেনে নেয়নি-এর ফলে একদিকে ইংরেজ শাসকদের সমস্ত আক্রোশ যেমন আপাতি হয় মুসলমানদের উপর, তেমনি মুসলমানরাও অত্যন্ত সচেতনভাবে ইংরেজদের পরোক্ষ সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে। এমন কি ইংরেজী শিক্ষা থেকেও মুসলমানরা ইচ্ছা করেই বঞ্চিত থাকে।

মুসলমানদের দুর্ভাগ্য তারা প্রধানত একটানা এক শ' বছর এবং বিচ্ছিন্নভাবে পরবর্তী এক শ' বছর বৃটিশ বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম অব্যাহত রাখলেও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে উৎখাত করতে পারেনি। যুদ্ধে পরাজিত হলে যে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা পরাজিতের ভাগ্যে জুটে, দু'শ বছর পর্যন্ত মুসলমানদের ভাগ্যে, তাই জুটেছে।

সুতরাং বৃটিশ শাসনামলে শাসকবৃন্দের বৈরী মনোভাব, নিপীড়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদ।

প্রধানত মক্তব, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার আর্থিক উৎস ছিল জনগণের মুক্তহস্ত দান-খয়রাত এবং মুসলিম শাসকদের উদার সহযোগিতা। মুসলিম শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক ব্যয় নির্বাহের জন্য যে সব লাখেরাজ সম্পত্তি দান করা হয়েছিল, বৃটিশ শাসকরা তা কেড়ে নেয়। দ্বিতীয়ত মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ও অফিস-আদালতের প্রচলিত ভাষা ছিল ফারসী। ইংরেজ শাসকরা ফারসীর বদলে ইংরেজী প্রবর্তন করায় মুসলমানরা রাতারাতি নিজেদেরকে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার জন্য অনুপযোগী একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখতে পায়। শাসকের মর্যাদা ও অবস্থান হারাবার পর সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের চাকরি ক্ষেত্রও সংকুচিত হলো। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণকারী হিন্দু জনগোষ্ঠী এই শূন্যস্থান পূরণ করে। বৃটিশ শাসকদের স্থানীয় সহযোগী-প্রশাসনের কেরানী, পাইক-পেয়াদার স্থানটি হিন্দুরা দখল করে নেয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় অবহেলিত, নিপীড়িত, অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। জনগণের ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের অবক্ষয় তখনও অব্যাহত ছিল। সত্যিকথা বলতে কি খানকাহ মাদ্রাসার পরিচালনা ও জিহাদের তরবারি একসাথে চালাতে গিয়ে মুসলমানরা ব্যর্থ হলেন, এবং তখন শিক্ষার দিকেই পুরো মনযোগ দিলেন।এ ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষার সাথে সহযোগিতামূলক প্রয়াসের প্রথম পদক্ষেপ ছিল আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ এবং পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা।

ইংরেজ শাসনের দু'শ বছরের অধিকাংশ সময় মুসলমানরা হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়া তথা হৃত আজাদী পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। এ সময় তারা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র পরিচর্যা কিংবা আত্মগঠনের অবকাশ পায়নি । এই সুযোগে হিন্দুদের সংস্কৃতি রসম-রেওয়াজ দ্বারা সাধারণ

মুসলমানরা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালীতে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পদ্ধতির বদলে হিন্দুয়ানী ধারা অনুপ্রবেশ করে । এমন কি মুসলমানী পোষাক-পরিচ্ছদ বর্জন করে মুসলমানরা হিন্দুদের অনুসরণে পোশাক পরতে থাকে। হিন্দুদের পূজা-পার্বন, গান-বাজনা, মেলায় মুসলমানরা দর্শক হিসেবে অংশ নিতে থাকে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের মৌলিক দাবি পূরণেও সাধারণ মুসলমানদের মাঝে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী পরিবেশ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকায় মুসলমান শিশুরা ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয় ।

ইসলামী শিক্ষা ও রীতিনীতি থেকে মুসলামনদের এই বিচ্যুতি বাংলার দক্ষিণাঞ্চল বাকেরগঞ্জে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বরিশালের ছারছীনার পীর সাহেব শাহ সূফী নেছার উদ্দীন (র)-এর কর্মৎপরতার সূচনা হয় এই পটভূমিতেই। কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ইসলামী বিষয়সমূহে উচ্চশিক্ষা লাভ করে তিনি ফুরফুরার পীর সাহেব হযরত শাহ সূফী মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর নিকট বায়আত নিয়ে দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। এখানে তিনি ইল্‌মে মারিফাতে কামালিয়াত হাসিল করেন। অতঃপর তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের খলীফা হিসেবে ইসলাম ও মুসলমানদের খিদমতের লক্ষ্যে ছারছীনায় দ্বিনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন ।

নেছার উদ্দীন শব্দের অর্থ হচ্ছে, ইসলাম ধর্মের জন্য নিবেদিত প্রাণ । তিনি তাঁর সারা জীবনের সাধনায় তাঁর নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করে গেছেন।

পীর সাহেব নেছারউদ্দীন (র) সম্পর্কে খ্যাতনামা ইসলামী শিক্ষাবিদ ডঃ আইয়ুব আলী লিখেছেন ঃ "ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার প্রসার ও উপরে উল্লেখিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, শিরক, বিদ'আত এবং অনৈসলামিক ভাবধারা, রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানের পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার সারা জীবনের আক্লান্ত সাধনা । এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি সুচিন্তিত কর্মপন্থা অনুসরণ করেন। পীর কেবলা তাঁহার আমল-আখলাক, আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে সর্বদা মহানবী (সা)-এর

জীবনাদর্শ ও সুন্নাতের পায়রবী করিতেন। ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর অনুসৃত পন্থার অনুসরণ করেন। সমাজ জীবন হইতে অনৈসলামিক আকীদা ও রীতিনীতির মূলোচ্ছেদের জন্য তিনি ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন এবং ছারছীনায় স্বীয় বাড়ির গুলবাগ কুঞ্জে একটি ইসলামী মাদ্রাসা কায়েম করেন। তিনি দক্ষিণ বঙ্গীয় বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর ও খুলনা জেলাসমূহে ব্যাপকভাবে প্রচারাভিযান পরিচালনা করিয়া এই সকল জেলার বিভিন্ন এলাকা ও গ্রামে তাঁহার মুরীদ ও খলীফাগণের সহযোগিতায় বহু মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল মাদ্রাসা স্ব স্ব এলাকায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম, সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্ববর্তী আলিম সমাজও ওয়াজ-নসীহতের মধ্যে তাঁহাদের কর্মতৎপরতা সীমিত রাখিতেন। কাজেই ইসলামী জীবনাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। পীর কেবলার বাস্তবমুখী কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের ফলে দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক মকতব, মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে এতদঞ্চলের মুসলিম সমাজ শির্ক, রিদআত ও অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথার অভিশাপ হইতে মুক্ত হয়।”

“জনগণের মধ্যে ইসলামী আদর্শ ও বিধি-বিধানসমূহ প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁহার অন্য একটি কর্মসূচী ছিল বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তকাদি প্রণয়ন ও সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ। ছারছীনা দরবারে এই উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ কয়েকজন মুরীদকে এই দায়িত্বে ব্যাপৃত রাখেন। এইভাবে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশে ইসলাম বিষয়ক বহু পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। ‘তাবলীগ’ নামে একটি সাময়িকী ছারছীনা হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহারই প্রেরণায় বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থাদি প্রণয়নের এক নবযুগের সূচনা হয়।”

“তৎকালে বাংলা সহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম বিরোধী দুইটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত কর্মতৎপর ছিল ঃ খৃষ্টান মিশনারী ও আর্য-সমাজী দল। খৃষ্টান মিশনারীরা সরকারের পরোক্ষ ছত্রছায়ায় ইসলামের মহানবী (সা)

সম্পর্কে মিশনারী পত্রপত্রিকা, পুস্তকাদি ও সভা-সমিতির মাধ্যমে কুৎসা রটনা করিত ও মুসলমানদেরকে নানা প্রলোভনে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে সচেষ্ট ছিল। আর্য-সমাজীদের দাবি ছিল হিন্দুস্তান হিন্দুদের, কাজেই মুসলমানদেরকে এই দেশে বাস করিতে হইলে হিন্দু সমাজভুক্ত হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শুদ্ধি আন্দোলন পরিচালিত হয়। বর্ণবাদী হিন্দু ধর্মে অহিন্দুকে হিন্দু করিবার কোনও বিধান নাই। তবুও আর্য-সমাজীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে গো-ময় ও গোমূত্র সেবন করাইয়া হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করিবার অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। পীর কেবলা এই দুইটি মুসলিম বিরোধী প্রতিষ্ঠানের হীন দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে মুসলিম জনগণকে সচেতন করিয়া তুলেন এবং এই সম্পর্কে ছারছীনা হইতে কয়েকটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়।"

"শোষণ-নির্যাতন বন্ধের জন্যও পীর কেবলা নেছার উদ্দীন (র) কয়েকটি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুদ, রিশওয়াত ও জুলুম যে ইসলামী বিধানে সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ, জনসাধারণের মধ্যে ইহা ব্যাপকভাবে প্রচার করা ছাড়াও তিনি স্বীয় মুরীদ ও ভক্তগণকে সুদী লেনদেন এবং অন্যায়ভাবে অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ ও এতীমের হক কুক্ষিগত করা হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিবার নির্দেশ দেন। ইহার ফলে শত শত ঋণগ্রস্ত খাতক শুধু সুদের অর্থ প্রদান হইতেই মুক্ত হন নাই; বরং অনেক ক্ষেত্রে আসল ঋণের টাকা ফেরৎ দেওয়া হইতে মার্জনা লাভ করে, বহু মর্টগেজ দেওয়া জমি খাতকগণ ফেরৎ পান। দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তিনি সাহায্য তহবিল গঠন করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের দুর্গত অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য ও অর্থ বিতরণ করিতেন। সরকারী ঋণ সালিসী বোর্ড গঠনের বহু পূর্বেই পীর কেবলা ঋণভারে বিপদগ্রস্ত গরীব জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির ফলপ্রসূ কার্যক্রম গ্রহণ করেন।"

"দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অবাধ শিক্ষার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে তিনি ছারছীনার আবাসিক মাদ্রাসায় বিনামূল্যে আহার বাসস্থানের জন্য লিল্লাহ্ বোর্ডিং স্থাপন করেন। প্রতি বৎসর কয়েক শত ছাত্র লিল্লাহ্ বোডিং-এ থাকিয়া উচ্চ ইসলামী শিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন এলাকার মাদ্রাসায় ও লিল্লাহ্ বোডিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে তাঁহার অক্লান্ত

প্রচেষ্টায় বাংলায় ইসলামী শিক্ষার নবজাগরণের যুগের সূচনা হয়। আমার জানা মতে উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে এমন কোনও আলিম বা পীর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যাঁহার একক প্রচেষ্টায় কোন অঞ্চলে এত বেশি সংখ্যক মকতব, মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে পীর কেবলার অবদান অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়।"

তৎকালে অবিভক্ত বাংলায় উচ্চ ইসলামী শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল সরকার পরিচালিত কলকাতা মাদ্রাসা । সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত মফস্বলের কোন মাদ্রাসায় কামিল কোর্স পড়াইবার অনুমতি ছিল না । ইহার ফলে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা ছাত্র উচ্চ ইসলামী শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। পীর সাহেবের আপ্রাণ চেষ্টায় ও শেরে বাংলার সহযোগিতায় সর্বপ্রথম ছারছীনা মাদ্রাসায় কামিল কোর্স অধ্যয়নের মঞ্জুরী দেওয়া হয়। কামিল কোর্সের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য হাদীছ, তাফসীর সহ বিভিন্ন বিষয়ে কেতাবাদি সংগ্রহের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল । বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য অভিজ্ঞ অধ্যাপকের প্রয়োজন ছিল । নতুন ছাত্রাবাস ও মাদ্রাসা ইমারতের প্রসারের জন্যও বহু অর্থের প্রয়োজন ছিল । আল্লাহ্‌র রহমতে অল্পকালের মধ্যেই সরকারের আরোপিত এই সকল শর্তাদি পূর্ণ করিতে তিনি সক্ষম হন। বর্তমানে ছারছীনা দারুস সুন্নাহ আলীয়া মাদ্রাসা প্রকৃতপক্ষে একটি আবাসিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এই মাদ্রাসা হইতে হাদীছ ও ফিক্‌হ বিষয়ে কামিল পরীক্ষা উত্তীর্ণ বহু ছাত্র জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হইয়া ইসলামের খেদমতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত আছেন। সমাজ হইতে শির্‌ক, বিদ'আত ও অনৈসলামিক রীতিনীতির মূলোচ্ছেদের জন্য তিনি "ইহয়াউস্ সুন্নাহ্" নামক সংগঠনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে যে কামিয়াবী ও বিপুল সফলতা অর্জন করেন সেই জন্য তাঁহাকে মুহইউসা–সুন্নাহ আখ্যায় আখ্যায়িত করা সমীচীন হইবে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সহজ–সরল অনাড়ম্বর জীবন–যাপন করিতেন । তাঁহার ব্যবহার ছিল অমায়িক।"

ছারছীনা মাদ্রাসা ও পীর সাহেব মাওলানা আবু জাফর সালেহ (র)

বৃটিশ বিরোধী মুসলমানদের মহাবিদ্রোহ, যা 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত, তা দুর্ভাগ্যবশত সফল হয়নি। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত এই মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার দায় চাপানো হয় মুসলমানদের উপর। বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সূচনার অপরাধে সারা ভারতে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন, ধর-পাকড় ও ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলানোর নিষ্ঠুরতা চলতে থাকে। রাজ্যহারা মুসলমানরা এর আগের এক শতক বৃটিশ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়েও নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে ছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহোত্তর সময়ে বৃটিশ শাসকদের নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠে। সিপাহী বিদ্রোহ উত্তর সেই দুর্যোগের পটভূমিতে এবং সিপাহী বিদ্রোহের দু' দশক পরে ছারছীনার পীর সাহেব নেছার উদ্দীনের জন্ম হয়। সুতরাং শৈশব থেকেই তিনি এমন এক বিরূপ আবহের মাঝে বেড়ে উঠেছেন, যা তাঁকে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির উজ্জীবনে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সিপাহী বিদ্রোহের আপাত ব্যর্থতার পর মুসলমানরা সম্মুখ ভাগ থেকে আক্রমণের কৌশল পরিত্যাগ করে। তারা আত্মগঠনে মনযোগী হয়। ছারছীনার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা এই সূত্রেই সম্পৃক্ত। বিশেষ করে, মুসলমানরা দীর্ঘ বিজাতীয় শাসনে কুরআনী শিক্ষা ও নবীর জিন্দেগী থেকে বিচ্যুত হয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন। এই অবস্থায়ই ছারছীনার পীর সাহেবের আবির্ভাব।

বরিশালে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে ছারছীনা পীর সাহেবের শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনকে অবশ্যই জেলার ইসলামী উজ্জীবনের প্রধান স্তম্ভ ধরতে হবে। প্রথম পীরে কামিল নেছার উদ্দীন (র)-এর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনী প্রতিষ্ঠানটি তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র 'পীর' হযরত মওলানা আবু

জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র)-এর সুযোগ্য পরিচালনায় সমৃদ্ধ ও বিকশিত হতে থাকে। ছারছীনা দরবারের সিলসিলায় প্রধানত দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যযোগ্য। এক. দীনী শিক্ষার বিস্তার এবং দুই. তাবলীগ বা শরীয়তের প্রচার ।

মওলানা আবু জাফর সালেহ ১৯১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন ত্রিশোর্ধ, তখন তিনি 'মুজাদ্দিদে জামান' পিতাকে হারান। এ কারণে তিনি তাঁর জীবনের এক মহামূল্যবান সময় যা মানব জীবনের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের সময় হিসেবে পরিগণিত , এ সময়টিই তিনি পিতার সান্নিধ্যে কাটান। ফলে দ্বীনী আন্দোলনে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জনে তাঁর অবারিত সুযোগ ছিল। মরহুম পিতার প্রতিষ্ঠিত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও খানকাকে অবলম্বন করে মওলানা আবু জাফর ব্যাপক দ্বীনী আন্দোলন গড়ে তোলেন । ফলে ছারছীনার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শুধু বৃহত্তর বরিশালেই নয়, সারা বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত হয়।

"মরহুম পীর সাহেব তাঁহার সংসারের সকল ছেলেমেয়েদিগকে শিশুকাল হইতেই সর্ব বিষয়ে সুন্নত তরীকার পাবন্দ করিয়া গড়িয়া তুলিতেন । লেবাস - পোশাক, চাল-চলন, আদব-আখলাক সকল দিকেই সন্তানগণ ছোটবেলো হইতেই কামিল হইয়া উঠিত । সুন্নাত তরীকা জিন্দা করার জন্য জীবন উৎসর্গকারী পীর সাহেব (র) দেশ ও সমাজের সর্বত্র যেমন সুন্নাত তরীকার জোয়ার বহাইয়া দিয়াছিলেন, তেমনই সন্তানদিগকে, জাহের বাতেনে সুন্নাত বরদার করিয়া তুলিয়াছিলেন। (পাক্ষিক তাবলীগ ঃ স্মৃতি সংখ্যা '৯১ ঃ শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির-এর প্রবন্ধ) ।

ছারছীনা মাদ্রাসায়-ই তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। এই মাদ্রাসায় দরজায়ে ফাযিল পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর তাঁর পিতা ফুরফুরার তদানীন্তন পীর সাহেবের এজাযত নিয়ে দেওবন্দ ও সাহারনপুর মাদ্রাসায় তাঁকে উচ্চতর লেখা-পড়ার জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করে বাংলাদেশে ফিরে আসেন । তিনি বাল্যকালেই ফুরফুরার পীর সাহেবের হাতে বায়'আত নিয়ে তাঁরই এজাযতে তাঁর পিতার নিকট তরীকতের তালিম ও

তালকীন লাভ করেন। এভাবে তিনি চার তরীকায় কামালাত লাভ করে তাঁর পিতার সংগে হিদায়াত-তাবলীগ ও তালীম-তালকীনের কাজে নিয়োজিত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই তালিম-তালকীনের খেদমত আনজাম দিয়ে গেছেন।

মওলানা আবু জাফর সালেহ (র) পিতার জীবিতকালে কিংবা তাঁর অবর্তমানে সবসময়ই পিতার নীতি আদর্শ কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন।

শিক্ষা বিস্তার

পীর সাহেব মওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র) সাধারণ্যে 'শাহ সাহেব' বলেই খ্যাত ছিলেন। শিশু বয়সে তিনি এই উপাধি পেয়েছিলেন, ফুরফুরার মরহুম পীর কেবলার নিকট থেকে ।

শিক্ষা বিস্তারে এই 'পীর' পরিবারের অবদান অসামান্য। মরহুম পিতা নেছার উদ্দীন (র) যেমন দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে গেছেন, তেমনি 'শাহ সাহেব'ও দেশের প্রায় সর্বত্র দ্বীনী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখেছেন।

ছারছীনা মাদ্রাসার ছাত্র এবং ছারছীনা পীর দরবারের মুরীদরা বৃহত্তর বরিশাল সহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য মাদ্রাসা গড়ে তুলেছেন। এ সব দ্বীনী প্রতিষ্ঠানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এক-একটি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচার কেন্দ্র। মাদ্রাসা হলেই সেখানে মসজিদ হয় । আর এভাবেই ঐ এলাকাটি ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠে । এভাবেই বৃহত্তর বরিশালের সর্বত্র ছারছীনাকে কেন্দ্র করে জালের মতো বিস্তৃত হয়েছে অসংখ্য জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসা । মূলত ছারছীনা দরবার বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামোকে টিকিয়ে রেখেছে। বিভিন্ন সময় মাদ্রাসা শিক্ষার উপর নানা রকম দুর্যোগ মোকাবিলায় ছারছীনার পীর সাহেবরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। বৃটিশ আমল, পাকিস্তানী আমল এবং সবশেষে বাংলাদেশ আমলেও

মাদ্রাসা শিক্ষাকে পঙ্গু করে দেবার নানা চক্রান্ত হয়েছে। ছারছীনার পীর কেবলাগণ এসব চক্রান্ত মোকাবিলায় অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করেছেন। প্রতিনিয়ত এই প্রতিরোধের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং ইসলামের চর্চা ও বিকাশ রাহুমুক্ত হয়েছে । শিক্ষা ও জ্ঞান প্রসারে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮০ সালে তাঁকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে গতিশীল করা ছাড়াও যাতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা হয় 'শাহ সাহেব' এক্ষেত্রে নিরলস প্রয়াস চালিয়েছেন। সর্বোচ্চ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে 'শাহ সাহেব' ছিলেন একজন নিরলস মুজাহিদ। প্রকৃতপক্ষে পীর সাহেব তাঁর জীবদ্দশায় ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার দিগন্তে ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং মুসলমানদের অভিভাবক।

সমাজ সংস্কার

'শাহ সাহেব' তাঁর মরহুম পিতার অনুসরণে সবসময়ই মুসলমানদের মধ্যকার বিভেদ ও অনৈক্যকে পরিহার করেছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। 'জমিয়তে হিযবুল্লাহ' 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' ও 'জমিয়াতুল মুদাররিসীন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কার ও মুসলমানদের সাংগঠনিক শক্তিকে সমন্বিত করে জাতির খিদমতে তা প্রয়োগ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। সুন্নাতে নববী (সা)-এর জিন্দেগী ও শিক্ষার আলোতে মুসলমানদের শিক্ষিত করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র মিশন। শিরক-বিদ'আতের কুফল থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার জন্য তিনি খলীফা ও মুরীদদের সবিশেষ তাকিদ দিতেন। বিদ'আতী ও বাতিল ফিরকাসমূহের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আজীবন সোচ্চার। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি হিদায়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব ত্যাগ করেননি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগের দিনটিতেও তিনি শরিয়তপুর জেলার এক গ্রামের মাহফিলে যোগদান করেন। ঐ মাহফিলের কাজ শেষ করে ক্যাম্পে ফেরার পরেই তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

ছারছীনার মরহুম পীর সাহেবের একটি বাসনা ছিল, মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিং-এ অন্তত দু' হাজার ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা থাকবে। 'শাহ সাহেব' পিতার শেষ ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য চার তলা বিশিষ্ট দালানের কাজ শুরু করে শেষ করে যেতে পারেননি। এই দায়িত্ব বর্তেছে বর্তমান গদ্দীনশীন পীর তাঁর পুত্র মওলানা শাহ মুহিবুল্লাহ'র উপর এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির উপর।

'মোহাম্মদ ছালেহ'-এটি শুধু একটি নাম নয়-এটি একটি প্রতিষ্ঠান, একটি ইতিহাস। বাংলার বুকে ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টিকারী মুজাদ্দিদে জামান, ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর প্রধানতম খলীফা, বালাকোট চেতনার অভিব্যক্তি হযরত নেছার উদ্দীন (র)-এর সুযোগ্য সন্তান হযরত মওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র)। তিনি তাঁর ব্যক্তি জীবনকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী গড়ে তুলে সমাজের মানুষকে আহ্বান জানালেন-রাসূলের সুন্নত আঁকড়ে ধরো, এর মাঝেই রয়েছে তোমাদের সফল্য, কি সার্থক আহবান!....যদি এ দেশের গত ১০০ বছরের ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়, তবে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে, শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে হযরত মওলানা নেছার উদ্দীন (র) হেদায়েতের যে চারা গাছগুলো রোপণ করেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হযরত আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র)-এর পবিত্র হাতে সেগুলো শুধু সযত্নে রক্ষিতই হয়নি; তাঁর সার্থক তত্ত্বাবধানে সেগুলো আজ পুষ্ট বিকশিত করে সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে মহা সমারোহে দাঁড়িয়ে আছে। লাখো লাখো মানুষ প্রতিনিয়তই পরম আগ্রহে দু'হাত ভরে আহরণ করছে অমৃত ফল, বাগে নেছারের ফুলের গন্ধে সারা দেশ আজ আমোদিত। (পাক্ষিক তাবলীগ ঃ স্মৃতি সংখ্যা, ১৯৯১ ঃ ডঃ আন্ওয়ারুল হক)।

ছারছীনা দরবার থেকে কেবল মুরীদদের বায়'আত গ্রহণ ও তালিম দানই করা হতো না; বরং মুসলমানদের দীনী শিক্ষার স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণকেও পীর সাহেব গুরুত্ব দিয়েছেন। একই সাথে মুসলমানদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধে ছারছীনা দরবার থেকে কার্যকর

সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এখানেই ছারছীনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। অনেকে তা চিহ্নিত করে থাকেন। গোটা জেলার ইসলাম প্রচার এই মাদ্রাসা ও খানকাহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

প্রতি বছর মরহুম পীর সাহেবের আমল থেকেই ছারছীনায় দুটো ইছালে ছওয়াব মাহফিল হয়ে আসছে। প্রধানত পীরের মুরীদ ও সাধারণভাবে আশেকানে রসূল (সা) সকল মুসলমানদেরই অবারিত দাওয়াত থাকে এই কল্যাণময় মাহফিলে অংশগ্রহণ করার। ফলে প্রতি বছরই মাহফিল উপলক্ষে লাখ লাখ মুসলমানের সমাগম ঘটে ছারছীনায়। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁদের অন্তর থাকে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যে অবনত, রসূল (সা)-এর প্রতি শ্রদ্ধায় সংবেদনশীল এবং পীরের হিদায়াত প্রাপ্তির জন্য উন্মুখ। একই পোশাক, একই বিশ্বাস ও অনুভূতি নিয়ে সমাগত লাখো মুসলমানের এই সমাবেশ থেকে প্রতি বছর ইসলাম প্রচারের সবক এবং আত্মশুদ্ধির দিক-নর্দেশনা নিয়ে মুরীদরা ফিরে যান আপন এলাকায়।

এ ছাড়া সারা দেশে প্রতি বছর ছারছীনার খলীফা ও মুরীদবৃন্দ অসংখ্য ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করেন। উভয় পীর সাহেবই এসব মাহফিলে সময়-সুযোগ পেলে দ্বীনী বয়ান করতেন। এভাবে ছারছীনাকে কেন্দ্র করে প্রাথমিকভাবে বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর, পটুয়াখালী এবং সাধারণভাবে সারা দেশে ইসলাম প্রচারের একটি সংগঠিত আন্দোলন গড়ে উঠে, যা আজও সমান গতিতে এগিয়ে চলছে।

খৃস্টান মিশনারীদের তৎপরতার মুকাবিলা

বরিশালে ইংরেজ শাসকদের মদদপুষ্ট মিশনারী তৎপরতা ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে সরাসরি বাধাগ্রস্ত করে তুলে। এ দেশে খৃষ্টান জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগই ধর্মান্তরিত নীচু শ্রেণীর হিন্দুদের থেকে উৎসারিত। হিন্দু ধর্মের শ্রেণী বিভক্তি ও নানা রকম সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার বাঁধন কষণ থেকে মুক্তিকামী নীচু শ্রেণীর হিন্দুরা যখন শাসক বৃটিশের আনুকূল্য পাবার আশ্বাস পেল, তখনই তারা মিশনারীদের প্রভাবে খৃষ্টান হতে থাকে। বরিশালে বাকেরগঞ্জ থানার

পাদ্রী শিবপুর ও গৌরনদীতে মিশনারীদের প্রচারের ফলে বেশ কিছু খৃষ্টান পল্লী গড়ে উঠেছে। এখনও তা টিকে আছে। এ ছাড়া বরিশাল শহরে বেশ কয়েকটি চার্চও গড়ে উঠেছে। হিন্দুরা ধর্মীয়ভাবে খৃস্ট ধর্ম প্রচারকে রুখতে চাইলেও সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। তাদের ভাবটা এ রকম ছিল, খৃষ্টানদের সংখ্যা বাড়ে বাড়ুক, মুসলমানদের সংখ্যা যেন না বাড়ে। অর্থাৎ কোন হিন্দু যেন ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান না হয়, সেদিকে হিন্দু সমাজপতিরা সতর্ক ছিলেন। মুসলমানদের সংস্পর্শ থেকে সাধারণ হিন্দুরা যাতে লক্ষ যোজন দূরে থাকে, হিন্দু ধর্মীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা সেজন্য গরুকে দেবতার আসনে বসান এবং গো-বিষ্ঠা দিয়ে পবিত্র হওয়ার রেওয়াজ চালু করেন। এ দেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠায় হিন্দু সমাজপতিদের ঐতিহাসিক সাহায্য-সহযোগিতা সবারই জানা। এ কারণেই সরকারী ছত্রছায়ায় যখন খৃষ্ট ধর্মের পাদ্রী মিশনারীরা স্থানীয়দের মধ্যে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া চালাতে থাকে, তখন বৃটিশের আশ্রিত ঐসব সমাজপতি তেমন কোন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি। প্রতিরোধ যা হয়েছে, তা হিন্দু ধর্মীয় গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণদের তরফ থেকে এবং তা ছিল অন্তর্মুখী, সামাজিক পর্যায়েই তা সীমাবদ্ধ ছিল। এ নিয়ে পাদ্রী বা ইংরেজ শাসকদের সাথে হিন্দুদের কোন রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাঁধেনি। খৃষ্টান পাদ্রীরা যখন স্থানীয় জনগণকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে, তখনও হিন্দু সমাজপতিরা ইংরেজ শাসকদের সংশ্রব ত্যাগ করেনি; বরং তারা 'রাজার ধর্মের' প্রচার ও প্রসারে মনে মনে সন্তুষ্টই ছিল।

খৃষ্টান পাদ্রীদের মিশনারী প্রচারণায় সাধারণভাবে মুসলমানরা কখনও বিভ্রান্ত হয়নি। অথবা কোথাও বিপুল সংখ্যক মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে এমন প্রমাণ নেই। ইংরেজ শাসনের দু'শ বছরে তেমন কোন অধঃপতন মুসলমানদের হয়নি। ইসলাম মুসলমানদেরকে এ ধরনের বড় রকমের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোর দারিদ্র্যের কারণে বিচ্ছিন্নভাবে দু'চারজন স্বল্প শিক্ষিত মুসলমান প্রচারণা ও বৈষয়িক স্বার্থের প্রলোভনে আপন ধর্ম ত্যাগ করলেও সেটা ছিল সাময়িক

বিভ্রান্তি। কোথাও কোন মুসলমান ইংরেজদের খৃষ্ট ধর্মকে ইতিবাচক আবেগ নিয়ে গ্রহণ করেনি। এর কারণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। ধর্মীয় কারণ হচ্ছে এই যে, ইসলাম খৃষ্টবাদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করে এসেছে, শুরু থেকেই। ফলে খৃষ্টান মিশনারীদের নতুন প্রচারণা মুসলমানদের দুনিয়ার কোথাও বিভ্রান্ত করেনি। রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের মুসলমানরা কখনও ইংরেজ শাসনকে মেনে নেয়নি; বরং শুরুতে সর্বাত্মক প্রতিরোধ এবং পরে ইংরেজদের সংস্কৃতি শিক্ষাকে বয়কট করে এসেছে। তবে মিশনারীরা তাদের স্বজাতীয় শাসকদের মদদ নিয়ে তাদের এ দেশীয় সহযোগী হিন্দুদের সহযোগিতায় যে ইন্দো-ইংরেজ কালচার চালু করে, সেটি ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি হুমকি। এ কারণেই মুসলমান সমাজের ধর্মীয় আলিম উলামাদেরকে সবসময় মিশনারীদের বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাতে হয়েছে। খৃষ্টবাদ গ্রহণ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে মুসলমানরা লাঞ্ছিত হবে, এবং নবী (সা)-এর শাফায়াত পাবে না, আলিমগণ ওয়াজ মাহফিল করে এবং পুস্তক-পুস্তিকা লিখে এটা প্রতিনিয়ত প্রচার করেছেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা ইংরেজদের পদানত হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই তারা বরিশাল অঞ্চলের উপর বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। এদেরকে অনুসরণ করে খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য গীর্জা মিশনারী প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। বরিশালেও তারা গীর্জা মিশনারী প্রতিষ্ঠা করে। ছারছীনা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর জেলার ইসলামী ও দ্বীনী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে এই মাদ্রাসা ও খানকাই হয়ে উঠে জেলার ইসলামী রেনেসাঁর প্রাণকেন্দ্র ও মুসলমানদের আশা-ভরসার স্থল। ছারছীনার পীর সাহেবরা আগাগোড়াই জেলার মুসলমানদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন।

খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা এবং হিন্দুদের সামাজিক বৈরিতার মুখে ছারছীনার কাজকর্ম এগিয়েছে নিজস্ব গতিতে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড,

মেলা, গান-বাজনা, যাত্রা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে বিজাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তাদের আবদ্ধ করার একটি কৌশল গ্রহণ করা হয়। শিথিল ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা এসব কর্মকান্ডের বাহ্যিক চাকচিক্যে প্রলুব্ধ হয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকে। মুসলমান যুবক-তরুণ-কিশোররা কৌতূহলী দর্শক হিসেবে হিন্দুদের পূজা-পার্বণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাতে যোগ দেয়, সে জন্য হিন্দুরা নানা রকম কৌশল অবলম্বন করতো। হিন্দুদের দুর্গা পূজার সময় দেখা যেত, মুসলমান ছেলেদের একাংশ তাতে মেতে উঠছে। বিভিন্ন রকম মেলার মধ্য দিয়ে পৌত্তলিকতা ও ইসলাম বিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করা হতো। এসব মেলায় ঘোড়দৌড় ও জুয়া খেলা হতো। এসব ফাঁদে মুসলমান ছেলেরা সহজেই পড়ে যেত। নাটক যাত্রার মধ্য দিয়ে অশ্লীলতা প্রচারের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধকে ধ্বংস করা হতো। তাছাড়া হিন্দু জমিদার সমাজপতিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যেসব যাত্রা বা নাটক মঞ্চস্থ হতো, তার বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাসের বিকৃতির উপর ভিত্তিশীল এবং মুসলিম বিদ্বেষে পূর্ণ। বস্তুত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বলতে যা বোঝাত, তার নিয়ন্ত্রক ও রূপকার ছিল হিন্দুরাই। এসব বিজাতীয় সাংস্কৃতিক কুহক থেকে সাধারণ মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্য ছারছীনার কার্যকর ভূমিকা ছিল।

হিন্দুদের অনেক কুপ্রথা, যা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম ও অবৈধ;-মানত করা, নানা প্রকার শরীয়ত বহির্ভূত কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়া বহু মুসলমানের নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল। ছারছীনার পীর সাহেবরা এসব গায়ের ইসলামী কাজকর্ম থেকে মুসলমানদের মুক্ত করার প্রয়াস পান। ছারছীনা দরবার সকল প্রকার ইসলাম বহির্ভূত, বিজাতীয়-বিদ'আতী আচরণ থেকে জেলার মুসলমানদের মুক্ত করে বিশুদ্ধ ইসলামী আচরণে নিষ্ঠাবান করে গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর চেষ্টা-সাধনা চালিয়েছেন। যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং-এর বিস্তৃতি

ছারছীনা দারুস্ সুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিংটি প্রতিষ্ঠা করেন মরহুম পীর সাহেব নেছার উদ্দীন (র)। আর এই মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং-এর

সম্প্রসারণ ঘটে পীর সাহেব (র)-এর হাতে। প্রতিষ্ঠাকালে মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ছিল দু'শ, এখন ছাত্রসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। মাদ্রাসার সম্প্রসারণ সহ প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে দু' হাজার ছাত্রের উপযোগী একটি ছাত্রাবাসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে, যার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে আট কোটি টাকা। দেশে যাতে ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে এবং অধিক সংখ্যক আলিম তৈরি হতে পারেন, পীর সাহেব আজীবন সেই সাধনাই করেছেন। কেননা আলিম ছাড়া ইসলাম শিক্ষা ও প্রচার হতে পারে না। ছারছীনা থেকে ইসলামী শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে শত শত আলিম ছড়িয়ে পড়েছেন জেলার সর্বত্র। এঁরা বহুসংখ্যকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালীতে যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা একান্তভাবেই ছারছীনার অবদান। এক-একটি মাদ্রাসা ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। ছারছীনাকে কেন্দ্র করে সারা জেলায় জালের মত বিস্তৃত যেসব মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে, তার সাথে সম্পৃক্ত আলিমবৃন্দ ছারছীনার সাথে আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছেন। বরং বলা যায়, অন্য মাদ্রাসাগুলো ছারছীনার কেন্দ্রীয় মাদ্রাসারই শাখা-প্রশাখা হিসেবে কাজ করছে।

শিক্ষা প্রচার, অধ্যাত্মবাদের তাবলীগ এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ছারছীনার অবদান শুধু জেলা পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নেই। এই অবদান জাতীয় পর্যায়েও বিকশিত হয়েছে। পীর সাহেব আবু সালেহ (র) পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সারা জীবন তাবলীগের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে শরীয়তের তালীমের পাশাপাশি তাসাউফ তথা আত্মশুদ্ধির তালীম দিতেন। তাঁরই নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় দেশে আজ হাজার হাজার খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে সারা জেলায় অগণিত ইসলাম সেবক-আলিম তৈরি হয়েছেন।

মরহুম পীরের আমল থেকেই ছারছীনায় বছরে দুটি ইছালে ছওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। শুরুতে লোকসংখ্যা কম হলেও এখন প্রতি বছর লাখ লাখ মুরীদান, ভক্ত, আশেকানে রসূল (সা)-এর সমাগম ঘটে ছারছীনায়। এখান থেকে সত্যিকার দীনের হিদায়াত নিয়ে মুরীদান মুজাহিদরা ছড়িয়ে

পড়েন দেশের সর্বত্র। নিয়মিত ইছালে ছওয়াব মাহফিলে হাজির হবার কারণে মুরীদাবৃন্দ সরাসরি পীরের তালীম গ্রহণ করে উপকৃত হন এবং ভবিষ্যতের কর্মসূচী নিয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যান, দ্বীনী তালীম দানের কাজ চালিয়ে যান। এভাবে ইসলাম প্রচারের একটি নিয়মিত সিলসিলা চালু হয়েছে।

মরহুম পীর সাহেবের ইন্তিকাল দিবস উপলক্ষে মুরীদানের প্রতি নির্দেশ রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে মাহফিলের আয়োজন করার। সে অনুযায়ী প্রতি বছর মুরীদ খলীফাদের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলাম গতিশীল জীবন-ব্যবস্থা। ইসলাম পোপবাদ বা পুরোহিততন্ত্রের মতো কোন ধর্ম নয়। কিছু নির্দিষ্ট ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে ইসলামের নির্দেশনা শেষ হয়ে যায় না। ইসলাম ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত একটি একক সমন্বিত ব্যবস্থাপত্রের অনুসরণের কথা বলে। মুসলমানদের সংগঠিত হয়ে দৃঢ় জামাতবদ্ধ থাকার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। কেননা, তৌহিদী শক্তি সমাজের বিপরীতে যে তাগূতী শক্তি– ইবলিসী কুমন্ত্রণা নিয়ে ইসলামকে নির্মূল করার প্রচেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত থাকে, তার বিরুদ্ধে মুসলমানরা অসংগঠিত ও নিষ্ক্রিয় থাকলে মুসলমানদের শক্তির ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাবে।

এ প্রেক্ষিতে ইসলামের ব্যাপক প্রসার এবং শিরক বিদ'আত, কুসংস্কার, ইসলাম বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিহত করা-ইসলামের বিরুদ্ধে যে কোন হামলা মুকাবিলার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। হযরত আবু জাফর সালেহ (র) 'বাংলাদেশ জমিয়তে হেযবুল্লাহ' নামক একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তিনি এর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামের নীতিমালার আলোকে সমাজ সংস্কার। 'তাবলীগ' নামের ছারছীনা থেকে একটি পাক্ষিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পত্রিকাটি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক সমস্যার ইসলামী সমাধান, শিরক বিদ'আতের মূলোৎপাটন ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল প্রচারে 'তাবলীগ'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ছারছীনা খানকার একটি নিজস্ব মুদ্রণ ও প্রকাশনা

কেন্দ্রও রয়েছে। এ প্রকাশনা থেকে ইসলামের উপর বহুসংখ্যক বই-পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে।

পীর সাহেব সরাসরি রাজনীতি না করলেও ইসলাম ও মুসলমানের অস্তিত্বের স্বার্থে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছেন মুসলমানের দুর্দিনে। ১৯৪৭-পূর্ব আজাদী আন্দোলন একদিকে ছিল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন, অন্যদিকে ছিল একটি তামুদুনিক আন্দোলন আর এর ভিত্তি ছিল ইসলাম। এ কারণে পীর মাশায়েখ-ধর্মীয় আলিম ও খানকার উলামারা এ আন্দোলনকে শুধু পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে মাদ্রাসা খানকাগুলোর অবদান ছিল বিপুল। পীর মাশায়েখরা দু'শ বছর পর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক ধারায় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে লুফে নেয়। সত্যি কথা বলতে কি, আলিম সমাজের ছত্রছায়াই মুসলিম লীগ জনগণের মাঝে তাদের ভিত্তি সম্প্রসারণ করে নিয়েছিল।

এ দেশের আলিম সমাজ ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থে যতটুকু রাজনীতি চর্চা করাকে জরুরী মনে করেছেন, ততটুকু রাজনীতি করেছেন। সিলেট রেফারেন্ডাম, ছারছীনার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উলামা সম্মেলন, ১৯৫১ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে করাচীতে অনুষ্ঠিত উলামা কনফারেন্স -এর সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন পীর সাহেব। এতে একদিকে যেমন উম্মাহ্‌র স্বার্থে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও মমত্ববোধের প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শিক্ষাদানের বাইরেও যে আলিমদের আরও কিছু করার আছে, তার স্বাক্ষর মিলে। তবে সমাজকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই ছিল পীর সাহেবের প্রধান কাজ। এই সাথে মুরীদদের শরিয়তী তালীম দিয়ে তাদের বিশুদ্ধ ইসলামী জীবন গঠনের পাথেয় সংগ্রহ করে দেওয়াই ছিল তাঁর মূল কাজ। এ কারণেই তিনি প্রচলিত দলীয় রাজনীতি চর্চা থেকে সবসময়ই বিরত ছিলেন। জাতিকে সংশোধন করার লক্ষ্যে তিনি সীমিত পর্যায়ে হিদায়েতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

বরিশালের জনমানসে ইসলামের সংগ্রামী চেতনা

বরিশালের অধিকাংশ জনপদ একদিকে ছিল নদী ও সমুদ্র থেকে উত্থিত নতুন পলি গঠিত নিচু ভূমি। অন্যদিকে এ জেলার অধিকাংশ এলাকায় আবাস গড়ে উঠেছে সুন্দরবন কিংবা গহীন বন-জংগল পরিষ্কার করে। যারা নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে, কিংবা সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বরিশালের জনবিরল এবং নতুন জেগে উঠা ভূমিতে জীবনের ঠিকানা স্থায়ী করতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। একদিকে জীবন-জীবিকার অফুরন্ত উপাদান এবং সহজলভ্যতা এবং অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তারা নিজেদেরকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নাগালের বাইরে থেকে নিশ্চিন্তে জনবসতি গড়ে তুলেছেন। এ কারণে স্থানীয় পর্যায়ে বরিশালে ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণের আবশ্যকতা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে গোটা বাংলাদেশে ইসলামের উদার ও শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেভাবে দলে দলে অমুসলমান ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে, বরিশালেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সিলেটের হযরত শাহ্ জালাল (র) কিংবা বাগেরহাটের হযরত খান জাহান আলী (র)-এর মতো খ্যাতনামা কোন ইসলাম প্রচারকের আবির্ভাব বরিশালে ঘটেছিল কি না, তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রথমত এসব বুযর্গ যাঁরা বরিশালে তৌহীদের আবাদ করেছেন, তাঁরা নিজেরা ছিলেন প্রচার বিমুখ, আল্লাহ্র রাহে তাঁরা দ্বীন প্রচার করেছেন। ফলে তাঁরা নিজেরা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন ভাবেননি। দ্বিতীয়ত যেসব প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মসজিদ, মাযার কিংবা দ্বীনী শিক্ষার কেন্দ্র এ ব্যাপারে আমাদেরকে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্য দিতে পারে, তা নদী সাগরের তীব্র স্রোতের তোড়ে ভাঙাগড়ার এই জেলায় এখন অস্তিত্বহীন। প্রতি এক শ'

বছরে এক-একটি জনপদ দু'একবার নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ফলে মানুষের অক্ষয় প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তিরাজির নিদর্শন আমাদের চোখে বড় একটা পড়ে না। এই সীমাবদ্ধতার কারণে বরিশালে ইসলাম প্রচারের আদি সূত্র উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। উপরন্তু এই সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আমার জ্ঞাতমতে তেমন কোন সুসংবদ্ধ গবেষণা কর্মের প্রস্তুনা হয়নি।

পৃথিবীতে ইসলামের আনুষ্ঠানিক নব পর্যায়ে আগমনের বয়স প্রায় দেড় হাজার বছর। তবে তৌহীদের সাথে মানবজাতির পরিচয় মানবজাতির আগমনের মতোই আদি ও সুপ্রাচীন। দুনিয়ায় মানুষকে পাঠিয়ে আল্লাহ্ তাঁর সাথে নবুয়ত ও খিলাফতী দিয়ে দিয়েছেন। এমন কোন জাতি বা জনপদ নেই, যেখানে আল্লাহ্ নবী পাঠাননি। সুতরাং মানুষ যতই শির্‌ক ও জাহিলিয়াতের অন্ধকারে ডুবে যাক, তার মনে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তৌহীদের কিছুমাত্র আলো যে সুপ্ত ছিল, এটা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও এটা সুস্পষ্ট হয় যে, তার আচরণে শির্‌ক প্রকাশ পেলেও তার চরিত্র-ধর্ম তৌহীদমুখী। এ কারণেই ইসলামের দাওয়াত প্রাপ্তির সাথে সাথেই অনেকে দাওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবীর আগমনের প্রাক্কালে যেসব এলাকায় মানব বসতি ছিল, ঐ সব এলাকায় যখনই তৌহিদের বাণী পৌঁছেছে, তখনই তারা অনেকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে, স্বতস্ফূর্তভাবে নীরবে-নিভৃতে। দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থেই শেষ নবীর আগমনের কথা বলা হয়েছে। অনেকে এ সত্য জেনেও অস্বীকার করেছেন।

বাংলা-পাক-ভারতীয় উপমহাদেশ অনেকগুলো প্রাচীন ধর্মের উৎস। সে কারণে এ উপমহাদেশের জনগণ সাধারণভাবে ধর্মানুসারী; তবে এ উপমহাদেশের মিলন কেন্দ্রে আরব, পারসী, তুরানী, গ্রীক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের জনসমাগম ঘটেছে। এরা ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। এরা সাথে করে নিয়ে এসেছে ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। উপমহাদেশীয় সংস্কৃতিতে যে বৈচিত্র্য দৃশ্যমান, এটা তার অন্যতম কারণ।

গুপ্ত, সেন, সুলতানী আমল কিংবা মোঘল আমলে 'বাংলা মুলুক' ছিল অনেকটা পোষ-না-মানা চিরস্বাধীন দুর্গম অঞ্চল। এ কারণেই রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শিকার হয়ে অনেকে এই 'বাংলা মুলুকে' এসে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে থাকেন। এই জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল মুসলমান। এরা বর্ণে, ভাষায় ছিলেন বিচিত্র। কালক্রমে এরা মাটি ও মানুষের সাথে একাকার হয়ে এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যায়। বরিশালসহ গোটা বাংলাদেশেই এসব মুসলমান তাদের আবাস বিস্তৃত করেছেন। নতুন জনপদ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছেন।

আরব মুসলমানদের সিন্ধু বিজয় কিংবা তুর্কী বীর ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয় ইসলাম প্রচারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেও এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের ঘটনা ঘটেছে মহানবী (সা)-এর আমল থেকেই। অন্য অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বরিশালে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে ধর্মান্তরের চেয়ে অভিবাসন প্রক্রিয়াই বহুলাংশে দায়ী।

ইতিহাসে এ প্রমাণ পাই যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহীদের মহাসংগ্রামের আগেই বরিশালের জনগণ ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরেছেন। কিন্তু তারও আগে পলাশীর বিপর্যয়ের পর একদল পলাশী সৈনিক বরিশালে এসে আশ্রয় নিয়ে আজাদী পুনরুদ্ধারের জন্য সংগঠিত হন এবং স্থানীয় জমিদারের আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলেন। বরিশালের প্রত্যন্ত এলাকায় পলাশী সৈনিকদের এসে আশ্রয় গ্রহণ, এটাই প্রমাণ করে যে, নবাবী শাসনের গোড়া থেকেই বরিশাল এলাকায় তাদের বংশধর কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষীরা শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে বসবাস করতেন। অর্থাৎ মুসলিম শাসনের সূচনা পর্ব থেকেই বরিশাল এলাকায় তাদের আমীর-ওমরাহ, আত্মীয়-স্বজন অধস্তনরা বসতি গড়ে তুলেন।

পলাশীর বিপর্যয়ের পর প্রধানত এদের নেতৃত্বেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠে। তবে শক্ত কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে এসব

প্রতিরোধ আন্দোলন কামিয়াব হয়নি। আর একটি তিক্ত সত্য হচ্ছে এই যে, স্থানীয় বর্ণ হিন্দুরা রাতারাতি মুসলমান শাসকদের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নতুন শাসক বহিরাগত ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে এবং ইংরেজ শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা-সাধনা করে। হিন্দুরা এতে তাদের অর্থনৈতিক ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থ দেখতে পায়। তাদের ধারণা ছিল, ইংরেজদের উদার অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত আনুকূল্য নিয়ে যে জাতিসত্তা তারা গড়ে তুলবে, গোটা ভারত কালক্রমে তাদের হাতেই ন্যস্ত হবে। এ স্বপ্ন তাদের পুরোপুরি সফল না হলেও আংশিক সফল হয়েছে।

ইংরেজ শাসনের দু'শ বছর উপমহাদেশের বিস্তৃত জনপদে যে প্রতিরোধ আন্দোলন বা আজাদী পুনরুদ্ধারের মহাসংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে, তাতে বরিশালের জনগণের একটি বিরাট অংশগ্রহণ ছিল। বালাকোটের মহান জিহাদেও যেখানে বরিশালের মুজাহিদদের রক্ত ঝরেছে, সেখানে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বরিশালের জনগণের প্রাণ-স্পন্দন উপমহাদেশীয় ইসলামী পুনর্জাগরণের মূলধারার সাথেই সমন্বিত ছিল। বরিশালের কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহের সাফল্যের উন্মুখ প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতি প্রভৃতি ছিল ইসলামী পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত। এসব আন্দোলনের মূল সংগঠক ও অংশগ্রহণকারী ছিলেন মুসলমানরাই।

বরিশালে হিন্দুদের নেতৃত্বে শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নব জাগরণের সূত্রপাত ঘটে উনিশ শতকে। তার বহু আগে মুসলমানরা আজাদী পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে লাগাতার আন্দোলন করে। তবে মুসলমানদের এ আন্দোলন প্রথম পর্বে ব্যর্থ হবার পর তাদের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে চলতি হাওয়ার সাথে সন্ধি করা ছিল কঠিন। একইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন কিংবা ভূমি-ব্যবস্থাও ছিল মুসলমানদের আয়ত্ত বহির্ভূত। এই দুস্তর পশ্চাৎপদতা নিয়েই মুসলমানরা ভীরু পায়ে ইংরেজী শিক্ষার সাথে সন্ধি করেন। এই পর্বের পথিকৃৎ পুরুষ স্যার সৈয়দ আহমদ এবং নবাব আবদুল লতিফ। বরিশালের মুসলমানগণ কোম্পানী আমলের পরও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন। হিন্দুরা এই সুযোগটিকে পুরোপুরি

আত্মসাৎ করে। আঠারো শতকের শেষভাগে ইংরেজ কোম্পানী ও খৃষ্টান মিশনারীরা উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করে। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে অফিস–আদালতের ভাষা ছিল ফারসী।

১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৪ সালে চার্লস উড ভারতে শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এতে বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা ছিল। খৃষ্টান মিশনারী উইলিয়াম কেরীর প্রচেষ্টায় দিনাজপুর, যশোর ও বরিশালে কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সূচনায়ই ইংরেজানুগত হিন্দুরা প্রাপ্ত সুযোগ লুফে নেয়।

উল্লেখ্য, সিপাহী বিদ্রোহের সময়কাল পর্যন্ত এক শ' বছরে উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার মেরুদন্ড অবহেলা–প্রতিকূলতায় একেবারেই ভেঙে পড়ে। মুসলিম আমলে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক এবং শিক্ষাপ্রচার ছিল মুসলমানদের কাছে পবিত্র ইবাদতের শামিল। আর সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষায় ছিল সার্বজনীন অধিকার। মক্তব, মাদ্রাসা, খানকাহ ও মসজিদ ভিত্তিক এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হতো মুসলিম শাসনামলে প্রাপ্ত লাখেরাজ সম্পত্তির আয় থেকে। মুসলমানরা রাজ্য হারাবার সাথে সাথে ঐসব লাখেরাজ সম্পত্তিও তাদের থেকে কেড়ে নেয়া হয়। পলাশীর বিপর্যয়ের পর ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে মুসলমানরা এককভাবে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়েছেন, তার জনশক্তি ও অনুপ্রেরণা এসেছে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই। এসব মাদ্রাসা খানকা'র আলিম ছাত্ররাই জিহাদে অংশ নিয়েছেন। ফলে ইংরেজ শাসকদের প্রতিহিংসা এসব ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা কাঠামো ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েই

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের 'আই ওয়াশের' ব্যবস্থা করা হয়। ঐতিহ্যবাহী প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি নষ্ট করাই ছিল ইংরেজদের লক্ষ্য। তারা জানত, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই মুসলমানরা ইংরেজ বিরোধী জিহাদের শিক্ষা পায়। এ কারণেই ইসলামী শিক্ষা কাঠামো ধ্বংস করার জন্য ইংরেজ শাসকরা নয়া শিক্ষা কাঠামো প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

মুসলমানরা ইংরেজ শাসনের সুদীর্ঘ এক শ' বছর সর্বাত্মকভাবে ইংরেজী শিক্ষা বয়কট করে। এতে মুসলমানরা বৈষয়িক দিক থেকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অনেকে এই অসহযোগিতাকে ধর্মীয় কুসংস্কার বলে মন্তব্য করেছেন। প্রকারান্তরে এরা এই পশ্চাৎপদতার জন্য মুসলমানদের ইসলামী চেতনাকেই অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু এক শ' বছর পর যারা ইংরেজী শিক্ষার সাথে হাত মিলিয়েছে, তারা না হয়েছে আধুনিক ইউরোপীয় মানস সন্তান, আর না হয়েছে ইসলামী রেনেসাঁর সৈনিক। তারা এক মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার। পরবর্তীকালে এদের হাতে পাকিস্তান শাসনের নেতৃত্ব এলেও তারা জনগণের মুক্তিকে সফল করতে পারে নি।

ইউরোপে যে রেনেসাঁ হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য ছিল সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে। আর ইংরেজ শাসকরা এ উপমহাদেশে তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নতুন একদল অনুগত সামন্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়। দুর্ভাগ্যবশত এদের শতকরা ৯৯ ভাগই ছিলেন অমুসলিম হিন্দু ভাগ্যান্বেষী শ্রেণী। চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইংরেজরা নতুন জমিদার ও সামন্ত প্রভু সৃষ্টি করে। এরা ছিল প্রজাশোষক ও নিপীড়ক। ইংরেজ শাসক মহলের আশীর্বাদপুষ্ট জমিদার, সামন্ত, আমলা, ফড়িয়া, মুৎসুদ্দী শ্রেণী তাদের সীমাবদ্ধতার কারণে কখনও স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে দু'চার বংশধারা পার করে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। এ উপমহাদেশের প্রধান প্রধান হিন্দু পরিবারের কেউই সিপাহী অভ্যুত্থানকে সমর্থন দেননি। এমন কি নীল বিদ্রোহকেও তারা কঠোরভাবে নির্মূলের পক্ষে ছিলেন। শুধু তাই নয়, সিপাহীদের ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কৃত হতে

চেয়েছেন অগ্রগণ্য হিন্দু পরিবারগুলো। এঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজা রাম মোহন রায়, ঠাকুর পরিবারের প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ।

সাধারণভাবে উনিশ শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফ ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের জাগরণের নেতৃত্ব দেন।

উনিশ শতকের মধ্য পর্বে বরিশালে ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে ইংরেজী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তদের মাঝে নবজাগরণের সূচনা হয়। ব্রাহ্ম সমাজের দর্শন বৈদিক হিন্দুদের বেদ–উপনিষদীয় দর্শন থেকে আলাদা। ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় ইসলামের ধর্ম ও দর্শন দ্বারা প্রভূতভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই হিন্দু শিক্ষিতা মহিলারা শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। খ্যাতনামা শিক্ষানুরাগী ও রাজনীতিক অশ্বিনী কুমার দত্ত ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হন। ১৮৬৮ সালে বরিশালে নারী শিক্ষার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

এ কথা রূঢ় হলেও সত্য যে, ইংরেজী শিক্ষার স্থানীয় পথিকৃৎ ছিলেন প্রাগ্রসর হিন্দু সমাজ। হিন্দুদের আর্থিক অনুদান, উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠা এসব বিদ্যালয়ে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার ছিল সীমিত। মুসলমান ছাত্রদের প্রতি নানারূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। পাঠদানে, আচরণে অধিকাংশ হিন্দু শিক্ষকই তাদের ক্ষুদ্র সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতেন। এই পরিস্থিতি ছিল মুসলমানদের জন্য দুঃখজনক ও দুঃসহ। এমনি মুসলমানরা ছিলেন ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনীহ এবং শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে তারা ছিলেন অক্ষম। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজ হিতৈষীরা স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। বি. এম. স্কুলের পাশাপাশি চরামদ্দির জমিদার ইসমাঈল তাঁর পিতার নামে বরিশালে আছমত আলী খান ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার অভাব বহুলাংশে দূর করেন। একইভাবে তাঁদেরই উদ্যোগে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য হালিমা খাতুন গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আলেকান্দার নুরিয়া হাই স্কুলটি শুরুতে ছিল মাদ্রাসা।

বরিশাল শহরের বেলতলার মাহমুদিয়া মাদ্রাসা এবং নথুল্লাবাদ সিনিয়র মাদ্রাসা ইসলামী শিক্ষার অভাব বহুলাংশে দূর করছে। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের মুসলমানরা আত্মগঠন ও সংস্কার আন্দোলনের চেয়ে ইংরেজ ও তাদের পোষ্য জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সময়ে বরিশালের মুসলমানদের উপর ফরাজী আন্দোলনের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। ধর্মীয় নেতারা তখনও মনে করতেন যে, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পথে নয়, প্রতিরোধের পথেই বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো যাবে এবং এভাবেই মুসলমানরা তাদের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে। উনিশ শতক পর্যন্ত স্থানীয় মুসলমান জমিদার, অগ্রসর সমাজপতিরা মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে জাগরণের কোন উদ্যোগ নেননি। তবে চরামদ্দির জমিদার ইসমাইল খান, শের-এ-বাংলার পিতা মৌলবী ওয়াজেদ, হেমায়েত উদ্দীন আহমদ প্রমুখ বরিশালের মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও জাগরণে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। হেমায়েত উদ্দীন মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৮৯৫ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিটসন বেল-এর সহযোগিতায় 'বেল ইসলামিয়া মুসলিম হোস্টেল', নির্মাণ করেন। এর আগে, মুসলমান ছাত্রদের বরিশাল শহরে কোন আবাসিক ব্যবস্থা ছিল না। এই বেল ইসলামিয়া হোস্টেল মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। উনবিংশ শতাব্দির শুরুতে বরিশাল জেলা স্কুলে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪৩৭ জন। এর মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২৬ জন। মধ্য ইংরেজীর ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩০৪ জন, মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ৮৬ জন। মধ্য নর্মাল বিদ্যালয়ে ১৭৩৭ জনের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ২১১ জন। ১৮৭৪ সালে ৯টি বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১১৫ জন। এর মধ্যে কোন মুসলমান ছাত্রী ছিল না।

বরিশালে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট মৌলবী মুহাম্মদ ওয়াজেদ এবং প্রথম এম. এ. এ. কে. ফজলুল হক। জেলার দ্বিতীয় গ্র্যাজুয়েট আগরপুরের আফছার উদ্দীন মিয়া। ১৯০০ সাল পর্যন্ত জেলায় প্রায় ২০০ গ্রাজুয়েট ছিলেন

এবং তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ জন। উলানিয়া, সাতুরিয়া, বামনা, লোহালিয়া, চাখার গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলো আরবী, ফার্সীর সাথে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বরিশালের মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার ঝোঁক-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময় কাশীপুর, রহমতপুর, শোলক, মাহিলারা, বাউফল, উত্তর শাহবাজপুর, পোনাবালিয়া, সিদ্ধকাঠি, চাঁদশী, জয়শীর, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি প্রভৃতি এলাকায় ইংরেজী শিক্ষার নব জাগরণ ঘটে।

সাহিত্য সংস্কৃতি

নলচিড়ার মিয়াবাড়ি, চাখারের মিরবাড়ি, সাতুরিয়া মিয়াবাড়ি, শায়েস্তাবাদের মির, বামনা ও উলানিয়ার চৌধুরী বাড়িতে আরবী–ফারসী ভাষার চর্চা হতো। শায়েস্তাবাদের সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজ বাড়িতে একটি বৃহৎ লাইব্রেরী গড়ে তোলেন।আঠারো ও উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জ জেলায় কয়েকখানা দোভাষী পুঁথি রচিত হয়।

পুঁথি সাহিত্যই বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব। পুঁথি ছিল সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য এবং তাদের মুখের ভাষায় রচিত। এসব পুঁথিতেই সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ, ঐতিহাসিক কাহিনী ও আশা–আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটতো। 'রসূলের মেরাজ গমন' নামক একখানা ছিন্ন পুঁথি সম্প্রতি চাখার গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়। এর রচয়িতা ফৈজদ্দিন। সম্ভবত তিনি চাখারের অধিবাসী ছিলেন। পুঁথির ভাষায় বরিশালের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব আছে।

আয়েন আলী সিকদার মেহেন্দীগঞ্জ থানার রুকন্দি আবদুল্লাহপুরে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কার্যোপলক্ষে ঢাকায় থাকতেন। ১৮৬৬ সালে তিনি 'বিধবা বিল্যাস' রচনা করেন। ১৮৬৮ সালের ২৫শে জুন এটি প্রকাশিত হয়। মীর মোশাররফ হোসেনের আগে তিনি 'পূর্ববঙ্গের' গদ্য লেখক। 'বিধবা বিল্যাস' রূপকথা জাতীয় কাহিনী। আয়েন আলী বরিশালের প্রথম গদ্য লেখক ও ঔপন্যাসিক।

আবদুস সোবাহান ১৮৫৯ সালে ঝালকাঠি থানার রাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'হাবিল কাবিলের কেচ্ছা', 'পীরের কল্যাণ' এবং 'কেয়ামত-মৃত্যু' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আবদুল আলী গারুলী ও নিবারণ সর্দারের পুঁথি রচনা করেন।

বরিশালের রাজনীতিতে ইসলামের প্রভাব

উপমহাদেশ সহ গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্য স্পষ্ট হবে যে, ইসলামই মুসলমানদের সুসংবদ্ধ ও সংগ্রামশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে এবং বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। সুতরাং মুসলমানরা ইসলামকে বাঁচায়নি ; বরং ইসলামই বার বার মুসলমানদের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। বাংলাদেশে কিংবা বরিশালেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। আদিতে জনসংখ্যার স্বল্পতা, সহজ-সরল জীবন-যাপন প্রণালী এবং অনায়াসলব্ধ জীবিকার কারণে গ্রামীণ জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও জটিলতা ছিল না। জনসাধারণ নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-যাপন করত। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, বর্ণ বা শ্রেণী-চেতনা এখনকার মতো তীব্র ছিল না। বিশেষ করে এ উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন বিজয়ী বেশে হলেও তারা স্বধর্ম প্রচারে কখনও জবরদস্তি বা ভয়ভীতির আশ্রয় নেয়নি। ইসলাম তার শাশ্বত সৌন্দর্য-চেতনা, উদার মানবিকতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সবাইকে ঠাঁই দিয়েছে। ইসলামে অন্য ধর্মের মতো পুরোহিত বা যাজকতন্ত্রের কোন স্থান নেই। সে কারণে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যবর্তী কোন পেশাদার ধর্ম-ব্যবসায়ীরও স্থান নেই। এ কারণে ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্যান্যরা আপন গরজে স্বতস্ফূর্তভাবেই এগিয়ে এসেছেন।

ইসলামের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কখনও ধর্ম গ্রহণে কারও উপর জবরদস্তি করেননি। তাঁকে সুসংবাদদাতা ও সত্য প্রচারক হিসেবে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকলকেই মুসলমান করে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় তেমন নয়। তিনি চান মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি ও বিবেকবোধ প্রয়োগ করে সত্য-মিথ্যার মাঝে ফারাক রচনা করে সত্যকেই

বুঝেশুনে গ্রহণ করুক। নবী (সা)-এর মিশন হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত পরিপূর্ণভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সারা দুনিয়ায় মুসলমানরা দীন প্রচারের ক্ষেত্রে নবূয়তী ধারাই অনুসরণ করেছেন। মুসলিম শাসনের সূচনাকাল থেকেই বরিশালে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং ঈমান আনয়নের ব্যাপারটি ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির এখতিয়ারের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সে কারণেই ইসলামের কোন অনুসারীই দ্বীন প্রচারে জবরদস্তির আশ্রয় নেননি। এমনটা হলে ইংরেজ শাসনের দুশ' বছরে মুসলমানদের দুর্দিন যখন চরমে, তখন অনেকেই ইসলাম ছেড়ে স্বধর্মে ফিরে যেত। ইতিহাস এ ধরনের কোন ঘটনার কথা বলে না।

শত শত বছর এ উপমহাদেশ মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হলেও শাসকরা খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে এ দেশকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার ইচ্ছা পোষণ করেননি। তবে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন শাসক পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র নিষ্ঠাবান পাবন্দ ছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্র শাসনে ইসলামের আদল ও ইনসাফ অনুসরণ করেছেন। ধর্ম প্রচারক, সাধক, বুযর্গ, পীর-মাশায়েখদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তবে মোঘল শাসনের দীর্ঘ সময় ইসলামের জন্য ছিল দুর্দিন। আকবরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তনের আগে থেকেই মোঘল হেরেমে হিন্দু ও রাজপুত সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে এবং সীমিত পর্যায়ে হলেও বিভ্রান্তির সূচনা করে। তবে মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র)-এর জিহাদ ও সংস্কার আন্দোলনের ফলে অমাবস্যার ঘোর কেটে যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে 'জিন্দাপীর' বাদশাহ আওরঙ্গজেব ইসলামের উজ্জীবনকে গতিশীল করে যান। শাসকদের কারণে ইসলামের ব্যাপারে যে বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি ঘটে, তার প্রতিক্রিয়া কখনও সাধারণ মুসলমানদের মাঝে সংক্রমিত হয়নি। শাসক, তাদের আমীর-ওমরাহ, পাইক-বরকন্দাজ ও ঘনিষ্ঠজনদের মাঝেই বিচ্যুতি সীমাবদ্ধ ছিল। তা ছাড়া এ দেশে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যেহেতু শাসকের চাপ কিংবা অনুপ্রেরণায় নয়, নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণ

করেছিলেন, সে কারণে শাসক মহলে ইসলাম বিরোধী অবক্ষয় সাধারণ মুসলমানদের তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের সূচনাকাল থেকেই সাধারণ মুসলমানরা ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান যথাসাধ্য নিষ্ঠার সাথে পালন করতে শুরু করেন। তারা বিপদে-আপদে, সংকটে-সমস্যায় ইসলামের দিক নির্দেশনা, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুসরণে সচেষ্ট ছিলেন। এ কারণে সামাজিক সংকট-সংগ্রামে ইসলাম ছিল এ দেশের মুসলমানদের সহচর। এ উপমহাদেশের সামগ্রিক ইসলামী আন্দোলনের সাথে বরিশালের মুসলিম জনগণের হৃদস্পন্দন গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল। যদিও ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের কোন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে সংগঠিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। তবে স্থানীয় পর্যায়ে পীর-বুযর্গ, সূফী-সাধক, আলিম-মাশায়েখগণের সাথে বরাবরই সাধারণ মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিল অটুট। ইসলামের অবমাননামূলক যে কোন ঘটনায় সাধারণ মুসলমানরা সবসময়ই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তবে ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের পরই ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্দিন নেমে আসে। তার আগে অবশ্য সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহীর ষড়যন্ত্র থেকে ইসলামকে মুক্ত করার সংগ্রাম হয়েছে। ঐ আন্দোলন বহুলাংশে দিল্লীকেন্দ্রিক ছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে মুসলমানরা রাজ্য শাসন ক্ষমতা হারিয়ে এক প্রকার নিঃস্ব হয়ে পড়েন। মুসলমানদের বিপর্যয়ের মাধ্যমে ইসলামের জন্যও কঠিন সংকটকাল অনিবার্য হয়। পলাশীর বিপর্যয়ের পর ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে যত মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে, তার নেতৃত্ব দিয়েছেন মুসলমানরা এবং এসব মুক্তি সংগ্রামে ইসলামই ছিল প্রেরণার উৎস। নবাব মীর কাসিম থেকে শুরু করে অযোধ্যার হায়দর আলী ও মহাবীর টিপু সুলতানের মহাসংগ্রাম ইংরেজদেরকে ইসলামের অবিনাশী শক্তিমত্তা সম্পর্কে সতর্ক হতে বাধ্য করে। ঘুরে শত শত বছর ক্রুসেড সমরে মুসলমানদের সাথে মুখোমুখি লড়ে। ইউরোপীয়রা ইসলামের অবিনাশী শক্তি সম্পর্কে আগেই অবহিত হয়েছিল।

তাছাড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে, জেরুজালেমে, সিরিয়ায় এবং রোমানদের সাথে মুসলমানরা শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন ঘটার আগেই তারা ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ও স্পর্শকাতর মনোভাব পোষণ করত। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, বালাকোটের মুজাহিদ আন্দোলন, তীতুমীর-মজনু শাহ্‌র মুক্তি সংগ্রাম, কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন, ফরাজী আন্দোলন, জামালউদ্দীন আফগানীর প্যান ইসলামী আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনে বৃটিশ শাসকরা ইসলামের অফুরন্ত অবিনাশী শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়েছে। বৃটিশ শাসনের প্রায় পুরো দু'শ বছরই মুসলিম আলিমগণ অসহযোগিতার ঝাণ্ডা উঁচু করে রেখেছেন। শত শত মুক্তিকামী ইসলামী মুজাহিদকে ফাঁসী দিয়ে, জেলে পুরে কিংবা দ্বীপান্তর দিয়েও ইংরেজ রাজশক্তি ইসলামের অজেয় সৈনিকদের বশীভূত করতে পারেনি। বৃটিশ রাজশক্তি যখনই কোন বিদ্রোহ কিংবা মুক্তি-সংগ্রাম মুকাবিলা করেছে তখনই তারা আলিম-ফকীর সাধারণ মুসলমানদেরকে তার নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ করেছে। এ কারণে ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের হীনবল করাই ছিল ইংরেজ শাসকদের রাষ্ট্রনীতি। এ কারণে ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারী কোন মুসলমানই ইংরেজ শাসকদের সাথে আপোস করেননি, সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেননি। হিন্দু জমিদাররা যখন ইংরেজ প্রভুদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন বরিশালের অধিকাংশ জমিদার ও সামন্ত প্রভু প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিহাদ করে শহীদ হয়েছেন। প্রতিটি মুক্তি সংগ্রামেই বরিশালের মুসলমানরা ছিলেন একাত্ম, নিবেদিতপ্রাণ। ইসলামের শাশ্বত জিহাদী চেতনাই এখানকার মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিতে।

সিপাহী বিপ্লবের সময় আমরা বরিশালের মুসলমানদের উজ্জীবিত হতে দেখি। বালাকোটে জিহাদের ময়দানে বরিশালের মুসলমানরা ইসলামের জন্য রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। ফরাজী আন্দোলন সহ স্থানীয় পর্যায়ের সকল মুক্তি সংগ্রামে বরিশালের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অংশ নিয়েছেন। খিলাফত আন্দোলন,

বঙ্গভঙ্গ, পাকিস্তান সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি সকল পর্যায়ে বরিশালের মুসলমানরা সম্পৃক্ত ছিলেন। তবে জাতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সংগ্রাম তাৎক্ষণিকভাবে ফলপ্রসূ না হওয়ায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইংরেজ বিরোধী সকল আন্দোলন পর্যুদস্ত হওয়ায় আন্দোলনের ধারাবাহিকতা থেকে বরিশালের মুসলমানরা বিচ্যুত হন। এই শূন্যস্থান দখল করেন ইউরোপীয় নবালোক প্রাপ্ত হিন্দু বুদ্ধিজীবিগণ।

বৃটিশ আমলের প্রথম পর্বে, আজাদী পুনরুদ্ধারের দীর্ঘতর মুক্তি সংগ্রামে বরিশালবাসী মুসলমানরা সামনের কাতারে ছিলেন। একইভাবে ১৯০১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলে, সেখানেও বরিশাল ছিল অগ্রসর। বৃটিশ ভারতে কলিকাতা ছিল সারা উপমহাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রাণকেন্দ্র এবং তখন বরিশালের অবস্থান ছিল কলকাতার পরেই। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বরিশাল বিশ শতকের গোড়ার দিকেই খ্যাতি লাভ করে।

বৃটিশ ভারতে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ ও সশস্ত্র সংগ্রামের পর্ব সমাপ্তির পর বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলমানরা নতুন করে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বকীয়তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। নবতর পর্যায়ের এই জাগৃতির সূচনায়ই বরিশালের প্রতিনিধিত্ব ছিল। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ উপমহাদেশের মুসলমানদের যে বৈঠক আহবান করেন সেটি ছিল 'মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স'। বরিশাল হতে এ. কে. ফজলুল হক, খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন, উলানিয়ার নুরুল হক চৌধুরী এতে যোগ দেন। মুসলিম লীগ গঠনে এ. কে. ফজলুল হকের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন মুসলীম লীগ গঠনতন্ত্র কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। 'পূর্ববাংলা' হতে নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব আলী চৌধুরী ও খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন। নুরুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য ছিলেন। খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রবক্তা ছিলেন। ১৯০৯ সালে মর্লে মিন্টো প্রবর্তিত ভারত শাসন আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা

হয়। হেমায়েত উদ্দীন ১৯০৬ সাল হতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ আইন সভায় মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯০৮ সালে চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাঈল পূর্ববঙ্গ পৌরসভার সদস্যদের প্রতিনিধি হিসেবে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি তুরস্ক বিভক্ত করে খিলাফত ভেঙ্গে দিলে মুসলমানরা খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। খিলাফত আন্দোলনের আগে হিন্দুরা সরাসরি ইংরেজ বিরোধী কোন আন্দোলনে নামেনি। ১৯১৯ সালের ১৮ অক্টোবর কলিকাতায় খিলাফত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় এ. কে. ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন, আসগর আলী উকিল, হাশেম আলী খান, সৈয়দ আবুল হোসেন উকিল প্রমুখের নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলনের চেতনা বরিশালের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

খিলাফত আন্দোলন সূচনার দু'বছর পর ১৯২১ সালে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী সম্মিলিতভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। ইসলামী জিহাদ আন্দোলনের পর্ব সমাপ্ত হবার পর খিলাফত আন্দোলনই আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান ও আলিমদের সম্মিলিত সংগঠিত আন্দোলন। খিলাফত আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মওলানা মুহাম্মদ আলী এবং অসহযোগ আন্দোলন নেতা গান্ধী ১৯২২ সালে বরিশালে আগমন করেন। খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন মুসলমান-হিন্দু উভয় জনগোষ্ঠীকেই সমভাবে আলোড়িত করে। এ আন্দোলনে বরিশালবাসী সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদিকে ভারতীয়দের স্বায়ত্বশাসন দাবির প্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করেন। ১৯২০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বরিশালে তিনটি মুসলিম ও দুটি হিন্দু আসন বরাদ্দ পায়। জনাব আজাহার উদ্দীন আহমদ, এ. কে. ফজলুল হকের ভাগ্নে এ. এইচ. এম. ওয়াজির আলী ও আবুল ফজল করিম উকিল এম. সি. এ. নির্বাচিত হন।

উল্লেখ্য, ১৮৫৪ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সূচিত হবার তিন বছর আগে সিংখোলীর গগন ও মোহন মিয়ার ইংরেজ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়।

বরিশালের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। এরপর প্রায় চার দশক অর্থাৎ মুসলিম লীগ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে একদল বুদ্ধিজীবী সভা-সমিতি গঠন করেন। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও অভাব-অভিযোগ সরকারের কাছে তুলে ধরা।

খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন ইংরেজী শিক্ষিত একজন মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী ও সংস্কারকামী মুসলমান ছিলেন। তিনি আলীগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদের ন্যায় বরিশালের মুসলিম সমাজে শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক জাগরণমূলক আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর আহবানে ভাগলপুরের মৌলবী [illegible]শালে আসেন এবং হেমায়েত উদ্দীনের নেতৃত্বে ১৮৯৩ সালের ২১শে মে 'আঞ্জু[illegible]হেমায়েত ইসলাম' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির সভাপতি হন মুহাম্মদ ওয়াজেদ, সহ সভাপতি ওবায়দুল গণি চৌধুরী, [illegible] ইসমাইল চৌধুরী এবং সম্পাদক ছিলেন খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন আহমদ। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জেলার অনগ্রসর মুসলমানদের সার্বিক উন্নতি সাধন। 'আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম' বরিশালে মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতো। ১৮৯৯ সালের ২৪ই ডিসেম্বর কলকাতা মোহামেডান শিক্ষা সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য বরিশালে কলকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মৌলবী মুহাম্মদ ওয়াজেদ এবং বক্তব্য রাখেন আলীগড়ের মাহবুবুল ইসলাম। হেমায়েত উদ্দীন কলকাতা শিক্ষা সম্মেলনে বরিশালের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯০৫ সালে হেমায়েত উদ্দীন আহমদ 'আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম' সমিতির মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমর্থন করেন। ১৯০৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে বরিশাল হতে হেমায়েত উদ্দিন আহমদ, উলানিয়ার নুরুল হক চৌধুরী ও এ. কে. ফজলুল হক যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে হেমায়েত উদ্দিন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এর দু-এক

বছরের মধ্যেই বরিশালে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা নিরসনের লক্ষ্যেই শিক্ষা সম্মেলনের ব্যানারে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকেই ঐতিহাসিক মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এর বিশ-একুশ বছর আগে ভারতে হিন্দুদের রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিম জনগণের রেনেসাঁর যে উদ্যোগ নেওয়া হয় তার ভিত্তি ছিল শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সমাজ কল্যাণ চেতনাকে বিকশিত করা।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের একটি আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র নির্মাণ করে দেয়। একই সাথে মুসলমানদের [illegible]-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নির্মাণেও বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে যে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়, তার মধ্য দিয়েই মুসলমানদের অবদমিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বপ্নের প্রথম আনুষ্ঠানিক স্ফূরণ ঘটে। এ কারণেই বরিশালের অগ্রসর সমাজ সচেতন মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অবস্থান নেন এবং সাধারণ মুসলমানদের এই রাজনৈতিক সাফল্যের পক্ষে সংগঠিত করেন।

বঙ্গভঙ্গ ও বরিশালের হিন্দু সমাজ

অবিভক্ত ভারতে কলকাতার পরে বরিশাল ছিল রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বরিশালের ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু সমাজ [illegible] রদ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। হিন্দু অগ্রসর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে মনে করে সারা বাংলার হিন্দুরা একযোগে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য উগ্রমূর্তিতে মাঠে অবতীর্ণ হয়। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বও শামিল হন এবং কবিতা, গান ও লেখনী দ্বারা বঙ্গ বিভক্তি ঠেকাবার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালের হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়ায়। হিন্দু ধর্মীয় চেতনার সাথে তারা বঙ্গ বিভক্তির ঘটনার সাথে যুক্ত করে ফেলে। চারণ কবি মুকুন্দ দাস গান গেয়ে হিন্দু জনমতকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। ডঃ আর. সি. মজুমদার বি এম কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় এই আন্দোলনে শামিল হন। ডঃ আর. সি. মজুমদার তার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "তখন বরিশালের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। তাহার পিতার নামে তিনি যে ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বর্তমান লেখক ১৯০৫ সনে তাহার আবাসিক ছাত্র হিসাবে তাহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। তখন রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র অরবিন্দ ঘোষ ব্যতীত এরূপ সাধুতা ও আদর্শ চরিত্রের তত্তুল্য নেতা বঙ্গদেশে আর কেহ ছিলেন না বলিলেই অত্যুক্তি করা হইবে না।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রতিরোধে হিন্দুরা যতই সংগঠিত ও স্বজাত্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে থাকে, বঙ্গভঙ্গের সমর্থক এবং প্রত্যক্ষ বেনিফিসিয়ারী মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের চাপ ততোই বাড়তে থাকে। বস্তুত বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হলেও হিন্দুরা এটিকে ধর্মীয় আবেগ দিয়ে গ্রহণ করে। 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদন' হিন্দুদের দেবীকে নাখোশ করছে, এই যুক্তিতে হিন্দুরা মাঠে নেমে পড়ে। হিন্দু যুবকরা বিভিন্ন গুপ্ত সশস্ত্র সমিতি গঠন করে বঙ্গভঙ্গ ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। ক্ষুদিরাম এ সময়ই বড়লাটকে হত্যার জন্য বোমা ব্যবহার করে। চট্টগ্রামের 'মাষ্টার দা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দার প্রমুখ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনে অংশ নিয়ে বৃটিশ শক্তিকে বিব্রত করে তোলে। এই সংগঠিত সহিংস আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার ঘোষণা দিতে বাধ্য হন।

এর বিপরীতে মুসলমানরা সংগঠিত হয়েও ইংরেজ শাসকদের পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল রাখতে পারেননি। বস্তুত বঙ্গভঙ্গ এমন এক সময় হয়, যখন মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ পর্ব। তারও এক শ' বছর আগে থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠী শিক্ষায়, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সহযোগিতায় অগ্রসর

হয়ে আছেন। হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলনের মোক্ষম শ্লোগান হিসেবে 'বন্দে মাতরম' ব্যবহার শুরু করে।

খিলাফত আন্দোলনে বরিশালের মুসলমান

ইংরেজদের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আসাম ও পূর্ববঙ্গকে মিলিয়ে এবং ঢাকাকে রাজধানী করে যে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়, চিরবঞ্চিত অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য সেটা ছিল এক ঐতিহাসিক প্রাপ্তি। কিন্তু হিন্দুদের প্রবল আন্দোলনের মুখে ইংরেজ শাসক যখন তাদের ঘোষিত সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হলো, তখন মুসলমানরা দারুণ হতাশ ও দিশেহারা হয়ে পড়েন। জনশ্রুতি আছে, বঙ্গভঙ্গের অন্যতম পরামর্শক নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এই শোকে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে যে উদ্দীপনা ও রাজনৈতিক প্রাণ-স্পন্দনের সূচনা হয়, তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে এই জাগরণের অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করি খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে। বরিশালে খিলাফত আন্দোলনের ব্যাপক রূপলাভ করে, এবং বরিশালের আত্মসচেতন মুসলমানরা খিলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সুদূর তুরস্কে মুসলমানদের একটি কেন্দ্রীয় খিলাফত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের খলীফার পরাজয়ের পর বৃটিশ ও ফরাসীরা খলীফাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তুরস্ককে ভাগ করে নেবার উদ্যোগ নেয়। তুর্কী খিলাফত ছিল মুসলমানদের ঐক্য ও চেতনার প্রতীক। এই খিলাফতের মাধ্যমেই মুসলমানরা বিশ্বজনীন ইসলামী জাতীয়তাবাদের স্বপ্নকে ধারণ করে ছিলেন। বৃটিশ ও ফরাসী জাতির খিলাফত ভেঙ্গে দেবার এই উদ্যোগ মুসলমানদের মাঝে বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সারা বিশ্বের মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী ও এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে। ১৯১৯ সালে ভারতের মুসলমানগণ খিলাফত আন্দোলনের সূচনা করেন। এটি ছিল বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম প্রকাশ্য সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন। মুসলমানদের নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলনের সূচনা হবার আগ পর্যন্ত কংগ্রেসের মাঝে ইংরেজ বিরোধী কোন আন্দোলনের চিন্তা আসেনি। তবে খিলাফত আন্দোলনে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ

প্রয়াসের সাথে সাথে কংগ্রেসও অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন ও কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন যৌথভাবে পরিচালনার প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। বৃটিশ উপাধি বর্জন, স্কুল-কলেজ বর্জন, বিদেশী দ্রব্য বয়কটের একটি ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়।

খিলাফত আন্দোলন বরিশালের মুসলমানদের মাঝে বিপুল সাড়া জাগায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীতে মুসলমানদের আজাদীর গৌরব রবি অস্তমিত যাবার পর মুসলমানরা কখনও বৃটিশ শাসনকে একদিনের জন্যও মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা বার বার বিদ্রোহে ফেটে পড়েছেন, সংগ্রামে উদ্বেল হয়েছেন। তাদের ষড়যন্ত্র, শঠতা ও প্রতিবেশীদের বেঈমানীর জন্য মুসলমানরা সফল হতে পারেননি। ইঙ্গ-ফরাসী ষড়যন্ত্রের কারণে তুর্কী খলীফা যখন পরাজিত হলেন এবং ঐ খিলাফত যখন তারা ভেঙে দিল, তখন এ দেশের মুসলমানরা সমস্ত আক্রোশ ও ক্ষোভ নিয়ে ফেটে পড়ল।

বরিশালে খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীনকে সভাপতি এবং হাশেম আলী খানকে সম্পাদক করে জেলা খিলাফত কমিটি গঠন করা হয়। তাঁদের নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয়। খিলাফত আন্দোলনে অংশ নেবার কারণে বরিশালের অনেক মুসলমানকে কারাবরণ করতে হয়।

এই আন্দোলনে বরিশালের যেসব মহান ব্যক্তি অংশ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন আহমদ, হাশেম আলী খান, উকিল মৌলবী আসগর আলী (ভোলা), উলানিয়ার ওয়াহেদ রাজা চৌধুরী, সুলতান আহমদ চৌধুরী, বাদশা মিয়া, খোরশেদ আলম চৌধুরী, গৌরনদীর আবদুল মাজেদ কাজী, সায়েস্তাবাদের নবাব সৈয়দ মোহম্মাদ হোসেন, আগরপুর জোতের ওবায়দুল গণি চৌধুরী, শরিকলের মুন্সি জয়নাল আবদীন, বাউড়া জোতের উকিল রফিকউদ্দীন আহমদ, পিরোজপুরের সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল, মঠবাড়িয়ার খান সাহেব হাতেম আলী জমাদ্দার, আজাহার উদ্দীন আহমদ,

বরগুনার আবদুল কাদের মিয়া, রমজান মাষ্টার, বেতাগীর আব্দি আবদুল্লা (চান মিয়া), পটুয়াখালীর উকিল ফজলে করিম, ফকু মিয়া, খান সাহেব আকরম, এমদাদ মোক্তার, শাহ ছিয়াপোশ, ডাঃ মমতাজ উদ্দীন, ভোলার কবি মোজাম্মেল হক, খান বাহাদুর নূরুজ্জামান মোক্তার, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, নুর আহমদ সিকদার, মাওলানা নাসির উদ্দীন, চাখারের সৈয়দ আলী হোসেন উকিল (আলি মিয়া), মুলাদীর সৈয়দ শামসুজজোহা, মেহেন্দীগঞ্জের খান সাহেব আফাজ উদ্দীন, কলসকাঠির হাশেম তালুকদার, মুন্সি ইয়াসিন হাওলাদার প্রমুখ।

অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে যারা ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নিষ্ঠাবান ছিলেন, তাদের কেউ–ই খিলাফত আন্দোলনের আহ্বান থেকে দূরে থাকেননি। ছাত্র ও যুব কর্মীরাও খিলাফত আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন, আজিজ উদ্দীন আহমদ, আবদুল ওহাব খান, সৈয়দ আনসার উদ্দীন, মীর ফিদে আলী, [illegible]দ্দীন, সৈয়দ কুতুবউদ্দীন, মুহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, মোফাজ্জেল হক, আবদুল রাজ্জাক সিকদার, সৈয়দ হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশ ও হিন্দুরা মুসলমানদের অজেয় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় পায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে ১৯১১ সালে ইংরেজরা হিন্দুদের অন্যায় দাবির মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ করে দেয়। আর খিলাফত আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯১৯ সালে। বঙ্গভঙ্গ রদ হবার বেদনা ও ক্ষোভ মুসলমানরা খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ করে। ১৯২৩ সালে তুরস্কের খলীফা পদ উঠিয়ে দিলে খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

অসহযোগ আন্দোলন

ইংরেজ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনেও বরিশালের মুসলমানদের বিশেষ অবদান রয়েছে। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য বরিশালে যে কমিটি

গঠিত হয়, তাতে শীর্ষস্থানীয় মুসলমান নেতাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এদের মধ্যে হাশেম আলী খান, ওয়াহেদ রাজা চৌধুরী প্রমুখ।

বাংলা ১৩২৮ সালের ২২ ভাদ্র মহাত্মা গান্ধী ও খিলাফত আন্দোলনের প্রাণপুরুষ মাওলানা মুহাম্মদ আলী বরিশালে আসেন। বাকেরগঞ্জ জেলাবাসীর পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলীকে মানপত্র দেওয়া হয়।

কুলকাটি হত্যাকান্ড

জালিয়ানওয়ালাবাগ ও কুলকাটির হত্যাকাণ্ড উপমহাদেশের ইতিহাসে ইংরেজ রাজত্বের কলঙ্কময় অধ্যায়। কুলকাটির হত্যাকাণ্ড বরিশালের মুসলমানদের মধ্যে নৃশংসতার স্মৃতি জাগায়।

হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলন ও তার প্রভাব

বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের শাসনামলে হিন্দু ধর্মের অন্যতম সংস্কারক শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাব ঘটে। শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব যদিও হিন্দু ধর্মের সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে, তবু এটি ইসলামের ইতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের দরবারে বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ছিলেন। রূপ ও সনাতন নামের দুই ভাই তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাবের পর তারা তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে চলে যান। শ্রী চৈতন্যের ধর্ম হচ্ছে- বৈষ্ণব ধর্ম। মনে রাখা দরকার, বিশাল বাংলা মুলুক যখন একচ্ছত্র মুসলিম শাসনের অধীন, তখনই বৈষ্ণব ধর্মের উল্লাস তীব্র হয়ে উঠে। এটা ইসলামের উদারনৈতিক সহিষ্ণু নীতিবোধেরই ফল। তবে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের দুই হিন্দু মন্ত্রী রূপ ও সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার ফলে শ্রী চৈতন্যের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। আবদুল মান্নান তালিব তাঁর 'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, "সাময়িকভাবে হলেও তার পরিচালিত বৈষ্ণব আন্দোলন যে বাংলাদেশে ইসলামের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলোর সব দাবি সত্য হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, হোসেন শাহের আমলে মুসলমানদের ইসলামী চেতনা ও জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছিল এবং শাসনতন্ত্রের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে শের্ক থেকে রক্ষা করার কোন প্রচেষ্টাই চালানো হয়নি। সম্ভবত এ অভাব দূর করার জন্য হোসেন শাহ তাঁর আমলে অধিক সংখ্যক মাদ্রাসা কায়েম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।"

তবে এ কথা সত্য যে, বৈষ্ণব আন্দোলন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদেরকে খুব একটা আকৃষ্ট করতে পারেনি। চৈতন্য চরিত গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে বৈষ্ণব আন্দোলন বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। হোসেন

শাহের দুই মন্ত্রী রূপ ও সনাতন গোপনে মুসলিম শাসনের অবসানকল্পে কাজ করে যাচ্ছিলেন। মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

ছোলতান হোছেনের প্রাথমিক দোষ-দুর্বলতার সুযোগ লইয়া, গৌড় রাজ্যের সাধু-সন্ন্যাসী রূপধারী বৈষ্ণব জনতা যে বাংলাদেশ হইতে এছলাম ধর্ম ও মোছলেম শাসনকে সমূলে উৎখাত করিয়া ফেলিবার জন্য গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।, ছোলতানের ও স্থানীয় মোছলেম নেতাদের যথা সময়ে সতর্ক হওয়ার ফলে তাহার অবসান ঘটিয়া যায়।* সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, রূপ ও সনাতনের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পেছনে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নিহিত রয়েছে। শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলন প্রধানত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে।

পাল ও সেন শাসনামলে হিন্দুরাই রাজকার্যের উচ্চ পদগুলো অধিকার করেছিল। পরবর্তী মোঘল শাসনামলেও তাদের এ প্রাধান্য ছিল। বিশেষ করে বাংলার মুসলিম শাসকরা হিন্দু অমাত্যদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে এ ব্যাপারে হযরত মুজাফফর শামস বলখী ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সতর্ক হবার আগেই সম্ভবত দরবারের প্রভাবশালী অমাত্য ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশের চক্রান্তে নিহত হন। গণেশের নেতৃত্বে এই প্রথম মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে একটি হিন্দু অভ্যুত্থান ঘটে। এর ফলে গণেশের দখলে গৌড়ের সিংহাসন চলে যায়। চার বছর ধরে চলে মুসলিম নিধন যজ্ঞ। মৃত সংস্কৃত ভাষার চর্চা আবার শুরু হয়। মুসলিম শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় যে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ঘটছিল, তা স্তিমিত হয়ে গেল। কিন্তু স্বল্প সময়েই হিন্দু দুঃশাসনের অবসান ঘটে। তবে হিন্দুদের রাজনৈতিক অভিযান ব্যর্থ হলে তারা সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিতে থাকে। হিন্দু সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ এবং বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের অভাব হেতু মুসলিম শাসকদের হেরেমেও মহাভারত-রামায়ণ কাহিনী অনুপ্রবেশ করল। মুসলমান সুলতানদের দরবারে রীতিমতো রামায়ণ-মহাভারত পাঠের আসর বসতে লাগল। এটি ছিল মুসলিম সমাজের জন্য চরম দুর্দিন। শাসক

মহলের মাঝে যখন এই অবক্ষয়ের ধ্বংস চলছিল, তখন সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা কল্পনা করা কঠিন। মনসা মঙ্গলের পাঁচালী ও বেহুলার ভাসান গানের বন্যায় সারা বাংলাদেশ প্লাবিত হলো। এর ফলে সাধারণ মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসগুলোও নড়ে উঠল। হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে যখন সরল মুসলমানরা দিকভ্রান্ত, তখনই ষোড়শ শতকে আবির্ভূত হলেন শ্রী চৈতন্য। হিন্দু ধর্মে তিনি নতুন রস সিঞ্চন করলেন। এতকাল সামাজিকভাবে মুসলমানদের হিন্দু ধর্মীয় আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে হিন্দু-মুসলমান একাকার হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু ধর্মীয় উপাদান সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের উদার চর্চা মুসলমানদের যথেষ্ট রকম বিপথগামী করেছিল।

১৫০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে শ্রী চৈতন্য নদীয়ায় 'গৌরীয় বৈষ্ণব মত' প্রচার করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণবদের অনুসারী। সময়ের দাবিতে তিনি সংকীর্তন ও নগর কীর্তনের প্রচলন করেন। "শ্রী চৈতন্য নিজে একজন উঁচুদরের পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রাদিতে তাঁর প্রাজ্ঞিত্য ছিল অগাধ, চৈতন্য চরিত গ্রন্থাবলী থেকে এ কথা জানা যায়। কাজেই ইসলাম ও মুসলিম সূফীদের সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর ইসলামের সবচাইতে বেশি প্রভাব ছিল এবং যাদেরকে তিনি হিন্দু ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে বা ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছিলেন, তারা কিভাবে এবং কিসের প্রভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তা তার অজানা থাকার কথা নয়। অন্য দিকে সূফীদের ঐ পদ্ধতি ও ভাবধারার উপর উপনিষদ ও ভাগবতের রঙ চড়ানো তাঁর মতো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না।" (বাংলাদেশে ইসলাম আবদুল মান্নান তালিব)।

সূতরাং শ্রী চৈতন্যের ধর্ম-সাধনার পথকে প্রেম ও ভক্তির পথ বলে চিহ্নিত করা হলেও তিনি নিজে কিন্তু অহিংস প্রেমের পথ অবলম্বন করেননি। চৈতন্য চরিত গ্রন্থাবলী অসম্ভব রকম মুসলিম বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। মাওলানা আকরম খাঁর মতে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ছিল শ্রী চৈতন্যের অভিযাত্রা।

শ্রী চৈতন্যের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন নবদ্বীপের কাজি এবং অনেকের মতে, এটিই উপমহাদেশের প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ইসলাম সম্পর্কে কৃষ্ণদাস

কবিরাজ মন্তব্য করেছেনঃ 'গো-হত্যাকারীরা তাদের এই পাপ কর্মের কারণে চিরন্তন নরকাগ্নিতে দগ্ধীভূত হবে।' (বাংলাদেশে ইসলাম) চৈতন্য। পরবর্তীকালে লিখিত অসংখ্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য অবমাননামূলক মন্তব্য করা হয়েছে। শ্রী চৈতন্য দেবের নর সংহারি কীর্তনের উল্লাসে কীর্তনীয়ারা মুসলিম নিধনেও উদ্যত হয়। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র পর্যন্ত এই বৈষ্ণব কীর্তনীয়াদের সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে সমর্থন করে লিখেছেনঃ "তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই-মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইলো।"

আসলে কোন কোন মুসলমান শাসক হিন্দুদের উপর নিপীড়ন করে থাকলে তা ইসলামের স্বার্থে তিনি করেননি। কিংবা ইসলামের কোথাও এমন কোন নির্দেশও ছিল না। সেটা ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক কারণে। সুতরাং এ জন্য চৈতন্য ভক্ত বৈষ্ণবদের মুসলিম নিধনের পক্ষে কোন যুক্তি খাড়া করা যায় না। যাহোক শ্রী চৈতন্যের তথাকথিত প্রেম ও ভক্তির ধর্ম মুসলমানদের যথেষ্ট সর্বনাশ সাধন করে। প্রথমত এরা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ায়। দ্বিতীয়ত মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, প্রাচীন ভারতের হিন্দু ধর্মেও কাম ও যৌন সম্ভোগ ধর্মীয় আচার হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম উৎসারিত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা এই যৌনতাকে নতুন করে ধর্মীয় আবরণ দেয়। এ পদ্ধতি নানা পথে মুসলমানদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে। মুসলমান কবিরাও বৈষ্ণব পদাবলীর নষ্ট প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, এই বৈষ্ণবদের একটি বড় অংশের বাস হচ্ছে বরিশাল এলাকায়। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় তারা 'হরিনাম সংকীর্তন' করে এবং ঢাকঢোল পিটিয়ে নগর সংকীর্তনে বের হয়। এসব কীর্তনে এখনও কমবেশি মুসলমান পুরুষ-নারীরা দর্শক শ্রোতা হিসেবে জড়ো হয়। এতে যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের সূচনা হয়, তা তারা বুঝতে পারে না। বরিশাল

এলাকার অপেক্ষাকৃত নিম্নশূদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝেই শ্রী চৈতন্যের তথাকথিত প্রেম ও ভক্তির বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারিত। সম্ভবত শ্রী চৈতন্যের এ সংস্কার আন্দোলন না হলে হয়তো ঐ সব জনগোষ্ঠী হিন্দুত্বের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে ইসলামের উদার পথে ফিরে আসতো। দুর্ভাগ্যবশত সূফীবাদ, আউল-বাউল, মাইজ ভাণ্ডারী প্রভৃতি বৈষ্ণববাদের বহুলাংশে সমার্থক। সে কারণেই বিকৃতি থেকে মুসলমানদের একাংশকে উদ্ধার করা কঠিন।

বরিশাল-পটুয়াখালী এলাকায় সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানদের একাংশের মাঝে বৈষ্ণবদের কীর্তনাদিতে যোগ দিতে দেখা যায়। এটি অবশ্য নিছক সঙ্গীতের টানেই ঘটে থাকে। বৈষ্ণবদের কোন আচার-আচরণ সাধারণ মুসলমানদের মাঝে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে মাইজ ভাণ্ডারীদের অনুসারী বলে এখনও কিছু লোক দেখা যায়।

পরিশিষ্ট

সাম্প্রতিক গবেষণা—কর্ম : একটি মূল্যায়ন

বাংলাদেশে সম্প্রতি পুরো প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে । জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব প্রকল্প প্রায় বিশ হাজার বছর আগের পুরো প্রস্তর যুগে বাংলাদেশে জনবসতি শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছেন । ১৯৮৯ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রত্নতত্ত্ব প্রকল্পের ভিজিটিং প্রফেসর দিলীপ কুমার চক্রবর্তী পুরো প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও হাতিয়ার তৈরির নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন।

লালমাই ও ময়নামতি পাহাড় এলাকা পরিদর্শন করে বিজ্ঞানীরা এটিকে পুরো প্রস্তর (প্লাইস্টোসিন) যুগের বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন । উল্লেখ্য, এই প্লাইস্টোসিন যুগ এখন থেকে মোটামুটি দুই মিলিয়ন বছর আগে শুরু হয়ে আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে তা শেষ হয়েছে। প্রফেসর আবু ইমাম মনে করেন, পুরো প্রস্তর যুগের এ আবিষ্কার প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ভূখণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ধারার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও তথ্য প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ।

ভৌগোলিক গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের কোন্ অংশের উদ্ভব কখন হয়েছে, তার সঠিক সময় নির্ণয় করা কঠিন। ভাঙাগড়ার প্রভৃত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত নদীমাতৃক এ ভূখণ্ডের আকৃতি কতবার পরিবর্তন বা রূপান্তর হয়েছে, সেটাও নির্ণয় করা কঠিন । তবে, এ কথা খুব সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, বাংলাদেশের দৃশ্যমান ভূ–মানচিত্রটি চিরকাল এমনটি ছিল না বা একসাথে পুরো এলাকাটি গঠিত হয়নি । সে অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠার ইতিহাসের কালও এক ও অভিন্ন নয়। আমাদের এ এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বড় ধরনের কোন ভূমিকম্পে ব্যাপক ধ্বংসসাধন সম্ভবত অকল্পনীয়। জ্ঞাত ইতিহাসের সূত্রে তেমন তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে কালের অন্তহীন

অবক্ষয়, প্রাকৃতিক বৈরিতা এবং নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রক্রিয়ায় এ অঞ্চলের ভূ-ভাগ বহু ভাঙ্গাগড়া প্রত্যক্ষ করেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের গঠন-ইতিহাস অপেক্ষাকৃত নতুন। তবে এসব এলাকার মানুষ এ অঞ্চলে একেবারেই নবাগত, এটা বলা যাবে না। জমির লোভে কিংবা অধিক জনসংখ্যা সামাল দেবার প্রয়োজনে মূল ভূখণ্ড থেকে আজও যেমন মানুষ নবোত্থিত পলিগঠিত ভূমিতে বসতি গড়ে তুলে, সুদূর অতীতেও একই প্রক্রিয়ায় বরিশাল-পটুয়াখালী এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু দক্ষিণের এই ভূখণ্ডে ঠিক কখন থেকে জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করে তা নির্ণয় করা কঠিন। পূর্বসূরি গবেষকরা তার কোন সূত্রও আমাদের সামনে উপস্থাপন করেননি।

মানব সভ্যতা গড়ে ওঠার গোড়ার দিকের বিস্তারিত তথ্য যেহেতু আন্দাজ-অনুমানের উপর নির্ভর করেই নির্ণয় করতে হচ্ছে, সে কারণে বলা চলে যে, পাহাড়, অরণ্য, প্রাকৃতিক বৈরিতা এবং শ্বাপদসংকুল অজ্ঞাত সড়ক পথে মানব সভ্যতা বিস্তার লাভ করার আগেই সমুদ্র ও নৌ-পথে মানুষের সংযোগ ঘটে এবং সেভাবেই অজ্ঞাত ভূখণ্ডসমূহ তারা আবিষ্কার করে। পবিত্র আল-কুরআনে পৃথিবী ও মানবকুলের স্রষ্টা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'আমি ভূতলকে বিস্তৃত করে দিলাম' এই গূঢ় সত্যে দুর্জ্ঞেয় বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে। তবে সাধারণভাবে আমাদের মনে হয় যে, আদি মানবগোষ্ঠী তাদের স্ব-জাতি গোষ্ঠীর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার খবর অনেক আগে থেকেই জানতেন। উত্তাল সমুদ্র, রুদ্র প্রকৃতির দুরন্ত বাঁধা অতিক্রম করে মানুষের আত্ম আবিষ্কারের নেশা সম্ভবত তার রক্তেই ছিল।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ায় আদি মানব-মানবীকে আল্লাহ্ তা'আলা পরিপূর্ণ মানুষ করেই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আদমকে তার আগেই জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন। দুনিয়ায় আসার আগেই আদমকে ফিরিশতাদের সাথে জ্ঞানের একটি মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। আর তাতে আদমকেই আল্লাহ্ জয়ী হবার সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের জ্ঞান ও হিকমতের মূল উৎস হচ্ছে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত 'ইল্ম'। দুনিয়াতে নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে এই জ্ঞান ক্রমশ আরও বিকশিত ও পরিপূর্ণ কাঠামো পেয়েছে।

"এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তাহারা বলিল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞান নাই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।' তিনি বলিলেন, 'হে আদম! উহাদিগকে ইহাদের নাম বলিয়া দাও।' যখন সে তাহাদিগকে উহাদিগের নাম বলিয়া দিল তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, স্বর্গ ও মর্তের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ নিশ্চিতভাবে আমি তাহা জানি?"–সূরা বাকারাঃ ৩১, ৩২, ৩৩।

পরবর্তী আয়াতে ঃ

"অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হইল। আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন। তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ, পরম দয়ালু।"

–প্রাগুক্ত ঃ ৩৭

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মানুষকে মহান আল্লাহ্ তা'আলাই জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন। এই মৌলিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই মানুষ তার জ্ঞানতৃষ্ণাকে সমৃদ্ধ করেছে। যুগে যুগে আল্লাহ্ মানব জাতির হেদায়েতের জন্য যে সব নবী পাঠিয়েছেন, তাঁরাও সমসাময়িক যুগ–চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে মানবীয় জ্ঞান ও শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান করেছেন।

নূহ (আ)–এর সময় যখন মানুষ নৌকার ব্যবহার জানত, তখন বুঝতে হবে যে, মানব সভ্যতার সূচনা ইতিহাসের সাময়িককালের ঘটনা নয়। মানুষের যোগাযোগের প্রাথমিক মাধ্যম যেহেতু নৌ–পথ, সে কারণে মানুষের বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ নৌ–পথেই বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়ে। এই সূত্রেই মানব জাতির পরবর্তী বংশধরেরা নৌ–পথে সবখানে যোগাযোগ গড়ে তোলে। এর ফলে মানব জাতির মিশ্রণ ঘটে অব্যাহত ধারায়। মানুষ তার প্রয়োজনেই নতুন নতুন জনপদ আবিষ্কার করে বসতি গড়ে তুলেছে। তবে কখন কোন্ জনপদটি মানব

বসতির যোগ্য হয়ে উঠেছে, তা জানা নানা কারণেই দুরূহ। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন যে, বর্তমান জনগোষ্ঠীর আগে অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের জন্য অসংখ্য মানব জাতিকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিল। হতে পারে সেটা ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন- ভূমিকম্প কিংবা জীবন বিনাশী রোগ-বালাই। এতে করে বহু সমৃদ্ধ সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আল্লাহ্ ঐসব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার কথা বলেছেন । মানব সভ্যতার এই ভাংগাগড়ার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সভ্যতার কাল নির্ণয় আসলেই কঠিন ব্যাপার। তবে মানব জাতি যেহেতু এক অখণ্ড ঐতিহ্য ও সভ্যতার অধিকারী, সে কারণে দুনিয়ার যেখানে যতো প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে, তাতে আমাদের উত্তরাধিকারিত্ব রয়েছে ।

বলা হয়, গোটা পৃথিবীর তিন ভাগ পানি আর একভাগ ভূভাগ । এই ভূ-ভাগ যদি না থাকতো তাহলে গোটা দুনিয়াই হতো অথৈ পানির উপর ভাসমান এক গহীন শূন্যতা । এই শূন্যতার মাঝে স্বভাবতই মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত না । তবে একই পৃথিবীর বৈচিত্র্যের স্বাদ পাচ্ছে, একে অপরকে জানার ও বোঝার দুরন্ত প্রয়াস চালাচ্ছে। বাংলাদেশের এই জনপদটি কিংবা বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত ছুঁয়ে বরিশালের যে জনপদটি আমরা এখন দেখছি, এর উদ্ভব, বিস্তৃতি ও জনবসতি গড়ে উঠার প্রকৃত ইতিহাস হয়তো কোনকালেই উদ্ধার করা সম্ভব হবে না; মহাকালের গহীন অন্ধকারেই তা ঢাকা থাকবে। তবু অজানা রহস্যের বন্ধ দরজা খোলায় অন্তহীন প্রয়াস মানুষ অব্যাহত রাখবেই। কেননা মানুষের মাঝে রয়েছে এক অন্তহীন জিজ্ঞাসার আকুতি। প্রতিনিয়ত তার সৃষ্টিশীলতা তাকে পীড়িত করে। কোন্ অতীত থেকে মানুষের বিজয় অভিযাত্রা শুরু হয়েছে, তা কে জানতে চাইবে না? অতীত মহাকালের গর্ভে দৃশ্যত হারিয়ে গেলেও বিলীন হয়ে যায় না । আল্লাহ্ বলেছেন, 'সময়' তিনি নিজেই। সেই মহান আল্লাহ্ই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ধারণ করেন আপন কুদরতের মহিমায়। অনেক নবীকে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করে দেখিয়েছেন। সুতরাং মৃত অতীত যে পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠবেই, এটা কোন অনুমানের বিষয় নয়। এ জন্যই মানুষ সম্ভবত অতীত অনুসন্ধানী। আর এটা হচ্ছে মুমিনের দৃঢ়মূল

বিশ্বাস, আল্লাহ্ আদমকে দুনিয়ায় পাঠাবার সময়ই বলে দিয়েছেন, দুনিয়াতে তাদের স্থিতি হবে ক্ষণকাল। এক নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পর সকলকেই মহা উথান দিবসের লক্ষ্যে পাড়ি জমাতে হবে। সেখানে প্রত্যেক মানুষকে তার অতীত কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে হবে।

আসলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে মানুষের রয়েছে এক অদৃশ্য যোগসূত্র। ইচ্ছা করলেই জীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু অতীতকে অতিক্রম করা যায় না। মানুষের অজান্তেই অতীত তার জীবনের আয়নায় এসে ধরা দেয়।

ইসলামের বয়স দৃশ্যত দেড় হাজার বছর হলেও মানুষ সৃষ্টির মতোই ইসলাম আদিম ও অকৃত্রিম। মহানবী (সা)–এর মাধ্যমেই ইসলাম পূর্ণতা পায়। আদম (আ) থেকে সকল নবীই ছিলেন এক আল্লায় সমর্পিত এবং একই তৌহিদী শিক্ষাধারার অনুসারী। আদমের বংশ বিস্তৃতির সাথে সাথে মানব বসতির বিস্তৃতি ঘটেছে। কখন কোন্ প্রক্রিয়ায় আমাদের এ অঞ্চলে মানব সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছে, তার ইতিহাস উদ্ধার করা এ কারণেই দুরূহ।

পাদটীকা ঃ১. সম্প্রতি জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীন প্রত্নতত্ত্ব প্রকল্পের পরিচালক ডঃ আবূ ইমাম এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন আবিষ্কারের কথা জানান। সংবাদ সম্মেলনে প্রফেসর দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, প্রফেসর হারুণ–আর–রশিদ, ডঃ আতাউর রহমান খান, ডঃ এনামুল হক খান, ডঃ নাসির উদ্দীন ও ডঃ এ. কে. এম. শাহনেওয়াজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্ধারকৃত হাতিয়ারগুলো দেখানো হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. বাংলাদেশের সূফী সাধক ঃ গোলাম সাকলায়েন
২. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার ঃ বাখরগঞ্জ
৩. বাংলাদেশের পীর আওলিয়া ঃ রহমানিয়া লাইব্রেরী
৪. পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টি ঃ মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
৫. কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচার ঃ আবদুল কুদ্দুস
৬. চট্টগ্রাম জেলায় ইসলাম প্রচার ঃ ডঃ আবদুল করিম
৭. সুন্দর বনের ইতিহাস ঃ এ. এফ. এম. আবদুল জলিল
৮. বাংলাদেশে ইসলাম ঃ আবদুল মান্নান তালিব
৯. ভারত বর্ষ ও ইসলাম ঃ সুরজিৎ দাশ গুপ্ত
১০. বাংলাদেশ ঃ বাংলা বিভাগ , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১১. মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর ঃ আবদুল মওদুদ
১২. The Discovery of India : Jawaharlal Neheru.
১৩. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা ঃ মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা
১৪. বরিশালের ইতিহাস ঃ সিরাজুদ্দীন আহমদ
১৫. আগা বাকের ঃ ঐ
১৬. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম ঃ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক
১৭. A History of Sufism in Bengal : Asiatic Society
১৮. চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ঃ শ্রী বৃন্দাবন
১৯. বাকেরগঞ্জের ইতিহাস ঃ শ্রী খোসাল চন্দ্র রায় ১৮৯৫
২০. The District of Bakerganj- Its History and Statistics :
H. Beveridge B. C. S. 1876 London
২১. বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ ডক্টর মুহম্মদ আবদুর রহিম
২২. বাংলার ইতিহাস ঃ নীহার রঞ্জন রায়
২৩. রিয়াজ–উস–সালাতীন ঃ গোলাম হোসায়েন সলীম
২৪.Origin of Musalmans of Bengal : Fazle Rabbi
২৫. পাক বাংলার কালচার– আবুল মনসুর আহমদ
২৬. আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ঃ মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ



ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ